শ্রীচরণকমলে

সুভাষ ঘোষাল

অরুণা প্রকাশনী : কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৭১

প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট
প্রবীর সেন

মুদ্রাকর
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৯

গৃহীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ যত না ছিলেন সন্ন্যাসীর তার চেয়ে বড় ঢের বেশি ছিলেন গৃহীর। গৃহীকে আদর্শ গৃহী করার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। গৃহ-দুর্গে বসে অহরহ জগন্ময়ী চিন্ময়ীর স্মরণ-মনন করতে করতে পরমপদে লীন হয়ে যাও—আমাদের জন্য এই ছিল তাঁর বাণী। কথামৃতকার শ্রীম যখন প্রথম তাঁর কাছে গেলেন, সে এক অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার। প্রথম দিনটিতে মাত্র দুটি কথা। সসঙ্কোচে শ্রীম জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।' ঠাকুর ভাবে ছিলেন। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা সমাগত। এই সান্ধ্যক্ষণে ঠাকুর কখনোও এ-জগতে কখনোও ও-জগতে। শ্রীমর প্রশ্নে তাঁর ভাবান্তর হলো। তিনি থেমে থেমে বললেন—'না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।' লক্ষণীয়, ঠাকুর লোক দেখানো কোনোও অনুষ্ঠান করতেন না। কোনোও ভড়ং ছিল না ; তিনি গুরু হতে চাননি। আমরা তাঁকে গুরু করে নিতে বাধ্য হয়েছি—যেমন শ্বাসে আমাদের বাতাস নিতেই হয়, তা না হলে আমরা হাঁপিয়ে উঠি ; মৃত্যুর ভাব হয়। তাঁর গেরুয়া ছিল না। ছিল না মালাচন্দন। 'সন্ধ্যা যাঁর সন্ধানে ফেরে' তাঁর আবার আনুষ্ঠানিক সন্ধ্যার কি-বা প্রয়োজন ? তিনি তো পার্ট-টাইম সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ফুলটাইমার। অদ্বৈত জ্ঞানটি আঁচলে বাঁধা ছিল তাঁর। মায়ের কোলেই তিনি বসে থাকতেন। সাজ-সজ্জায় তিনি সাধারণ একজন বাঙালী গৃহী। কালো গলাবন্ধ কোটটি পরে যখন দাঁড়াতেন তখন কোনও ভাবেই মনে হতো না যে তিনি আমাদের থেকে পৃথক। গৃহীর উজ্জ্বল মূর্তিটি আমাদের সামনে তুলে ধরে ঠাকুর বলতে চেয়েছিলেন, 'ঘাবড়াও মৎ।' 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি, কাশী, কাঞ্চি, কেবা চায়।' ত্রিসন্ধ্যা কালী বলে যাও।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎটি বড় সুন্দর। সেইদিন আলাপ অনেক গভীরে গেল। প্রথম দিনের ভয় আর সঙ্কোচ কাটাতে পেরেছেন মাস্টার মহাশয়। ঠাকুরও এই আগ্রহী, সৌম্য মানুষটিকে জানতে চান, কারণ শ্রীমকে দিয়ে তিনি বিশাল একটি কাজ করাবেন, শ্রুতিলিখন। ঠাকুর শ্রীম'র প্রাথমিক পরিচয় নিলেন। যেন চাকরির দরখাস্ত পূরণ করাচ্ছেন। হঠাৎ ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি বিবাহ হয়েছে ?' মাস্টার বললেন, 'আজ্ঞে হাঁ।' ঠাকুর যেন ধাক্কা খেলেন। আশা ভঙ্গ হলো তাঁর। মাস্টার মহাশয়ের মনে

হলো, তিনি যেন শিউরে উঠলেন—'ওরে রামলাল, যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে!' মাস্টার মহাশয় ঘোরতর অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বসে রইলেন। ভাবছেন, বিয়ে কি এত দোষের! ঠাকুরের পরের প্রশ্ন—'তোমার কি ছেলে হয়েছে?' মাস্টারমহাশয়ের বুক টিপ-টিপ করছে। তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, ছেলে হয়েছে।' ঠাকুর যেন একেবারেই হাল ছেড়ে দিলেন—'যাঃ ছেলে হয়ে গেছে!'

অর্থাৎ! কেন তুমি সংসার করলে! 'দেখ, তোমার লক্ষণ ভালো ছিল, আমি কপাল, চোখ এসব দেখলে বুঝতে পারি।' তাহলে কি দাঁড়াল? সংসার পঙ্ককুণ্ডে সব ডুবে গেল। জীবনটা ভেস্তে গেল! না! ঠাকুর আমাদের হতাশ করার জন্যে আসেননি। ষোড়শ সন্ন্যাসী শিষ্যের জন্যে তিনি দেহ ধারণ করেননি। তিনি সংসারে কলুর বলদের মতো জোতা অসংখ্য মানুষকে পথ দেখাবার জন্যে এসেছিলেন। সে-পথ হলো গৃহস্থ সন্ন্যাস। 'সব কাজ করবে; কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে, সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়।' সেই রামপ্রসাদের কথা, 'ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।' আর কি ভাবতে হবে! তুমি যেন বড় মানুষের বাড়ির দাসী। 'বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে 'আমার রাম, আমার হরি। কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।' ঠাকুর মাস্টারমশাইকে শিক্ষা দিচ্ছেন। 'কচ্ছপ হও। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো? আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।' মন তোর। এই হলো মন্ত্র। তারপর কি করবে? 'ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক তাপ এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।' কঠ-উপনিষদ্ যেমন বলছেন, 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।' হৃদয়ের সব কামনা তুলে ফেলে দাও। তুমি মরবে। মরতে তোমাকে হবেই। কিন্তু কামনাশূন্য হতে পারলে মরণশীল মানুষও অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। ইহজীবনেই হতে পারে ব্রহ্মভোগী।

ঠাকুর আরও উপদেশ দিলেন: 'তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা। সংসার জল আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখো, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে ফেলে রাখা যায় তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধন দ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও

মিশবে না ; ভেসে থাকবে।' শুধু সংসার নয়। সংসারে থেকেও চাই প্রতি মুহূর্তের বিচার। সুর ভুললে চলবে না। সদাই মনে চলবে গুনগুনুনি—'সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে। বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে॥' সুর না ভোলার পথ হলো বিচার। ঠাকুর গৃহী শ্রীমকে বলছেন, 'সংসারে ঢুকেই যখন পড়েছ, তখন তো আর উপায় নেই। সে তোমার প্রারব্ধ। কিন্তু সব ঠিক থাকবে যদি বিচারটি ঠিক থাকে।' কি সেই বিচার। 'কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয় ? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার ; বুঝেছ ?'

শ্রীম বললেন, 'আজ্ঞে হাঁ, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে বস্তুবিচার।'

ঠাকুর বলছেন—'হ্যাঁ,বস্তুবিচার। এই দেখ টাকাতেই বা কি আছে, সুন্দর দেহেই বা কি আছে ! বিচার কর, সুন্দরীর দেহতেও কেবল হাড়, মাংস চর্বি, মল, মূত্র। এইসব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয় ? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায় ?'

'ভাবে সে-ই সে পরমানন্দ যে-জন পরমানন্দময়ীরে জানে। সে জন না যায় তীর্থপর্যটনে।' কারণ 'যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে'। ঠাকুর গাইতেন, 'আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়ো না কো কারো ঘরে।' আর আমরা বলি, 'পাখি তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণনামের মাস্তুলে।' সংসার জ্বলছে জ্বলুক। আমরা রামকৃষ্ণভাবের অগ্নি-নিরোধক অ্যাসবেস্টাস জ্যাকেটটি পরে বসে থাকি। পঙ্কের পাঁকাল হয়ে থাকি।
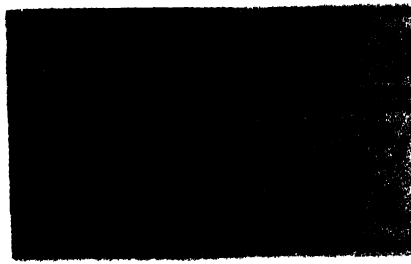
চিরগুরু

চন্দনাকে সকাল-সন্ধ্যে শেখানো হলো, 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'। পাখি সারাদিন দাঁড়ে বসে কপচায়, 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'। বছরের পর বছর। ছোলা খায়, কলা খায়, লঙ্কা খায়, আর থেকে থেকে বলে, 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'। সেই চন্দনা একদিন চলে গেল হুলোর পেটে। বড়ো চিন্তার কথা ! এমন ধার্মিক পাখিকে, রাম অথবা কৃষ্ণ কেউই রক্ষা করতে পারলেন না। কেন রক্ষা করবেন ? পৃথিবীতে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক যে রয়েই গেছে। থাকবেও চিরকাল। এর হাত থেকে তো নিষ্কৃতি নেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভীষণ অসুস্থ। শশধর তর্কচূড়ামণি একদিন ঠাকুরকে বললেন ; "মহাশয় শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রই শারীরিক রোগ আরাম করে ফেলতে পারেন। আরাম হোক মনে করে মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার এরূপ করলে হয় না ?" ঠাকুর বললেন : "তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে গো ? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয় ?"

পৃথিবীর তাবৎ ব্যাপারটাকে ভালো ভাবে বুঝে নিলে, দু-ধরনের সত্য বেরিয়ে আসবে। এক হলো পার্থিব সত্য। পৃথিবীতে যা ঘটে, যা ঘটে আসছে অনন্তকাল ধরে, যা ঘটবে চিরকাল। দেহ ধারণের খাজনা আমাকে দিতেই হবে। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মৃত্যুর কবচ পরেই জন্ম আমাদের। আমি এগোচ্ছি, আমার পাশে পাশে কাঁধে হাত রেখে পরম বন্ধুর মতো হাঁটছে মৃত্যু। তার ঝোলা-ঝুলিতে উপহারের অন্ত নেই। বহু ধরনের অসুখের আড়তদার। বহু বিচিত্র দুর্ঘটনার সংগঠক তিনি। কখন তিনি দয়া করে আমাকে কি দেবেন তিনিই জানেন। আমি জানি না। তিনি এক মহামান্য বিচারকের মতো। যে কোনো সময় যে কোনো দণ্ড তিনি দিতে পারেন। এমন কোনো উচ্চ আদালত নেই, যেখানে আমার আপিল চলবে ! এরপর আছে বেঁচে থাকার প্রশ্ন। ঈশ্বরের কোষাগার থেকে আমার জন্যে মোহর আসবে না। খাদ্যভাণ্ডার থেকে ভারে ভারে খাবার আসবে না। সবই আছে এখানে, আমাকে অর্জন করে নিতে হবে। দেহের মাঝখানে লেগে আছে পেট। সেই পেট আমাকে ঘোরাবে নাকে দড়ি দিয়ে। আমি কারোর দাস

না, কেউ আমার দাস হবে। বড়ো দাস, ছোটো দাস, দাসের দাস, দাসানুদাস। কারোরই বলার উপায় নেই, আমি প্রকৃত প্রভু। একমাত্র প্রভু তিনি। পৃথিবীতে মানুষের খেলা যেভাবে সেজে উঠেছে তা হলো, লোভ, লালসা, বঞ্চনা, খুন, জখম, রাহাজানি। মরো, অথবা, মারো। অনেক স্বপ্ন কিন্তু বাস্তব অন্যরকম। পেঁয়াজী সত্যটা হলো, ঠাকুরের কথায়, খোসার পর খোসা ছাড়িয়ে যাও, শেষে সব শূন্য। হাতে আর কিছুই থাকবে না।

এই উপলব্ধিই মানুষকে ভাবায়, ভাবতে শেখায়, তাহলে আসল সত্যটা কি? পরা সত্য। ঠাকুর একটি গল্প বললেন : "একজন সাধু সর্বদা জ্ঞানোন্মাদ-অবস্থায় থাকতেন, কারোও সহিত বাক্যলাপ করতেন না, লোকেরা তাঁকে পাগল বলে জানতো। একদিন লোকালয়ে এসে ভিক্ষা করে এনে একটা কুকুরের উপর বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খেতে লাগলেন ও কুকুরকে খাওয়াতে লাগলেন। তাই দেখে অনেক লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলো এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলে উপহাস করতে লাগলো। এই দেখে সেই সাধু লোকদিগকে বলতে লাগলেন, তোমরা হাসছো কেন?

বিষ্ণু পরিস্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসরি রে বিষ্ণো
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥"

এই হলো পরাসত্য। ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় প্রায়ই বলতেন : "যে দুধ খাওয়াচ্ছে, সেই মেরেছে।" এই হলো পরাসত্য। ঠাকুর এই গল্পটি বলতেন ভক্তদের চৈতন্যোদয়ের জন্যে : "এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, এক জমিদার একটি লোককে ভারি মারছে। সাধুটি বড়ো দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারি রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে, ভারি প্রহার করলে। কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারি মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন তারা পাঁচজন ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্চে। একজন বললে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হলো। চোখ মেলে দেখতে লাগলো। একজন বললে, ওহে দেখি জ্ঞান হয়েছে কিনা? লোক চিনতে পারছে কিনা? তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'মহারাজ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে?' সাধু আস্তে আস্তে বলছে, 'ভাই! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন—যাদের চৈতন্য হয়েছে, যাদের ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ অনিত্য বলে বোধ হয়েছে তাদের আরেক রকম ভাব। তারা জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আর সব অকর্তা। এই জ্ঞানের নামই প্রজ্ঞান। পৃথিবী পালটাবে না। যা আছে তাই

থাকবে। পালটাও নিজেকে। অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে। জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে। বিজ্ঞান থেকে প্রজ্ঞানে। সদানন্দে বাঁচার কৌশল আছে আমার ঠাকুরের কাছে। চৈতন্য হলে কি হয় ? (১) বেতালে পা পড়ে না, (২) হিসাব করে পাপ ত্যাগ করতে হয় না, ঈশ্বরের উপর এতো ভালবাসা যে, যে-কর্ম তারা করে সেই কর্মই সৎকর্ম, (৩) সেই বোধ জাগে, সমস্ত কর্মের কর্তা আমি নই, আমি ঈশ্বরের দাস। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন চালান তেমনি চলি।

ঠাকুর আমার মতো চিরকালের গৃহীর চিরগুরু। সংসারে আছি পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁকে আমার হাতটি ধরিয়ে যাতে অন্ধকারে আলোর পথে চলতে গিয়ে পড়ে না যাই। জমিদার পৃথিবী মারবে মারুক, যাঁর পৃথিবী তিনি এসে বাতাস করে দুধ খাওয়াবেন। ঠাকুর চেয়েছেন : (১) সাধনা, (২) একটু লজ্জা, (৩) সচ্চিদানন্দে প্রেম, (৪) মৃত্যু-স্মরণ, (৫) বিশ্বাস, (৬) সতর্কতা, (৭) ব্যাকুলতা, (৮) মনে মনে ভাবো সব স্বপ্নবৎ। মনে রাখো—'যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম, যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম'।

হাত ধর

সমর্পণ। তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দাও। আর কোনও ভাবনা নেই। এইবার আমি বেড়ালছানা। মা যখন বিছানায় তুলবেন তো আমি বিছানায়। মা যখন ছাইয়ের গাদায় ফেলছেন, আমি তখন ছাইয়ের গাদায়। মা আমার হাত ধরেছেন। ঠাকুর বলছেন—মা যখন ছেলের হাত ধরে আলের ওপর দিয়ে নিয়ে যান সে হাত খুলে ছেলের পড়ে যাবার ভয় থাকে না। আর ছেলে যদি মায়ের হাত ধরে, ভয় আছে। অন্যমনস্ক হলেই পতন। মা, তুমি আমার হাত ধর।

তিনি ধরবেন কেন ? কেনই বা ধরবেন না। আমি যে বলেছি। কিভাবে বলেছি ? মুখে বলিনি। মনে বলেছি। মন আমার কেঁদেছে। ঠাকুর বলছেন, খুব কাঁদ। কেঁদে কেঁদে বল। একটিই অস্ত্র—কান্না। কান্না মানেটা কি ? ব্যাকুলতা। জগৎসংসারে আমার কেউ নেই। আমি বড় একা। সংসার—বিদেশে বিদেশীর বেশে ঘুরছি অকারণে। 'বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর, কেহ নয় আপন।' এই বোধই আমার ব্যাকুলতার কারণ। মা আমাকে পুতুল দিয়েছিলেন, মাকে ভুলে থাকার জন্যে। হঠাৎ মনে হয়েছে—এ তো পুতুল। আমি মায়ের কাছে যাব। আমি আমার মাকে চাই। তাই আমার তারস্বরে কান্না। [illegible] কাজ ফেলে মাকে ছুটে আসতে হবেই।

আচ্ছা, এই বিশ্বাসটাই বা আমার এল কোথা থেকে ? ঠাকুর বলেছেন। বললেই [illegible]? না, তিনি করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমার গুরু। গুরুবাক্য অভ্রান্ত। গুরু [illegible]লেন—এই কাগজের মোড়কটা হাতে নিয়ে নদীর ধারে যা। নৌকো নেই তো কি [illegible]ছে, জলের ওপর দিয়ে নির্ভয়ে হেঁটে যা। শিষ্য সত্যিই হেঁটে পার হয়ে গেল [illegible]—বিশ্বাসের এত জোর। যার বিশ্বাসের তেমন জোর ছিল না, সে নদীর মাঝ বরাবর [illegible] মোড়কটা খুলে দেখলে। লেখা আছে শুধু একটি কথা—রাম। রামনামের কি এত [illegible]র। যাঁহাতক মনে হওয়া ডুবে গেল ভুড়ভুড় করে।

[illegible] বিশ্বাসে অবিশ্বাস পথ পায় কেমন করে ? ঢুকিয়ে দেয়, ইনজেকশান করে দেয় [illegible]শ্বাসী, বিষয়ী মানুষেরা। ঠাকুর বলছেন—বিষয়ী, অবিশ্বাসী মানুষদের এড়িয়ে চলবি। [illegible], নিষ্কম্প দীপশিখায় তারা ফুঁ মেরে চঞ্চল করে দেবে। যুক্তিজাল বিস্তার করে

বলবে—কিছু নেই। ও-তে কিছু নেই, সব আছে এ-তে। জন্ম-ভোগ-মৃত্যু, এই তিন সত্য। তা, তোমার কথা মানবো কেন? তুমি কে? কাম-কাঞ্চনের দাস। তুমি এক লেজ-কাটা শৃগাল। সকলের লেজই কাটাতে চাও। বিষয়ীর শেষ অবস্থা তো দেখেছি আমি। অনুভূতিশূন্য পশুর মতো। এক তিল শান্তি নেই জীবনে। জ্বলন্ত লোভ-পিণ্ড। পড়ে আছে বিছানায়। একটু পরেই মরবে। বউ বলছে—তুমি তো বেশ চললে, আমার জন্যে কি রেখে গেলে। ছেলে এসে বালিশের তলায় সিন্দুকের চাবি খুঁজছে। আমি জানি, তখনো তোমার চৈতন্য হবে না। তুমি এদিকে ও-দিকে তাকিয়ে বলবে, ওরে! দু-একটা আলো নেবা। তেল বেশি পুড়ছে।

দর্শন, বিচার, বিশ্বাস! দর্শন কোনও বই নয়। জীবন দর্শন। যে জীবনে আছি সেই জীবনকে দর্শন। চলচঞ্চল, অস্থির এক অস্তিত্ব। আজ একরকম তো কাল একরকম। আজ যে আছে, কাল সে নেই। কোনও কিছুই ধরে রাখা যায় না। জীবন, যৌবন, ধন, মান! আমার ছেলে বলে যিনি বুকে জড়িয়ে ধরতেন, তুমি রইলে বলে তিনি চলে গেলেন। 'সখা আমার', 'প্রিয় আমার' বলে যাকে আঁকড়ে ধরতাম, মহাকাল তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন। আর প্রতিদিন নিজের অজ্ঞাতেই জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে একটি করে দিন। জন্মদিন মানে বেঁচে থাকার একটি দিন নয়। হিসেবটা উল্টো, মৃত্যুর দিকে একটি দিন এগুনো। আমার বয়স পঞ্চান্ন, মানে মৃত্যুর দিকে পঞ্চান্ন বছর এগিয়েছে জীবন। আর হয়তো পড়ে আছে পাঁচ কি দশ বছরের পথ। জীবনের হাত ধরে মৃত্যুই হাঁটছে। আমি বসে পড়লেও সে বসছে না। আমাকে কোলে করেই এগিয়ে চলেছে ক্ষণকাল গিয়ে মিলবে মহাকালে।

জনম-মরণ জীবনের দুটি দ্বারে
উদয় অস্ত আসে যায় বারে বারে।
হেথা আশা সেথা নিরাশার শুধু বাণী,
পথিকেরে লয়ে দুই পথে টানাটানি
এ যদি বাঁধেগো জীবনের বীণা
ও ছেঁড়ে বীণার তার॥

ঠাকুর বলছেন—মৃত্যুকে সব সময় স্মরণে রাখবে। মৃত্যু-স্মরণ। না, ভয় নয়। স[illegible] ছেড়ে একদিন চলে যে যেতেই হবে, এই কথাটি স্মরণে রেখে সব কাজ করবে। বা[illegible] বাগানের মালী আমি। বলছি, আমার পুকুর, আমার আম গাছ। বাবু যদি বিদায় ক[illegible] দেন তা আমার আমকাঠের সিন্দুকটি লয়ে যাবারও ক্ষমতা থাকবে না। মৃত্যু-স্ম[illegible] হলে ইহ-সংসারে পরের বাড়ির দাসীর মতো থাকা সম্ভব হবে। মুখে বলছি, আম[illegible] গোপাল, আমার রাখাল, মনে জানি এরা আমার কেউ নয়। আসল যারা, তারা [illegible] আছে দেশের বাড়িতে, নিজ নিকেতনে। মন চল নিজ নিকেতনে। ঠা[illegible] বলছেন—সংসারে ভাব দেখাবে যেন কতই তুমি ওদের—স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের। কত ভ[illegible] কত ভালবাসা। মনে মনে জানবে ওরা তোমার কেউ নয়। ওরা ওরাই। আসল যি[illegible] তিনি আছেন আড়ালে।

দর্শনের পরেই নিত্য-অনিত্যের বিচার। কেউ বলে দিলে হবে না। ওতে বিশ্বাস না। ধাক্কা খাব, হোঁচট খাব। বিচার করব। নিজের সঙ্গে নিজের বিচার। ঠাকুর বলছেন—বিচার করবে। সংসারের এক একটা জিনিস ধরবে। খুঁজবে, তার মধ্যে সত্য আছে কি? টাকা? টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, পরিধানর বস্ত্র হয়, একটা বাসস্থান হয়। এর বেশী তো কিছু হয় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ—অপচয়। পাঁচ ভূত সাবড়ে দেয়। ঠাকুর বলছেন—তুমি সংসারী—পঙ্খিও নও, দরবেশও নও, ওদের সঞ্চয়ের প্রয়োজন নেই; কিন্তু নীড়ের পাখি সঞ্চয় করে তার শাবকের জন্যে, যতদিন না তার ডানায় জোর আসছে, যতদিন না সে উড়তে পারছে ততদিন। তোমারও সেই পথ। ততটুকুই উপার্জন করবে, যতটুকু প্রয়োজন। তার বেশী নয়। যত বেশী টাকা, তত বেশি অশান্তি। তাহলে কাঁচ আর কাঞ্চনে কোনও তফাৎ নেই।

সংসার! সেই একই ব্যাপার। একটা মায়া। বিরাগ আনার জন্যে ঠাকুর নির্দেশিত বিচারের পথটি আরও নির্মম। আধেয় বস্তুর ক্রম-বিশ্লেষণ। ঠাকুর বলছেন—আচ্ছা, পুরোপুরি ত্যাগ, সম্পূর্ণ বিরাগ, তুমি সংসারী হয়তো পারবে না। সংস্কার দোষ। বহুকালের অনুসৃত অভ্যাস। সংসারেই থাক। না হয় ইন্দ্রিয় সুখভোগ হলো, কিন্তু সেই ফকিরের মতো পরস্ত্রী বা পরপুরুষ যতই লোভ দেখাক নির্মম প্রত্যয়— প্রাতঃকৃত্যের সময় যে গাড়ুটির কাছে লজ্জা সমর্পণ করেছি, সেই গাড়ুটি ছাড়া, অন্যে প্রয়োজন নেই।

বিচারেই অনিত্যের প্রকাশ। হাতে রইল বিশ্বাস। মা, তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই। তুমি আমার হাত ধর।
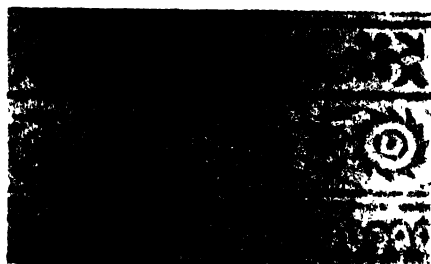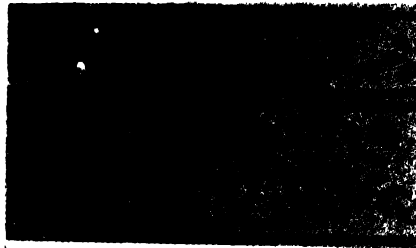
‘পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব’

‘কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন।’ মা-কালীর এ কেমন গঠন গৃহকর্ত্রী প্রশ্ন করছেন গুরুঠাকুরকে। মায়ের একি রূপ। মায়ের জিভ কেন বেরিয়ে আ সামনে? মা কেন জিভ কেটেছেন? গুরুঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন : ‘দেখ মা, আগমবাগীশের মত। আগামবাগীশের মনে হলো কিভাবে জীবের কল্যাণ বিধান ক যায়? এই কথা চিন্তা করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নে আদে হলো—আগম, কাল ভোরে উঠে প্রথমেই তুমি যে-রমণীকে দেখবে, ও যে রূপে দেখব সেই রূপই কালীর রূপ, মহামায়ার রূপ।’

বহুকালের প্রচলিত এই গ্রাম্য লৌকিক ব্যাখ্যা অপ-ব্যাখ্যা। আমার মাকে বোঝা অত সহজ। জীব যদি শিব হন, তাহলে তার হৃদয়গত বন্ধনমুক্তির ঘন আকৃতিই হলেন ম কালী। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "বন্ধন মুক্তি—দুয়ের কর্তাই তিনি।" তিনি ছেদ ও বন্ধন দুয়েরই কর্ত্রী। "তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কাম-কাঞ্চনে বদ্ধ আবার তাঁর দ হলেই মুক্ত। তিনি ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী।"

শ্রীম সাক্ষী। ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন কালীতত্ত্ব। গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠে ঠাকু গাইছেন : "শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে)।" গান শেষ করে বলছে : তিনি লীলাময়ী। এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী লক্ষের ম একজনকে মুক্তি দেন।" ঠাকুর বলতেন : "পাশবদ্ধ জীব এবং পাশমুক্ত শিব"। এব জীবের দুই অবস্থা। "কালী ও ব্রহ্ম অভেদ।" সেই অভেদ কখন? যখন আমি নামরূপে ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পেরেছি। আমার ‘আমি’কে নস্যাৎ করতে পেরেছি। আমি এ আমার—এই হলো জীবের সংজ্ঞা। সংসার আমাকে পেড়ে ফেলেছে। অষ্টপাশের বন্ধ আমার ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। মা, মা চিৎকার। কেউ নেই আমার, দারা পুত্র-পরিবার ঊর্ধ্ব-দৃষ্টিতে তাঁকে খুঁজছি আর কাতর কণ্ঠে ডাকছি, কৃপাময়ি! কৃপাদৃষ্টি কর মা। তখ তিনি তাঁর ডান হাত তুলে অভয় দিচ্ছেন : ‘বাবা, ভয় কি তোমার! এই যে আ তোমার জননী।’ আমি তাঁর কণ্ঠ শুনেছি। মনে হয়েছে, কেউ একজন আছেন আমা এই নির্বান্ধব, মরুভূমি-সম সংসারে; কিন্তু আমি যে তাঁকে আরও কাছে পেতে চা ‘মা, আমি যে তোমার কোল পেতে চাই।’ সে কিরকম আকৃতি? সেই ডাকের শ

...ওয়া চাই ? ঠাকুর যেভাবে ডাকতেন। মাটিতে পড়ে আছেন, অচৈতন্য। দুচোখের জলের ধারায় মাটি কর্দমাক্ত। দেহে প্রাণ আছে কি নেই। তখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় দক্ষিণহস্ত তুলে শোনান অভয়বাণী : 'ভয় নেই, ভয় নেই। আমি থাকতে তোমার কিসের ভয় !' ভক্তের এতেও আশ মেটে না। বন্ধনের কি হবে। ভবভয়-বন্ধন। অজস্র বন্ধন। সম্পর্ক, কর্তব্য, জীবিকা, রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, সংসার, সমাজ, মান, সম্মান, অভ্যাস, ইন্দ্রিয়। মা, মুক্তি কোথায় ? জীবের এই তৃতীয় আর্তনাদে মা বের করবেন তাঁর বামহস্ত। সেই হাতে ধরা আছে অসি। তিনি এক একে সব বন্ধন কর্তন করে জীবকে মুক্তি দেবেন। জীবরূপ মুণ্ডটি তাই মায়ের দ্বিতীয় বামহস্তে ধৃত। এই হলো মায়ের চারটি হাতের রহস্য। এখন জীবের জীবত্ব নাশ মানে মৃত্যু। এই অবস্থাই হলো জীবের শিব-অবস্থা। অর্থাৎ তখন তার আর কোন কর্ম থাকে না। জৈবভাবে কোন কাজই শুদ্ধ নয়। শিবত্ব প্রাপ্তিতে তার কাজ হয় মঙ্গলকর্ম। শিবের আর এক অর্থ শুভ, মঙ্গল। কিন্তু শিবত্ব লাভেই তো শেষ হচ্ছে না। সে তো ব্রহ্মময়ীকে তখন চিনেছে। মায়ার আড়ালে সরে গেছে। জীবাত্মা তখন পরমাত্মায় লীন হতে চাইছে। জীবাত্মা যখন পরমাত্মায় মিলিত হলো, তখন সে শব। শিব যেই শবাকার হলো আনন্দময়ী স্বপ্রকাশিত হলেন হৃদয়ে। জীবের এই অবস্থার নাম সমাধি।

ঠাকুর বলছেন : "তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না। দুধ কেমন ? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী : সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এইসব কার্য করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপভেদ।"

ঠাকুর প্রশ্ন করছেন : "কালী কি কালো ?" নিজেই উত্তর দিচ্ছেন : "দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোন রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রঙ নেই।"

রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের অতীত একটা অবস্থাই হলো সত্য অবস্থা। সত্য কেন ? গণিত দিয়ে বুঝতে হবে। আপেক্ষিক তত্ত্ব যেখানে নেই। আমি নেই, তুমি নেই। আলো নেই, অন্ধকারও নেই। রূপ, অরূপ কিছুই নেই। নেই অবস্থা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়। সাদাও নয়, কালোও নয়। তাই শিব শ্বেত শুভ্র, মা নিকষ কালো। দুই বিপরীত মেরুর সহ-অবস্থান। জীবন আর মৃত্যু। কর্ম আর নিষ্ক্রিয়তা, এক আর একের ওপর। ঠাকুর একটি গান গাইতেন—'ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কালো রূপ কেন হলো।' ঠাকুর ভক্তকে বলছেন : "যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। সাকাররূপও মানতে হয়। কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তারপরে দেখতে পায় যে, সেই রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই কালী।"

"তিনি অনন্ত পথও অনন্ত।" ঠাকুর সমন্বয়ের কথা বলছেন, জ্ঞানের কা
থেকে দেখা, যায় নাম দর্শন—"যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে
আমি কিন্তু দেখি সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। যিনি
নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ। 'নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারি, কাবে
নিন্দো কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।'

"বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এ
সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তে
বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ। শিবঃ কেবলঃ কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, '
সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে আছে। আ
বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে, কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।"

কতভাবে ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন, শক্তিরূপিণী কালীকে। "যিনি সৎ তাঁর একটি না
ব্রহ্ম, আর একটি নাম কাল (মহাকাল)। কালী যিনি কালের সহিত রমণ করেন
আদ্যাশক্তি। কাল ও কালী—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলে
দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা।"

ঠাকুর বলছেন, মায়া, মহামায়া। মহামায়ার এমনি লীলা মানুষ জেগে ঘুমোয়। সাধ
সিদ্ধ মহাপুরুষ নিষ্কৃতি নেই কারও। তিনি প্রসন্ন হয়ে পথ না ছাড়লে সত্যলাভ অসম্ভব
বুদ্ধিকে বিমোহিত করতে তাঁর ক্ষণমাত্র সময় লাগবে না। মহাবিদ্যা ষোড়শী কে
সালঙ্কারা মা পাদুদা আসনে আসীন। ঘোর অমানিশা। পূজারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ
মায়ের পাদপদ্মে সাধনকালের সিদ্ধিপ্রদ জপমালা সমর্পণ করে দিলেন, 'মা, সাধনা
তোমার, সিদ্ধিও তোমার।'

"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্"

সাধনা

ঠাকুর আমাদের কাছে আটটি জিনিস চেয়েছেন—(১) সাধনা (২) একটু লজ্জা (৩) ়দানন্দে প্রেম (৪) মৃত্যু-স্মরণ (৫) বিশ্বাস (৬) সতর্কতা (৭) ব্যাকুলতা (৮) ধ্যান। আমরা একটি কাগজে এই নির্দেশগুলি লিখে যত্রতত্র টাঙিয়ে রাখতে পারি। ়রা জ্ঞানের কথা শুনি। এ-কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও-কান দিয়ে বের করে দি। পায়রার ়য় মটরের দানার মতো বিষয়-চিন্তা গজগজ করে।

ঠাকুর বলছেন পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজগজ করে, সেইরকম জীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয়-বাসনা তাদের ভেতর গজগজ ়ছ। বিষয়ই তাদের ভালো লাগে, ধর্মকথা ভালো লাগে না।

এই ভালো লাগানোটাই সাধনা। যেমন তুলসীদাস বলছেন :

> এক ঘড়ি আধি ঘড়ি, আধি হুমে আধ্।
> তুলসী সঙ্গত্ সন্তকি, হরে কোটি অপরাধ॥

এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা এমন কি আধেরও আধ ঘণ্টা যদি সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহলেই ় হয়। অসংখ্য অপরাধজনিত পাপবোধ নষ্ট হয়। একটু সাধুসঙ্গ। তুলসী বলছেন

> সঙ্গত কিজিয়ে সাধুকি, হরে আউর কি ব্যাধ
> সঙ্গত কিজিয়ে নীচ্ কি, আঠো পহর্ উবাস॥

সাধুর সঙ্গ ব্যাধি হরণ করে। ভব-রোগ হরণ করে। আর অসাধু সংসর্গে অষ্টপ্রহর ়বাসী থাকতে হয়। তাহলে আমরা কার সঙ্গ করবো? এ প্রশ্ন নিজেকেই নিজের। ়র বলছেন, খুব সাবধান। 'যে সকল লোক নিজে কখনও ধর্মচর্চা করে না, অন্যকেও ়-পূজা করতে দেখলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, ধর্ম ও ধার্মিকদের নিন্দা করে, সাধন-স্থায় কখনও এরূপ লোকদের সঙ্গ করবে না। তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে ়বে। ত্রিসীমানা মাড়াবে না। তুলসী বলছেন :

> যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহি, যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম।
> দোনো এক নাহি মিলে, রবি রজনী এক ধাম॥

দিন আর রাত তো এক জায়গায় থাকতে পারে না। অসম্ভব সম্ভাবনা। সেইরকম ়ানে নিরন্তর আরাধনা সেইখানে বিষয়বাসনা, ভোগবাসনা থাকে কেমন করে? আর

যেখানে শুধুই ভোগ সেখানে রামের আরাধনা হয় কি করে?

যো পরবিত্ত হরে সদা, সো কভু দান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার করে সদা, সো কভু তীর্থ গয়া ন গয়া॥
যো পর আশ করে সদা, সো বহু দিন্ জিয়া ন জিয়া।
যো মুহমে পরচুকলি ওগারত সো মুহমে হরিনাম লিয়া ন লিয়া॥

যার ধান্দা কেবল পরস্বাপহরণ, তার নিরন্তর ভূরিদান বা অদান দুই সমান। কোনো ফল নেই। যে নিরন্তর পরস্ত্রীতে আসক্ত তার পক্ষে তীর্থদর্শন বা অদর্শন দুইই সমান যে পরপ্রত্যাশী হয়ে বাঁচতে চায় তার বাঁচাও যা মরাও তাই। তার জীবন-মরণ দুই সমান। আর যে-মুখে পরনিন্দা, সে-মুখে হরিনাম করা আর না-করা দুইই সমান

ঠাকুর বলছেন, 'দু'রকম মাছি আছে—একরকম মধু মাছি, তারা মধু ভিন্ন আর কিছু খায় না। আর একরকম মাছি মধুতেও বসে, আর যদি পচা ঘা পায় তখনি মধু ফেলে পচা ঘাযে গিয়ে বসে। সেই রকম দুই প্রকৃতির লোক আছে—যারা ঈশ্বরানুরাগী, তার ভগবানের কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ করতেই পারে না। আর যারা সংসারাসক্ত জীব, তার ঈশ্বরীয় কথা শুনতে শুনতে যদি কেহ কাম-কাঞ্চনের কথা কয়, তাহলে ঈশ্বরীয় কথ ফেলে তখনই তাতে মত্ত হয়।'

মাছি আর মৌমাছি এই হলো জীবের উপমা। প্রথমে চাই বিবেক-বৈরাগ্য। আমা ভালো লাগছে না। সমস্ত কিছু মনে হচ্ছে বিস্বাদ আর আলুনি। ঠাকুর বলছেন, বিষ বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য। বলছেন, 'বিবেক-বৈরাগ্য না থাকলে শাস্ত্র পড়া মিছে। বিবেক বৈরাগ্য ছাড়াও ধর্মলাভও হয় না। এইটি সৎ আর এইটি অসৎ বিচার ক'রে সদ্ব গ্রহণ করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা এইরূপ বিচার-বুদ্ধির নাম বিবেক

এইবার এক কঠিন প্রশ্ন, শাস্ত্রের অধিকারী কে? বিবেক-বৈরাগ্য কার ভেত জাগবে? কি ভাবে জাগবে। আর সেই জাগরণটা কি? এই দেহ পরিপাটি বিছান ঘুমোচ্ছিল, সকালে জেগে উঠল, সে জাগরণ আর এই জাগরণ এক নয়। এ হলো অন্ত উঠে বসা। চৈতন্যলীলায় গিরীশ ঘোষ যে গানটি বেঁধেছিলেন, সেই গানেই আছে সর ইঙ্গিত

আর ঘুমায়ো না মন।
মায়া-ঘোরে কত দিন রবে অচেতন॥
কে তুমি কি হেতু এলে আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে নিত্যানন্দ হের প্রাণে
তম পরিহরি হের তরুণ-তপন॥

যোগবাশিষ্ঠসার গ্রন্থে শাস্ত্রকার বলছেন, তিনিই এই শাস্ত্রের অধিকারী, যাঁর ম হয়েছে—

অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ।
নাত্যন্তমজ্ঞো নো তজ্জ্ঞঃ সোঽস্মিংচ্ছাস্ত্রেই ধিকারবান॥

সংসারবন্ধনে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি। এই বন্ধনদশা থেকে আমি মুক্ত [illegible]। দৃঢ়সংকল্প আমার। আমি একেবারে অজ্ঞ নই, আবার তেমন তত্ত্বজ্ঞও নই। াস্ত্রকার বলছেন এমন কৃতসংকল্প অভিলাষী এই শাস্ত্রে অধিকারী। শাস্ত্রটি কি ? না াদান্ত। বেদান্ত কি ? আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষ লাভের উপায়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বস্তুতত্ত্ব ানেন, শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই তাঁর। প্রয়োজন নেই উপদেশের। আর যে ঘোর বিষয়ী, াকে উপদেশ দেওয়ার অর্থ হয় না। ঠাকুর যা বলে গেছেন একেবারে সহজ কথায়, কটু খোঁচা মেরেই—কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা হবার নয়। বলছেন—চিল, শকুনি অনেক চুতে ওড়ে কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গোভাগাড়ে। অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে ? াদের মন সর্বদা কাম-কাঞ্চনে আসক্ত থাকার দরুন জ্ঞানলাভ করতে পারে না। শাস্ত্রকার াধিকারীদের আবার দুটি ভাগে ফেলেছেন : মুখ্য আর অমুখ্য। মুখ্যের গুরুমুখে মহাবাক্য বণ মাত্রই জ্ঞান হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ বলছেন :

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষঃ বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

একটি সর্ত। শিষ্যকে হতে হবে প্রশান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় আর গুরুকে হতে হবে াকৃত ব্রহ্মজ্ঞ। এইরকম গুরুর উপদেশ ওইরকম শিষ্যেরই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। নচেৎ য়। আর তিনি কি উপদেশ দেবেন—সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষের তত্ত্ব। শাস্ত্রপাঠ করে রোক্ষজ্ঞান হতে পারে, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ব্রহ্মবিৎ গুরুর উপদেশ য়োজন। শাস্ত্রকার আবার অমুখ্যের দুটি ভাগ করেছেন, (১) বেদান্ত-বিচারসমর্থ (২) চার যাঁদের ভালো লাগে না। যাঁর বিচার ভালো লাগে—তিনি বিচারের মাধ্যমেই পরোক্ষজ্ঞান লাভ করতে পারেন। এইখানে আমরা নিদিধ্যাসন বলে একটি কথা পাই। র অর্থ ধ্যান নয়, অপরোক্ষজ্ঞান। প্রথমে আমার যথেষ্ট সংশয় ছিল। এই মায়ারূপিণী গৎকেই আমার সত্য বলে মনে হতো। জগৎকারণ ব্রহ্মকে আমার মনে হতো, সে াবার কি ? যা আছে, যা ভীষণভাবে আছে তা নেই আর আপাত দৃষ্টিতে যা নেই, সইটাই পরম সত্য তা কেমন করে হয়। এ তো মহা ধন্দ। অথচ মনে হচ্ছে কোথায় কটা গোলমাল হচ্ছে। যমরাজ নচিকেতাকে বললেন—তুমি আমার কাছে অন্য কিছু ার্থনা করো, অন্য বর চাও :

এতুত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি॥

প্রভূত বিত্ত নাও তুমি, বংশানুক্রমে জীবিকানির্বাহের উপায় অথবা চিরজীবন। বিস্তীর্ণ খণ্ডে তুমি রাজা হও, স্বর্গীয়, পার্থিব সমস্ত কাম্য বস্তুর ভোক্তা। তুমি হও নচিকেতা। াত্মতত্ত্ব জানতে চেয়ো না। সে বড় গূঢ়, গোপন কথা। এই পৃথিবীতে যে সকল াম্যপদার্থ অতি দুর্লভ সেই সমস্ত তুমি ইচ্ছামত প্রার্থনা করো। যেমন ধরো রথারূঢ়, াদ্যযন্ত্র সমন্বিত রমণীসকল। তারা তোমার পরিচর্যা করবে। কিন্তু হে নচিকেতা, মরণ-

বিষয়ক প্রশ্ন আর আমাকে জিজ্ঞাসা কোনো না।

নচিকেতা হাসলেন—প্রভু ! আপনি যা আমাকে দিতে চান—তা অতি ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই। মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তির ক্ষয়কারী। আমাকে গলিত, জরিত করে দেবে। আর দীর্ঘজীবনের লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে ? সে কত দীর্ঘ ! অনন্তকালের তুলনায় কতটুকু ? এই রথ, এই অশ্ব, নৃত্য-গীত, সুন্দরী রমণী সব আপনারই থাক :

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্য গীতে ॥

নচিকেতার এই ভাব আমাদেরও গ্রাস করে জীবন অনেকটা চলে আসার পর। সংসারকে মনে হতে থাকে ছায়াসংসার। তখনই তৈরি হয় সংশয়। তখনই মনে হয়, আচ্ছা তাহলে দেখি ব্যাপারটা কি ! তখনই বিচার, পুনঃ পুনঃ বিচার। ধ্যান নয়, নিদিধ্যাসন। বিচার মার্গ। ঠাকুর বলছেন— 'মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। আমি কে ! —ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোনোও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি—এর কোনটা আমি ? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার কল্লে, আমি কিছু পাইনে ! শেষে যা থাকে, তাই আত্ম, চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন।'

শাস্ত্রকার বলছেন দুটি মার্গ ! মুখ্য আর অমুখ্য অধিকারীর দুটি পথ— 'পিপীলিকামার্গ' আর 'বিহঙ্গম বা শুক-মার্গ'। আহা ! সে বড় সুন্দর কথা ! বড় আনন্দ !

এগিয়ে চলো

যে যত পায় সে তত চায়, এই হলো সংসারের কথা। সংসারী মানুষের চাহিদার শেষ নেই। নিবৃত্তি নেই। কথাটা যদি উল্টে নিই, যে যত চায় সে তত পায়, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল ধর্মের কথা, সাধনজগতের কথা। এই জগতে যে যত চাইবে সে তত পাবে। অফুরন্ত ! নিয়ে শেষ করা যাবে না। কিভাবে ? সেও খুব মজার। যত ছাড়বে তত পাবে। জাগতিক জিনিস যত ছাড়বে, যত রিক্ত হবে তত পূর্ণ হবে অন্যভাবে। ভোগে নয় ত্যাগেই আছে পূর্ণতা।

এ আবার কি কথা ! সব যদি ছেড়েই দিলুম, তাহলে আমার রইলটা কি ? রইলে তুমি ! আমার মা আছেন আর আমি আছি সংসারে। মাঝখানে আর কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন : "লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য একঘটি কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে ? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ির কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দুড়দুড় করে এসে ছেলেকে কোলে লয়।"

চুষি ফেলে দিতে হবে। চুষি কি ? স্ত্রী, পুত্র-পরিবার, টাকা, যশ-খ্যাতি, প্রতিপত্তি। নিশ্ছিদ্র একটা বাতাবরণ। তার মধ্যে বসে শৌখিন ভগবত-স্মরণ। একটু চোখ বুজে বসে রইলুম, মনে করলুম খুব ধ্যান হলো। এক রাউন্ড কর গুনলুম, হয়ে গেল জপ। তিনবার গম্ভীর গলায় 'ঠাকুর ঠাকুর' করলুম। ঠাকুর অমনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। 'এসে গেছি, আমার নিষ্কাম ভক্ত ! তোমার ডাকের কি জোর ছোকরা, যেন ফেরিওয়ালা হাঁকছে, স্টিলের বাসন। ঐ মোড়ের মাথা থেকে শোনা যাচ্ছে। বৎস, মুখের ডাকে কিছু হবে না। মনে ডাকো।' সাধন মানে স্লোগান নয়। ধারাপাতের নামতা পড়া নয়। দু এককে দুই, দুই দুগুণে চার। সাধন মানে সার্কাস নয়। মন-মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি, 'হে ভগবান ! তুমি আমার সর্বস্ব ধন' এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েছি—এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল হয়।

ছুঁচের মতো সূক্ষ্ম সেই মহিমময়ের রাজত্বের প্রবেশপথ। সেখানে প্রবেশ করতে হবে মন দিয়ে। সেই মনটি কেমন হওয়া চাই ? ঠাকুর বলছেন : "বাসনার লেশমাত্র থাকতে ভগবানলাভ হয় না। যেমন সুতোতে একটু ফেঁসো বেরিয়ে থাকলে ছুঁচের ভেতর যায়

না। মন যখন বাসনারহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

বাসনা ত্যাগ করতে হবে। মুখে ত্যাগ করা খুব সহজ। বলে দিলুম ত্যাগ। গেল ত্যাগ। ভিতরে কিন্তু সব গজগজ করছে মটরের দানার মতো। ঠাকুরের সেই বিখ্যাত উপমা—"পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজগজ করে, সেইরকম বদ্ধ জীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয়বাসনা তাদের ভেতর গজগজ করছে। বিষয়ই তাদের ভাল লাগে, ধর্মকথা ভাল লাগে না।" এমনও হয়, ধর্মের মধ্যে আছি, মহাপুরুষের সঙ্গে দিনাতিপাত করছি, তিনি আমাকে কৃপা করতে চাইছেন, আমাকে জ্যোতির্ময় লোকের সন্ধান দিতে চাইছেন, তবু আমার হচ্ছে না। আমার আসছে না। আমি মজে আছি অন্য রসে।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ জমায়েতে আসতেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরের কৃপাধন্য গৃহী-শিষ্যদের অন্যতম। আদি নিবাস ছিল ঢাকায়। সেখান থেকে এসে বসবাস শুরু করেন হালিশহরে। তিনি ঢাকার সরকারি অফিসে অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করতেন। ১৮৮০-তে ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। তাঁর এই পথের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সংস্কার ছিল। অনেক কিছু করেছিলেন। প্রথমজীবনে ব্রাহ্মসমাজ, কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শরণাগত। তিনি যখন ঢাকায় ছিলেন, সেইসময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে তাঁর আলোচনা হতো। ঢাকা থেকে কলকাতায় এলেই ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে ছুটতেন। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেদারনাথের তর্ক বাঁধিয়ে দিয়ে বেশ মজা পেতেন।

সেই কেদারনাথ সম্পর্কে ঠাকুর বলছেন সাঙ্ঘাতিক কথা : "কেদারকে বললুম, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হলো, একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি,—কিন্তু পারলুম না। ভিতরে অঙ্কট-বঙ্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, ঢুকতে পারলাম না। যেমন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ কাশী পর্যন্ত জড়। সংসারে আসক্তি—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে হবে না।"

এই যে 'অঙ্কট-বঙ্কট', এ যাবে কি করে ! মানুষ বড় কিছু পাবার জন্যে ছোট জিনিস ত্যাগ করে। নিজেকে প্রস্তুত করে। হীরে পাবার আশা থাকলে কাঁচ ফেলে দেয়। অঙ্কট-বঙ্কট সরাতে পারলে কি লাভ হবে ? সমাধি লাভ হবে। ঠাকুর বলছেন : "সমাধি মোটামুটি দুইরকম। জ্ঞানের পথে, বিচার করতে করতে অহং নাশের পর যে সমাধি, তাকে স্থিতসমাধি বা জড়সমাধি (নির্বিকল্প সমাধি) বলে। ভক্তিপথের সমাধিকে ভাবসমাধি বলে। এতে সম্ভোগের জন্য, আস্বাদনের জন্য, রেখার মতো একটু অহং থাকে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে এসব ধারণা হয় না।"

কি সুন্দর কথা, রেখার মতো, সোনার সুতোর মতো একটু অহঙ্কার !

কি তাহলে সেই বড় প্রত্যাশা ? ভাব। ভাবে আমি সমাহিত হব। তার আগে জানতে হবে মনের সাতটি ভূমি কি কি ? ঠাকুরই আমাকে বুঝিয়ে দেবেন। "বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। জ্ঞানপথ—বড় কঠিন পথ। বিষয়বুদ্ধির—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না। এ-পথ কলিযুগের পক্ষে নয়। এই সম্বন্ধে

বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। এই সাতভূমি মনের স্থান।

যখন সংসারে মন থাকে—তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের অবস্থান। মনের বাসস্থান। মনের তখন উর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে।

মনের চতুর্থভূমি—হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে-ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, 'একি ! একি !' তখন আর নিচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

মনের পঞ্চমভূমি—কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।

মনের ষষ্ঠভূমি—কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে-ব্যক্তি সেই নিরূপম রূপদর্শন করে, উন্মত্ত হয়ে সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম ছুঁলাম, কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না।

মনের সপ্তভূমি—শিরোদেশ। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর বেশি দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু।"

তাহলে সেই বৃহৎ প্রত্যাশাটা কি—যার জন্যে আঁষচুবড়ির মতো এই সংসারকে ছাড়ব ? এ তো ঠাকুরেরই সেই পথিকের গল্প—'এগিয়ে যাও'। দেহ-পথে মন-পথিকের ভ্রমণ। "এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ এনে কোনরকমে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাত। একদিন জঙ্গল থেকে সরু সরু কাঠ কেটে মাথায় করে আনছে, হঠাৎ একজন লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে ডেকে বললে, "বাপু, এগিয়ে যাও।' পরদিন কাঠুরে সেই লোকের কথা শুনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মোটা মোটা কাঠের জঙ্গল দেখতে পেলে ; সেদিন যতদূর পারলে কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি পয়সা পেলে। পরদিন আবার সে মনে মনে ভাবতে লাগল, তিনি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন ; ভাল, আজ আর একটু এগিয়ে দেখি না কেন। সে এগিয়ে গিয়ে চন্দন কাঠের বন দেখতে পেলে। সে সেই চন্দনকাঠ মাথায় করে নিয়ে বাজারে বেচে অনেক বেশি টাকা পেলে। পরদিন আবার মনে করলে, আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন। সে সেদিন আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে তামার খনি দেখতে পেল। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগল—ক্রমে ক্রমে রূপা, সোনা, হীরার খনি পেয়ে মহা ধনী হয়ে পড়ল। ধর্মপথেরও ঐরূপ। কেবল এগিয়ে যাও। একটু আধটু রূপ, জ্যোতিঃ দেখে বা সিদ্ধাই লাভ করে আহ্লাদে মনে করো না যে, আমার সব হয়ে গেছে।"

শুধু এগিয়ে যাও, যত চাইবে ততই পাবে। 'যতই না পাবে তত পেতে চাবে, ততই বাড়িবে পিপাসা তাহার।' এখন প্রশ্ন হলো, কি করে এগুব ! মনের তো পা নেই। ডানা আছে। স্বভাবে মাছি। অথবা বানরের মতো চঞ্চল। বিচারের বেড়া দিয়ে তাকে আটকাতে হবে। ঠাকুরের নির্দেশ :

১। বিষয়ের কথা একেবারে ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বলো না। বিষয়ী লোক দেখলে আস্তে আস্তে সরে যাবে।

২। ভাববে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বরই সত্য, আর সব দুদিনের জন্য সংসারে আছে কি ?

৩। একটু নির্জন দরকার। নির্জন না হলে মন স্থির হবে না। তাই বাড়ি থেকে আধপো অন্তরে ধ্যানের জায়গা করতে হয়।

৪। আর আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেই শুনবেন।

৫। অভ্যাসযোগ। রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। একদিনে হয় না ; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।

৬। সব কাজ ফেলে সন্ধ্যার সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে। অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে ; সব এই দেখা যাচ্ছিল।—কে এমন করলে ! মোসলমানেরা দেখো সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে নামাজটি পড়বে। জপ থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন। যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাদুরী কাঠ আছে—তীরেতে শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক এক পাব ধরে ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়। পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল।

৭। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়।

৮। শুদ্ধাভক্তিই সার, আর সব মিথ্যা। এই ভক্তি কিরূপে হয় ? প্রথমে সাধুসঙ্গ করতে হয়। সাধুসঙ্গ করলে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না।

৯। তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়—বীরভাব, সখীভাব বা দাসীভাব আর সন্তানভাব।

১০। পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।

১১। তাঁকে পেতে গেলে বীর্যধারণ করতে হয়। শুকদেবাদি ঊর্ধ্বরেতা। এঁদের রেতঃপাত কখনও হয় নাই। আর এক আছে ধৈর্যরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্যধারণ। বার বছর ধৈর্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নতুন নাড়ী হয়, তার নাম মেধানাড়ী।

১২। তিন টান এক কর—সতীর পতির ওপর টান, মায়ের সন্তানের ওপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান—এই তিন টান যদি একত্র হয়, তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।

১৩। তাঁর নাম গুণকীর্তন সর্বদা করতে হয়।

১৪। খুব রোখ চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। 'আমি আর আমার' অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে যাকে 'আমি আমি' করছ, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর, তুমি শরীর না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে, তুমি কিছু নও।

১৫। ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন। কর্তাভজারা মন্ত্র দেবার সময় বলে, এখন 'মন তোর'। অর্থাৎ এখন সব তোর মনের ওপর নির্ভর করছে। তারা বলে, 'যার ঠিক মন তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ।'

১৬। যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহংকার থাকতে মুক্তি নেই। নিচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতকপাখির বাসা নিচে, কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে।

১৭। একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়।

১৮। সকলেরই জ্ঞান হতে পারে, প্রার্থনা কর। রোজ অভ্যাস করতে হয়। সার্কাসে দেখে এলাম ঘোড়া দৌড়াচ্ছে তার ওপর বিবি একপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত অভ্যাসে ঐটি হয়েছে। এই দুটি উপায়—অভ্যাস আর অনুরাগ।

১৯। তমোগুণ ছাড়তে হবে—নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহংকার এইসব। সত্ত্বগুণের সাধনা করতে হয়। যে-ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়তো মশারির ভিতর ধ্যান করে। সবাই জানছে, ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয়নি, তাই উঠতে দেরি হচ্ছে। এদিকে শরীরের ওপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত। শাকান্ন পেলেই হলো। খাবারের ঘটা নেই। পোশাকের আড়ম্বর নেই। বাড়ির আসবাবের জাঁকজমক নেই। আর সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনো তোষামোদ করে ধন লয় না।

২০। কেঁদে নির্জনে প্রার্থনা করবে। বলবে, হে ঈশ্বর, আমার বিষয়কর্ম কমিয়ে দাও। কেননা ঠাকুর, দেখছি যে বেশি কর্ম জুটলে তোমায় ভুলে যাই। মনে করছি, নিষ্কামকর্ম করছি, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়। ভক্তিই সার।

২১। জপের সময় অন্যমনস্ক হবে না। ষোল আনা মন দিতে হয়।

২২। ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ—কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ—কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।

এই ভাবে ধীরে ধীরে সাবধানে, সন্তর্পণে। মানুষ যখন বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় তখন কি করে? যা যা সঙ্গে যাবে, সব গোছগাছ করে একটা বেডিং তৈরি করে। হোল্ডল, সুটকেস একপাশে রেখে অপেক্ষা করে ট্রেনের। প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেয় না। কামরায় উঠে বাঙ্কের ওপর সব গুছিয়ে রেখে আসনে বসে পড়ে। ঠিক

সেইরকম সাধনার মেল-ট্রেনে মন যাত্রী। তার লাগেজে সত্ত্বগুণ। সংসারের স্টেশানে গাড়ি ভিড়ছে—রোগ, শোক, বিপদ, আপদ, জরা, ব্যাধি। হকারের হৃহচহ। পাওনাদার-ব্যবসাদার। আত্মীয়-স্বজনের ওঠা-নামা। যাত্রী-মন বসে আছে। বৈঠিয়ে আপনা ঠাম—হাঁ জী, হাঁ জী করছে। আর মেখেছে কী ? না বিবেক-হলদি।

"সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক।" বহু ভেন্ডার লোভনীয় অখাদ্য, কুখাদ্য নিয়ে উঠছে। মন প্রলোভিত হচ্ছে। কিন্তু মনের হাত ধরে আছেন পিতা। সঙ্গে আছে টিফিন বক্‌স। বাইরের খাবার চলবে না। "সঙ্গেতে সম্বল আছে পুণ্যধন।" মন চলেছে নিজ-নিকেতনে। সংসার-বিদেশ ছেড়ে।

"সংসার দুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
রামকৃষ্ণ মম দেহিপদাবলম্বম্॥"
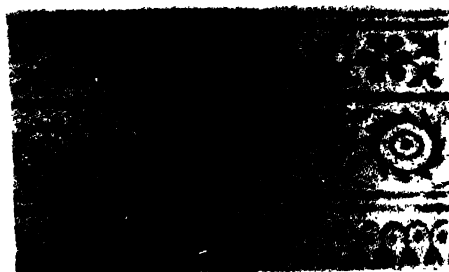
সেই আবেগে

কি করে কি হয়। ঠাকুর বলছেন, 'প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশি পরিশ্রম করতে হবে না।' এই উঠেপড়ে লাগাটা কি রকম! ঠাকুরই দিয়েছেন পথের নির্দেশ। তাঁর মতে, কাম-কাঞ্চনের ঝড়-তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি। কাম-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। কিসের সঙ্গে যোগ? তাঁর সঙ্গে যোগ। তিনি কে? তাঁর বিশেষণ আমরা জানি। তাঁকে আমরা জানি না। বিশেষণ হলো— সৎ-চিৎ-আনন্দ। তিনি সচ্চিদানন্দ। সেই যোগে মানুষ সৎ হবে। নিজের সঙ্গে নিজের যোগে হবে। চিৎকে, চৈতন্যকে সে খুঁজে পাবে। স্বরূপের দর্শন পাবে। ফলে সে আনন্দের সন্ধান পাবে। মানুষের সমস্ত নিরানন্দের কারণ আসক্তি। আসক্তি তার ভয়ঙ্কর দুটি বস্তুতে—কাম আর কাঞ্চন। দুটি বস্তু গাঁটছড়ায় বাঁধা। কামের জন্য প্রয়োজন কাঞ্চনের। আবার কাঞ্চন এলে আসবে কাম। এই দুই বস্তু মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অস্বীকার করার উপায় নেই। এ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। উঠেপড়ে লাগা মানে, কাম-কাঞ্চনের মোহ থেকে দূরে থাকা। দূরে থাকা মানে মন থেকে দূর করা। মন থেকে তাড়াতে না পারলে মন ছোঁকছোঁক করবে। ঠাকুর বলছেন, 'মনই সব জানবে। জ্ঞানই বলো আর অজ্ঞানই বলো, সবই মনের অবস্থা। মানুষ মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত, মনেই সাধু এবং মনেই অসাধু, মনেই পাপী ও মনেই পুণ্যবান। তার মানে পথ হলো সুদৃঢ় ইচ্ছা, বাহন হলো মন। মাঝি গোপীদের বলেছিলেন—এক মন না হলে আমি যমুনা পার করি না। গোপীরা ভাবলেন, মাঝি বুঝি ওজনের কথা বলছে, না, ওজন নয়, মাঝি বলছেন মনের কথা। এক মন, এক কৃষ্ণ। মনে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেউ ঢুকে থাকলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। এক কৃষ্ণ, এক রাধা। মনকে রাধা করতে না পারলে, কৃষ্ণ-সাধা হবে না। ভড়ং হবে, ভণ্ডামি হবে আর মনে বজবজ করবে দুই 'ক'-এর আসক্তি। পথ বড় কঠিন। উপনিষদ বলছেন :

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

—যাঁরা জানেন, যাঁরা বিবেকবান তাঁরা বলেন, ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমন দুরতিক্রমণীয়, আত্মজ্ঞান লাভের পথও সেইরকম দুর্গম। তাহলে কি হবে? উপনিষদ

বলছেন :

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

—তোমরা ওঠো। আত্মজ্ঞানের সন্ধান কর। সন্ধান পাবে কোথায়? শ্রেষ্ঠ আচার্যের সঙ্গ কর। তিনি তোমাকে আত্মজ্ঞানের সন্ধান দেবেন। তিনি বলবেন, 'বাসনার লেশমাত্র থাকতে ভগবান লাভ হয় না। যেমন সুতোতে একটু ফেঁসো বেরিয়ে থাকলে ছুঁচের ভিতর যায় না। মন যখন বাসনারহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।'

এই বাসনাহীন মন কেমন? ঠাকুর বলছেন : যেন শুকনো দেশলাই—একবার ঘষলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। আর ভিজে হলে ঘষতে ঘষতে কাটি ভেঙে গেলেও জ্বলে না। সেই মতো সরল, সত্যনিষ্ঠ, নির্মল-স্বভাব লোককে একবার উপদেশ দিলেই ঈশ্বরানুরাগের উদয় হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে শত শতবার উপদেশ করলেও কিছু হয় না।'

পথের নির্দেশ তাহলে পাওয়া গেল ঠাকুরের কথায়—প্রথম সাধুসঙ্গ। সদ্‌গুরু চাই জীবনে। গুরুকে চাইবার আগে নিজের মানসিক প্রস্তুতি চাই। যেমন, আমরা স্নান করি দেহশুদ্ধির জন্যে, সেইরকম মানস-শুদ্ধির জন্যে প্রয়োজন সঙ্কল্প-স্নানের। সেই স্নানে মনে হবে সরল, হবে সত্যনিষ্ঠ, হবে নির্মল। এই তিন গুণ নিয়ে যেতে হবে গুরুর কাছে। কারণ এমন আকাঙ্ক্ষীকেই একবার উপদেশ দিলেই ঈশ্বরানুরাগের উদয় হয়। অনুরাগের উদয় হলো, তবু বাকি রয়ে গেল অনেক পথ। অনুরাগ মানে রুচি। নামে রুচি। অন্যকথা, বিষয়কথা ভালো লাগছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, মনে বনে কোনে নির্জনে কিছু ভাবি। সংসারের সব কাজই করছি বড় লোকের দাসীর মতো। আমার আমার করছি বটে ; কিন্তু বেশ একটা বোধ ক্রমেই জন্মাচ্ছে, এর কিছুই আমার নয়। অনুরাগ থেকে আসবে বিরাগ—বৈরাগ্য। বড়লোকের দাসীর মন পড়ে থাকে নিজের বাড়ির দিকে। সেই নিজের বাড়ি হলো, নিজের ভেতর। আলোকিত, মোহমুক্ত, নির্ভার এক অবস্থা। বাইরে থেকে ভিতরে আসতে হলে চাই অনাসক্তি। তুলসীদাসজীর কথা—"সব ছাড়োয়ে সব পাওয়ে।" বৈরাগ্য থেকে আসবে অভাববোধ। তৃপ্তি নেই কোনোও কিছুতেই। শঙ্কর যেমন বলেছেন—"ন যোগে, ন ভোগে, ন বাজিমেধে।" ভোগ, যোগ, বিষয়কর্ম, কোনোও কিছুই আর ভালো লাগছে না, জীবনে এক শূন্যতা। এই অবস্থা হলো বিরহের অবস্থা। সব শরীর জ্বলে যাচ্ছে। [illegible] অবস্থা। কৃষ্ণবিরহে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। শীতল শিলায় শয়ন করলে পাথর পুড়ে যাচ্ছে। মহাপ্রভুর অবস্থা। ঠাকুর বলছেন—পাওয়া যায় তাঁকে ; কিন্তু সেই আকুতি চাই। [illegible] গুরু শিষ্যকে জলে চুবিয়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ রেখেই ছেড়ে দিলেন। শিষ্য [illegible] আপ্রাণ ছটফটিয়ে মাথা জলের ওপর তুললো। গুরু বললেন, "কি বুঝলে? যা বুঝলে সেই বোধ লাগাও ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য। ঠিক ওই রকমটি হলে তবেই তাঁকে পাওয়া যায়।"

এইবার আমার প্রশ্ন আমার কাছে—পারবে ওই ছটফটানি আনতে? অ্যামেচার সাধক, সারা জীবন 'সেয়ান পাগল, বুঁচকি বগল' হয়েই কাটবে নাকি? কৃপা করুন কৃপাময়।

একটু চেষ্টা

জীবনে একটা কিছু ধরতে হয়, কোনও একজনকে ধরতে হয়, কিংবা কোনও একটা বিশ্বাসকে। একটা আলো, যা আমাদের পথকে আলোকিত করবে। জীবনের শূন্যতা ভরে দেবে, যখন দিশা হারাবো তখন এসে হাত ধরবেন। কি সেই বিশ্বাস ? কার সেই হাত ! মানুষের ! বিশ্বাস ! সে কি ভগবৎ বিশ্বাস ! মানুষ জীবনে প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক কিছু ধরতে ছোটে অনেক সময়। বাল্যে ছুটেছি লোভের পেছনে, যৌবনে ভোগের পেছনে, বার্ধক্যে হতাশা এসে হাত ধরেছে। তখন সেই করুণ সঙ্গীত—জীবন আমার বিফলে গেল, লাগিলো না কোনও কাজে।

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে এই ভাবেই ভেসে চলেছে শত-সহস্র জীবন। মাঝে মাঝে খোঁচা মারছে প্রশ্ন, কেন এলুম, কি করতেই বা এলুম, এখানের পাট চুকিয়ে যাবই বা কোথায়। মানুষের শেষটা কি ? প্রশ্ন আসে কিন্তু দাঁড়াবার জমি পায় না। প্রাত্যহিকতায় ভেসে চলে যায়। আমরা দুই আর দুইয়ে চার, সাত আর দুইয়ে নয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। চাকরি, প্রোমোশান, ছেলের এডুকেশান, মেয়ের বিয়ে, বাতের ব্যথা, তিন কামরার ফ্ল্যাট, ইনকাম ট্যাক্স, ওয়ার্লড কাপ এইসব নিয়ে এমন মেতে যাই, কোনও কিছুই আর খেয়াল থাকে না। হয়তো পুরীতে গেলাম। ফিরে এসে প্রভু জগন্নাথের কথা না বলে, বলতে থাকি ভোগের কথা, মহাপ্রসাদের কথা। গেলাম দেওঘর, সাতকাহন করে শুরু করলাম প্যাঁড়ার সমালোচনা, আগে কি ছিল, এখন কি হয়েছে।

যে ভেবেছিল পৃথিবীতে টাকাটাই বুঝি সব, গাড়ি, বাড়ি, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হয়ে যাবার পর দেখলে, নাঃ, কি যেন একটা নেই, শান্তি। কি যেন একটা নেই, বৈচিত্র্য। সেই একদিন, একরাত। মনে হতে থাকে, বড় নিঃসঙ্গ আমি। মনে হয়, সবই আছে, নেই প্রেম। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বড়ই অভাব, সর্বত্র দেহি, দেহি। চারপাশে যারা আছে তারা সকলেই উমেদার। সংসারে যতক্ষণ দিতে পারা যায় ততক্ষণই খাতির। স্বার্থের সুতোয় টান পড়লেই সব মুখোশ খুলে যায়, স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। এই উপলব্ধি থেকেই আসে হাহাকার—'আমি কোথায় পাবো তারে ?' কারে ? যে আমাকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে পারে। এই হাহাকারই দেয় সেই বোধ —ওরে আমি বদ্ধজীব। অষ্টপাশ আমায় বেঁধেছে।

ওই ভাবনাটুকুই সার। কারণ ঠাকুর সংসারী জীবের ধরনধারণ খুব ভালো বুঝতেন।

এই ব্যাপারে তাঁর সুন্দর সেই গল্প, "উট কাঁটাঘাস বড়ো ভালবাসে। কিন্তু যত মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে ; তবুও সেই কাঁটাঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এতো শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হলো, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল কতো শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো। এরকম লোক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভালো ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।" "আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়! গিলতেও পারে না, আবার উগরাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয় তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই সার নাঁই ; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।"

এই 'সাপের ছুঁচো গেলা' সংসারীদের তাহলে কি হবে! যারা বুঝেছে অথবা বোঝাতে পারছে না। দেহে বেরনোর প্রশ্নই আসছে না। লাইন দিয়ে পাড়াকে পাড়া সব সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, "এমন দিন কি হবে মা তারা!" মনে বেরনো। মনে মুক্ত হওয়া। মনটাকে বের করে আনা। বের করে এনে সঁপে দেওয়া। তাঁর হাতে। তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী, তুমি যেমন করাও তেমনি করি। আমি জানি, ঠাকুর বলে গেছেন : "বদ্ধ জীবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে আনা হয়, ভালো জায়গায় রাখা যায়, তাহলে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখো, তাহলে মরে যাবে।"

আমি তাহলে কাকে ধরব? ঠাকুরকেই ধরব। ঈশ্বর অনেক দূরে। আমার সেই পদ্মলোচন পণ্ডিতের অবস্থা। বিচারসভার বিচার হচ্ছে—শিব বড়, না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচনকে প্রশ্ন করলেন পণ্ডিতরা। ঠাকুর বলছেন : "পদ্মলোচন এমনি সরল, সে বললে, আমার চৌদ্দ পুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।" আমারও সেই একই অবস্থা, আমি ঈশ্বরের কথা শুনেছি, দেখিনি কোনও দিন। আমার মতো অপদার্থকে দেখা দেবেনও না কোনোদিন। এই সৃষ্টি কার, তাও জানি না। বিজ্ঞান বলে এক, পরা-বিজ্ঞান বলে আর এক। এইটুকু বুঝি, জীবন জ্বলছে, পুড়ছে। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধিতে ধামসাচ্ছে। যত মার খাচ্ছি ততই সরে আসছি আমার করুণাময় ঠাকুরের দিকে। দেরি হয়ে গেছে ঠিকই, তবু এখনও সময় আছে। চীনা প্রবাদ বলে, সুপুত্রের পরিচয় মেলে পিতার প্রয়াণের পর। তখন দেখতে হয়, সে পিতার পথ কতটা ধরে রাখতে পারছে। আমিও সেই সুপুত্র হতে চাই। ঠাকুরের পথ ধরে। সহসা সরব না। শত প্রলোভনেও না। তিনি আমাকে দিয়েছেন বিশ্বাস। তিনি আমাকে পূর্ব ও পরজন্মের বিশ্বাস দিয়েছেন। চুলোয় যাক বিজ্ঞান। ঠাকুর বলছেন, "পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শবসাধনা করছিল ; গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগলো। শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে নেমে

আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ করতে করতে মা সাক্ষাৎকার দিলেন ও বললেন— আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে—মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি। যে ব্যক্তি এতো খেটে, এতো আয়োজন করে, এতদিন ধরে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হলো না। আর আমি কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এতো কৃপা হলো। ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, বাছা। তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তোমার এরূপ জোটপাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে।"

জন্মান্তরে বিশ্বাস ঠাকুরই আমাকে দিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসেই এজন্মের বেচাল আমার নিয়ন্ত্রিত। যতটা পারা যায় নিজেকে সৎ রাখা, বিষয়-বিমুখ করে রাখা, সতর্ক দৃষ্টি রাখা ইষ্ট থেকে মন যেন না সরে যায়। এ-জন্মে না পাই, পরের জন্মে, পরের জন্মে না হলে তার পরের জন্ম। কোনও এক জন্মে পাব নিশ্চয়। ঠাকুর বলেছেন : "বাঘ যেমন কপকপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি অনুরাগের বাঘ কাম-ক্রোধ এইসব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাদি থাকে না।" এজীবনে অনুরাগটাও যদি হয়। ঠাকুর বলেছিলেন : "যারা কেবল কামিনীকাঞ্চন নিয়ে আছে—ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, তারা বদ্ধজীব। তাদের দিয়ে কি মহৎ কাজ হবে ? যেমন কাকে ঠোকরানো আম ঠাকুরসেবায় লাগে না, নিজে খেতেও সন্দেহ।"

কাকে ঠোকরানো আম তিনি অপছন্দ করতেন। আমাকে যাতে কাম-কাঞ্চন না ঠোকরায় সতর্ক হবার চেষ্টা করতে হবে আপ্রাণ। "সংসারী জীব, এরা যেমন গুটিপোকা।" আমি সেই গুটিপোকা হবো না। ঠাকুর বলেছেন : "মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে ; কিন্তু নিজের ঘর বানিয়েছে, ছেড়ে আসতে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু।" না গুটিপোকার মৃত্যু আমার কাম্য নয়। "যারা মুক্ত জীব, তারা কামিনীকাঞ্চনের বশ নয়। কোনো কোনো গুটিপোকা অতো যত্নের গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। সে কিন্তু দু-একটা।" সেই দু-একটার একটাও কি আমি হতে পারব না ! কিভাবে ! "একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়িতে কেবল বিষয়ের কথা। পাখি দাঁড়ে বসে রামরাম বলে। বনে উড়ে গেলে আবার ক্যাঁ ক্যাঁ করবে।" আমাকে যেমন করেই হোক দাঁড়ে বসতে হবে। এই দেহমন্দির অন্ধকার রাখতে নেই। "জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়।" সেই দীপ জ্বালাবার চেষ্টা করতে হবে।

জীবনটা ছিঁড়েখুঁড়ে যাবার আগে অনুরাগের আঠা মাখতে হবে। ধরব তাঁকে, যিনি আমার হাত কোনও দিন ছাড়বেন না। তিনি কে ? আমার অটল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের ফোয়ারা কে খুলবেন ? আমার ঠাকুর।

ব্যাকুলতা

নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু। কোনও সন্দেহ নেই। এক পা তাঁর দিকে এগোই তো তিন পা পিছিয়ে আসি। এমন সব জাগতিক তুচ্ছ জিনিস চেয়ে বসি যে তাঁর দেবার ক্ষমতা থাকলেও আমার প্রতি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। যেমন খুব একটা ভিড় বাসে উঠে, আমি মনে মনে বললুম. ঠাকুর, আমি রোজ আপনাকে প্রাণমন দিয়ে ডাকি। আজ নিজেকে আমার ভীষণ দুর্বল লাগছে, একটা বসার আসন আপনি আমাকে পাইয়ে দিন। আমাকে এমন একটা আসনের পাশে দাঁড় করিয়ে দিন, যে আসনের যাত্রী পরের স্টপেজেই নেমে যাবেন।' সঙ্গে সঙ্গে মন বললে— 'তুমি ঐখানে গিয়ে দাঁড়াও'। আমি ধরেই নিলুম, এ হলো আমার ঠাকুরের নির্দেশ। কোথায় কি। সেই আসনের দুজন যাত্রী একেবারে শেষ স্টপেজে গিয়ে নামলেন। অথচ প্রথমে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকলে পরের স্টপেজেই বসার জায়গা পেয়ে যেতুম। অভিমানে আমার ঠোঁট ফুলে গেল। সিদ্ধান্তে এলুম, ঠাকুর আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আমি ঠাকুরের কেউ নই। ঠাকুরও আমার কেউ নন। পরে গভীর রাতে যখন নিজের মুখোমুখি হলুম, নিজের নির্বুদ্ধিতায় হেসে ফেললুম। ঠাকুরের কাছে আমি কি সামান্য জিনিসই না চেয়েছি। বাসে বসার একটি আসন। আত্মজ্ঞান নয়। বিবেক-বৈরাগ্য নয়। শুধু একটি আসন। সোনার দোকানে গেছি লোহার শিকল কিনতে। মূর্খ সংসারী। প্রতিজ্ঞা করলুম, এই ভুল আমি আর কোনওদিন করব না।

সাতদিনের মধ্যেই সব ভুলে গেলুম। অফিস বেরোবার আগে আকাশ ছেয়ে এল কালো মেঘে। ঠাকুরের কাছে চেয়ে বসলুম, ঠাকুর বৃষ্টিটা একটু ধরে রাখুন। অফিসে পৌঁছবার পর যেন নামে। কোথায় কি! তিন মিনিটের মধ্যেই ভেড়ে বৃষ্টি নামল। এক হাঁটু জলের তলায় তলিয়ে গেল কলকাতা। ভয়ঙ্কর অভিমানে সেই দুর্যোগের মধ্যেই নেমে পড়লুম পথে—বুঝেছি, আপনি আমাকে ভেজাতে চান। গর্তে ফেলে কর্দমাক্ত করতে চান। তবে তাই হোক। আবার গভীর রাতে জ্ঞানোদয় হলো—বোকা। বৃষ্টি হবে প্রকৃতির নিয়মে। ঠাকুর কি করবেন! মন বললে, কেন? ভক্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণ গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। যুক্তি বললে—মূর্খ! তোমার ভক্তি, তোমার বিশ্বাস কি অতদূর পৌঁছেছে। মন বললে, না। তবে? তুমি কি করে আশা কর, অলৌকিক একটা

ছু ঘটবে। তোমার ভেতরে কি সেই বালক জটিলের বিশ্বাস আছে। ঠাকুর যে-গল্পটি প্রায়ই বলতেন। বনপথে জটিল তার মধুসূদনদাদার দেখা পেয়েছিল। অথবা ঠাকুরের গল্পের সেই মেয়েটি। ঠাকুর বলছেন : "একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্প বয়সে মেয়েটি বিধবা হয়ে গিছল। স্বামীর মুখ কখনো দেখেনি। অন্য মেয়ের স্বামী আসে দেখে। সে একদিন বললে, বাবা আমার স্বামী কই? তাঁর বাবা বললেন, গোবিন্দ তোমার স্বামী। তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। মেয়েটি ঐ কথা শুনে ঘরে দরজা দিয়ে গোবিন্দকে ডেকে আর কাঁদে,—বলে গোবিন্দ! তুমি এস, আমাকে দেখা দাও। তুমি কেন আসছ না। ছোট মেয়েটির সেই কান্না শুনে ঠাকুর থাকতে পারলেন না, তাকে দেখা দিলেন।" গল্প শেষ করে ঠাকুর বলছেন : "বালকের মতো বিশ্বাস। বালক মাকে দেখবার জন্যে যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হলো তো অরুণোদয় হলো। তারপরে সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।"

সব পারি, ব্যাকুল হতে পারি না কেন? কোথায় আটকাচ্ছে? বুঝতে পেরেছি, এই পৃথিবীতে নিজেকে ঠিক ততটা অসহায় মনে করতে পারি না। জৈব অভ্যাসে যা যা প্রয়োজন, কমই পাই আর বেশিই পাই, পেয়ে তো যাচ্ছি। আপনজনেরা আমাকে ঘিরে আছে। যতই দুঃখ দিক আঘাত দিক, মনের এমন অভ্যাস, কিছুতেই মানতে চায় না যে, ওরা কেউই আমার আপনজন নয়। স্বার্থের টানাপোড়েনে বাঁধা।

ঠাকুর বললেন, বড় ধন্দে পড়েছিস তাই না। যে তাঁকে ভাবে না, সে একরকম থাকে। তার বিশ্বাস মতো সে চলে। খায়-দায়, সংসার করে। হাসে, কাঁদে, রাগে। তার দুঃখের কারণ অন্য, তার আনন্দের কারণও অন্য ; কিন্তু যার মনে তিনি ছায়া ফেলেছেন, সে মরেছে। সে বুঝতে পারছে হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে অপার আনন্দের ধারা। সে-নদী বইছে। সে-নদীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। উজ্জয়ী বাতাস বয়ে আসছে, শুধু অবগাহন করা যাচ্ছে না। সূক্ষ্ম অথচ শক্ত একটা ব্যবধান। কিছুতেই ভাঙা যাচ্ছে না। উত্তীর্ণ হওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে :

তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত।
হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখির মতো॥
অসংখ্য অপরাধী আমি জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি।
মায়াতে মোহিত হয়ে বৎসহারা গাভীর মতো॥

বলো, "কেন? পিঞ্জরের পাখির মতো হতে যাব কেন? হ্যাক! থু! সীতার মতো হও। একেবারে সব ভুল—দেহ ভুল...হাত, পা,...কোন দিকে হুঁশ নেই। কেবল চিন্তা—কোথায় রাম! শোন,

গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম,
ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥

"কাম-কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ঐ দুটি গেলেই যোগ। পরমাত্মা চুম্বক পাথর জীবাত্মা

যেন একটি সূচ—তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু সূচে যদি মাটি মাখা থাকে, টানে না। মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কাম-কাঞ্চন মাটি পরিষ্কার করতে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে—সেই জল মাটিতে লাগলে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন পরিষ্কার হবে তখন চুম্বক টেনে নেবে। যোগ তবেই হবে।"

"চাঁদমামা সকলের মামা"

যেকোন মুহূর্তে যেকোন অবস্থায় তাঁর কাছে যাওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আসর সাঙ্গ হয়নি। দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে কালের চিরপ্রবাহে ভাসমান। হাঁটাচলারও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই যানবাহনে গুঁতোগুঁতির। শুধু মনটাকে একটু ঠেলে দেওয়া—এঘর থেকে ওঘরে। ভোগের ঘর থেকে ভাবের ঘরে। নিমেষে সেই পূতসঙ্গ। ভক্তজন পরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথের কোলে তানপুরা। তিনি সুর বাঁধছেন। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন : "এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটা ভেঙে ফেলি। কি টংটং—আবার তানা নানা নেরে নূম্ হবে।" সেই বিনোদবিহারী সোম, মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র, যাঁর আর এক নাম ছিল পদ্মবিনোদ, তিনিও বসে আছেন। রসিকতা করে বলছেন : "বাঁধা আজ হবে, গান আর-একদিন হবে।" দেখছি একপাশে বসে আছেন ভবনাথ। তিনি বলছেন : "যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্তি হয়।" নরেন্দ্রনাথ তানপুরাটি কাঁধে তুলছেন। আঙুলে সুর ছাড়তে ছাড়তে। খরজের জোয়ারি এদিক-ওদিক করতে করতে গম্ভীর মুখে বলছেন : "সে না বুঝলেই হয়।" ঠাকুরের মুখে সেই স্নেহের হাসি। একটি হাত তুলে বলছেন : "ওই আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।"

সেদিনের আসরে আমি ছিলাম না। আজ আমি আছি। এখন আমার নিয়ন্ত্রণে ঠাকুরের লীলা। আমি যখন খুশি যেখানে খুশি ঢুকে পড়তে পারি। একপাশে বসে পড়তে পারি আসন পেতে।

গিরিশ বলছেন : "আপনার কথা আর কি বলব। আপনি কি সাধু?"

ঠাকুর প্রসন্ন মুখে বলছেন : "সাধু-টাধু নয়। আমার সত্যই তো সাধুবোধ নেই।"

গিরিশ বলছেন : "ফচকিমিতেও আপনাকে পারলাম না।"

আমার মুখেও হাসি ফুটবে। আমার ঠাকুর সাধু হতে যাবেন কেন? তিনি যে অবতার। অবতার বরিষ্ঠ। ঠাকুর কি বলছেন শুনি। তিনি গিরিশচন্দ্রকে সমর্থন করছেন। ফচকিমির রাজা আমি। আমি তো সবাইকে নিয়ে আনন্দের হাটবাজার বসাতে এসেছিলাম। শুনবে তাহলে কেমন ফচকে—"আমি লাল পেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বললে, আজ বড় যে রঙ, লালপাড়ের বাহার। আমি বললুম, কেশবের মন ভুলাতে

হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।"

খুব জমে গেছে আজ। একটু আগে বাইরের বারান্দায় নরেন্দ্রনাথ আর গিরিশচন্দ্রে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। আমার ঠাকুরের তো আবার শিশুর মতো কৌতূহল। জানতে চাইলেন : "কি কথা হচ্ছিল ?"

নরেন্দ্রনাথ বললেন, "আপনার কথা। আপনি লেখাপড়া জানেন না, আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা হচ্ছিল।"

ঠাকুর শিশুর মতো মুখের ভাব করে বললেন : "সত্য বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। আবার গীতার সার কি ? গীতা দশবার বললে যা হয় : 'ত্যাগী ত্যাগী'।"

আমি তো ঠাকুরের মুখে এই সার কথাটি শুনব বলেই বসেছিলাম। শাস্ত্রের অভাব নেই। অভাব নেই তর্ক-বিতর্কের। ন্যায়, শ্রুতি, স্মৃতি, সাংখ্য, বেদ, বেদান্ত। যুগ যুগ ধরে কত পণ্ডিতের কত চুলচেরা বিশ্লেষণ। তিনি কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন। তিনি এক না দুই। তিনি পুরুষ না প্রকৃতি। তিনি সাকার না নিরাকার। শ্বাস কোন নাসায় টানতে হবে, ছাড়তে হবে কোন পথে, ধরে রাখতে হবে কতক্ষণ ইত্যাদি বহুতর পন্থা ও পদ্ধতি সমন্বিত শাস্ত্রের পাহাড় জমে গেছে। এক জীবনে পড়ে শেষ করা যাবে না। আর পড়তে পড়তেই যদি জীবন শেষ হয়ে গেল তাহলে তাঁকে আর কাছে পাব কিভাবে। আমবাগানে ঢুকে যদি ডালে ডালে আমের হিসাব নিতে থাকি তাহলে আস্বাদন হবে কখন। সেই অনুভূতিতে পৌঁছতে চাই। কোন অভিনয় নয়, কোন ভণ্ডামি নয়। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই মিথ্যাকে, এই স্বপ্নকে আশ্রয় করে যে ভাবে থাকা উচিত সেই ভাবে থাকব। ঠাকুরকে ধরে ঠাকুরের লীলায় থাকব।

শুনি, এইবার ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে কি বলছেন ? ঈশ্বরকে কিভাবে পাওয়া যায় ? ঠাকুর এই মুহূর্তে তরল থেকে গভীর ভাবে চলে গেছেন। ঠাকুর বলছেন : "সরল হলে শীঘ্র ঈশ্বরলাভ হয়।" আর কাদের হয় না, কিছুতেই হয় না—সেকথাও বলছেন তিনি : "প্রথম যার বাঁকা মন, সরল নয় ; দ্বিতীয় যার শুচিবাই ; তৃতীয়, যারা সংশয়াত্মা।"

নিজের ভিতরের দিকে তাকাই। বেদ-বেদান্ত কি করবে ? ভড়ং দেখিয়ে কয়েকদিনের জন্যে কয়েকজনকে ধোঁকা দেওয়া যায়। আগে নিজের স্বরূপ খুঁজি। আমি কি সরল ? না আমি কুচুটে ! আমার কি উকিলে বুদ্ধি ? আমি কি বিষয়ী, কৃপণ ? রক্ত পরীক্ষার মতো আত্মবিশ্লেষণ করি। যদি পরীক্ষায় দেখা যায় আমি কুটিল তাহলে আমাকে সরল হতে হবে। তা না হলে ঠাকুর আমাকে এই আসর থেকে দূর করে দেবেন। বলবেন—যাও, তুমি তোমার জগৎ নিয়ে মেতে থাক। এই আসরকে কলঙ্কিত করো না। তোমার এলাকা ভিন্ন। ঠাকুর শুচিবাই বললেন কেন ? ওটা মনের বিকার। বিকারগ্রস্ত মন ঈশ্বরের কি ধারণা করবে ? তার জীবন তো শুচি-অশুচির বিচারে হারিয়ে গেছে। ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না করে সে তো নিজেই অচ্ছুৎ। আর সংশয়াত্মা। যার সবেতেই সংশয়, সে তো কারোর কথা বিশ্বাস করবে না। সে শুধু বিচার করবে। সংশয়ের জালে বিষয়ভুক মাকড়সার মতো বসে থাকবে। তার সঙ্গে ঠাকুরের কি সম্পর্ক ! একপাশে বসে বসে ভাবছি—আমি

হব। আমি সরল হব। সমস্ত সংশয় ঝেড়ে ফেলব।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলছেন, আমি শুনছি : "আর একটি কথা।" কি কথা ? "জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও। অনেকে বলে অমুক বড় জ্ঞানী, বস্তুতঃ তা নয়। বশিষ্ঠ এত বড় জ্ঞানী, পুত্রশোকে অস্থির হয়েছিল। তখন লক্ষ্মণ বললেন, 'রাম এ কি আশ্চর্য ? ইনিও এত শোকার্ত !' রাম বললেন, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে ; যার আলোবোধ আছে, তার অন্ধকারবোধও আছে, যার ভালবোধ আছে, তার মন্দবোধও আছে ; যার সুখবোধ আছে, তার দুঃখবোধও আছে। ভাই, তুমি দুই-এর পারে যাও, সুখ-দুঃখের পারে যাও, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও।' তাই বলছি, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও।" ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলছেন। আমি শুনছি। যাঁকে বলছেন, আমি তাঁর পদনখের যোগ্য নই ; কিন্তু আমি উচ্চকাঙ্ক্ষী। হয় তো পারব না, ব্যর্থ হব, তবু চেষ্টা করব।

ঠাকুর আমার মনের কথা শুনতে পেলেন। গিরিশচন্দ্র যেই বললেন : "আপনার কৃপা হলেই সব হয়। আমি কি ছিলাম কি হয়েছি।" ঠাকুর অমনি বলছেন : "ওগো তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খাও। তারপর রোগ ভাল হলো। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হলো, না আপনি ভাল হলো, কে বলবে ?"

ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন : "লক্ষ্মণ লব-কুশকে বললেন, তোরা ছেলেমানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা-পাষাণী মানবী হয়ে গেল। লব-কুশ বললে, ঠাকুর সব জানি, সব শুনেছি। পাষাণী যে মানবী হলো সে যে মুনিবাক্য ছিল। গৌতমমুনি বলেছিলেন যে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন ; তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে না মুনিবাক্যে কে বলবে বল।"

ঠাকুর আর একটু যোগ করলেন : "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। এখানে যদি তোমার চৈতন্য হয় আমাকে জানবে হেতুমাত্র। চাঁদমামা সকলের মামা। ঈশ্বর ইচ্ছায় সব হচ্ছে।"

সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র হাসতে হাসতে ঠাকুরকে প্যাঁচে ফেলে দিলেন : 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো। আমিও তো তাই বলছি।" সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন। পাশ কাটাতে চেয়েছিলেন ঠাকুর। গিরিশ ধরে ফেলেছেন, ঠাকুরই তো ঈশ্বর।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি বিখ্যাত নটের দিকে। মনে মনে বললুম, আমিও আপনার মতো সংশয়শূন্য হব। বিশ্বাস, পরিপূর্ণ বিশ্বাস। বিশ্বাস থেকে টলব না। সংস্কার আছে কিনা জানি না। না থাক, এবারে সংস্কার তৈরি হবে। পরের বারে হবে। না হয় তারও পরের বার। আশা ছাড়ছি না।

ঠাকুর বলছেন : "শাস্ত্রের সার গুরুমুখে জেনে নিতে হয়। তারপর সাধন-ভজন। একজন চিঠি লিখেছিল। চিঠিখানা পড়া হয় নাই, হারিয়ে গেল। তখন সকলে মিলে খুঁজতে লাগল। যখন চিঠিখানি পাওয়া গেল, পড়ে দেখলে পাঁচসের সন্দেশ পাঠাবে আর একখানা কাপড় পাঠাবে। তখন চিঠিটা ফেলে দিলে, আর পাঁচসের সন্দেশ আর একখানা কাপড়ের যোগাড় করতে লাগল। তেমনি শাস্ত্রের সার জেনে নিয়ে আর বই

পড়বার কি দরকার ? এখন সাধন-ভজন।"

আপনিই তো গুরু। আপনার মুখেই তো শুনছি। সুরেন্দ্রকে বলছেন। সিমুলিয়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। ডন্ট কোম্পানির মুৎসুদ্দি। প্রথম জীবনে ঘোর নাস্তিক। বন্ধু রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে ঠাকুরকে দেখতে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, অত্যন্ত অবিশ্বাসী মন নিয়ে। আর তো ফেরা হলো না অবিশ্বাসে। আটকে গেলেন অমৃতরসে। সেই মিত্রমশাই বসে আছেন ঠাকুরের পাশটিতে। ঠাকুর তাঁকে বলছেন : "সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ; তোমাদের পক্ষে তা নয়। তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।"

এই তো আমার পথ। আমি তো সন্ন্যাসী নই। গৃহী। গৃহীর পথ তো ঠাকুর বলে দিলেন। একটু নির্জনতা খুঁজে নেব। কোথাও না পাই, নিজের মনে পাবো। সেইখানেই সরে গিয়ে আকুল হয়ে ডাকব ঠাকুরকে। আর বিষয় থেকে মন তুলে নেব। তাহলেই তো ত্যাগ হলো। মনে ত্যাগ।

ঠাকুর আবার সুরেন্দ্রকে বলছেন : "মাঝে মাঝে এসো। ন্যাংটা বলত।" 'ন্যাংটা' হলেন সেই তোতাপুরী, ঠাকুরের অদ্বৈত বেদান্ত সাধনার গুরু, পাঞ্জাবের লুধিয়ানা মঠের পুরীনামা দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত অদ্বৈতবাদী নাগা সন্ন্যাসী। ঠাকুর বলছেন : "ন্যাংটা বলত, ঘটি রোজ মাজতে হয় ; তা না হলে কলঙ্ক পড়বে। সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার।"

মাঝে মাঝে কেন ? সর্বসময়েই যদি আমি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকি ! তাহলে ! মনের একটি দরজা, ভাবের দরজা খুললেই তো দেখতে পাব, তিনি বসে আছেন সপার্ষদে। শেষ তো হয়নি। ক্ষণকাল থেকে মহাকালে চলে গেছেন। ঘর থেকে গেছেন ভাবের ঘরে।

অংশে অংশে মিলে পূর্ণ

ঠাকুর সংসার করতে বারণ করেননি। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যদি হতে না পারো, তাহলে ভজন কর ; কিন্তু সংসার করবে বিদ্যারূপিণী সংসারী হও। সংসার দুর্গে বসে সস্ত্রীক সাধন—স্ত্রীর সঙ্গে। সংসার মায়া। স্ত্রীও মায়া। কিন্তু তারও প্রকারভেদ আছে। ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন : 'মায়া দুইপ্রকার, বিদ্যা এবং অবিদ্যা। তার মধ্যে বিদ্যা-মায়া দুইপ্রকার—বিবেক এবং বৈরাগ্য। এই বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়।" ঠাকুর কেন বিবাহ করলেন ? কি প্রয়োজন ছিল তাঁর ? অবশ্যই লোকশিক্ষার জন্যে। শত সন্ন্যাসী যেমন আছেন, কোটি গৃহীও তেমনি আছেন। সংসার-নরকে কে তাঁদের পথ দেখাবেন ? ঠাকুর ছিলেন গৃহীর গুরু। অদ্বৈতগুরু তোতাপুরী সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন : 'স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে ব্যক্তি যথার্থ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে ; স্ত্রী-পুরুষ ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।"

ঠাকুর নিজে বললেন : "কে বলেছে সংসার থেকে ভগবান লাভ হয় না ? মুনি-ঋষিদের অনেকেই তো সংসারী ছিলেন, তাঁদের তো ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। তবে বে-থা করবার আগে মনটা ষোলো আনা যখন নিজের হাতে থাকে, তখন এক চোট ভগবানের ভজন করে নিতে হয়। তাহলে পরে ততটা গোল বাঁধে না। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে যেমন হাতে আঠা লাগে না, ঠিক সেই মতো। তবে মন-মুখ এক করে তাঁকে ডাকতে হয়। ভাবের ঘরে চুরি হলে কিছুই হবে না। মাথায় বোঝা নিয়েও যে ভগবানের স্মরণ-মনন করে, সে তো বীর ভক্ত। সংসারে থেকে ভগবানের আরাধনা, ঠিক শবসাধনার মতো ; শবের ওপর বসে সাধন করার সময় মাঝে মাঝে তার মুখে জল-ছোলা দিতে হয়, নইলে সাধকের ঘাড় ভেঙে দেবে। পরিবারবর্গের খাবার যোগাড়টা আগে করে দিতে হয়। ঘরে চাল নেই শুনলে উপাসনার ভাব কোথায় উড়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে সংসার ছেড়ে, অন্ততঃ কিছুদিনের মতো, ভগবৎ-আরাধনা না করলে তাঁর উপর নির্ভর আসে না বা তেমন রসও পায় না।"

ঠাকুর শুধু ভক্তি বললেন না, বললেন নির্ভর। নির্ভর ভক্তিরও ঊর্ধ্বে। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়া বুকে। শ্রীমা থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসার কয়েকমাস সারাদিন নহবতে থেকে 'সংসারের' কাজকর্ম সেরে, রাত্রিতে তিনি ঠাকুরের ঘরে তাঁর শয্যায় শয়নের অনুমতি পেয়েছিলেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে পরীক্ষা করলেন : 'কি গো, তুমি কি আমায় সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ ?" মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন : "না, আমি তোমাকে সংসার-পথে কেন টানতে যাব ? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" মা কেমন করে এমন কথা বলেছিলেন। ঠাকুর জানতেন : "ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী।" একদিন ঠাকুরের পদসংবাহন করতে করতে মা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন : "আমাকে তোমার কি মনে হয় ?" ঠাকুর বললেন : "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরে জন্ম নিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।"

মা প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসছেন—এল বেহুঁশ জ্বর। পড়ে আছেন, ভূমি শয্যায় চটিতে। মা-কালী তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন : "তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বইকি, ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।" সবই মা ভবতারিণীর খেলা। তিনি জানতেন রামকৃষ্ণসম্ভাবিতকে, জানতেন সারদাসম্ভাবনাকে। তিনি জানতেন, রামকৃষ্ণ স্বল্পায়ু। যে-লীলা অবতীর্ণ হবে তাঁকে ঘিরে, তাঁর অবর্তমানে কে তা ধারণ করবে, কে প্রবাহিত করবে সেই বিচিত্র, ঐশ্বরিক লীলাতরঙ্গ। করবেন সারদা। তিনি হবেন, মা-সারদা। মা-ভবতারিণী নিজেই তো ঠাকুরের ইষ্টপথের সহায় হতে পারবেন। তিনি তো সব। মা-সারদার কি প্রয়োজন ছিল ? ঠাকুর নিজেই বলছেন : "মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা।" একবার এক যুবক ভক্ত ঠাকুরকে বলছে : "আপনাকে যারা অবতার বলে তারা ইতর।" ঠাকুর বিস্মিত। "সে কি কথা ! তুমি তাদের ছোটলোক বলছ ! তাদের না হয় চিনতেই ভুল হয়েছে। ভক্তির আতিশয্যে বলে ফেলেছে অবতার।" যুবকটি সক্রোধে বললে : "আপনি অবতার নন। আপনি স্বয়ং শিব।" সচল শিব ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সচল কালী মা সারদা।

ঠাকুর এসেছিলেন আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাতে। তিনি দেখালেন দারপরিগ্রহ ভগবান-লাভের অন্তরায় হয় না। সনাতন মতের আশ্রম মর্যাদা রক্ষায় ভার্যাগ্রহণের বিধান আছে। তিনি নিজেই বলছেন : "দশবিধ সংস্কারসম্পন্ন না হলে মনোবৃত্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, আর পূর্ণতা লাভ না করলে প্রকৃষ্টরূপে ধর্মপ্রবর্তক ও আচার্য হওয়া যায় না।" ঠাকুরের বিবাহ সাধারণ মানুষের বিবাহ-বিভ্রাট নয়। এ যেন জগতের মাতা পিতা গৌরী-শঙ্করের মিলন। তিনি স্ত্রীকে শ্রীভগবতীর মূর্তিবিগ্রহ জ্ঞানে ভক্তিপূজা করতেন। বলতেন : সারদা মহাশক্তি-স্বরূপিণী, বাগ্‌দেবী সরস্বতী। রূপদর্শন মোহিত হয়ে হীনচেতা মানুষ পাছে অপরাধগ্রস্ত হয় তাই এবার বাহ্যরূপ লুকিয়ে অন্তরে দিব্যরূপের সজ্জা করে এসেছেন। নিত্যসম্বন্ধবশতঃ আমার শরীর পালনে যুগে যুগে তাঁর আগমন। তিনি আমার

চেয়েও বড়, তিনিই আমার শক্তি।

আমার ভাবরাজ্যের অবতার ঠাকুর বড় ব্যবহারিক ছিলেন। ধর্মজগতের সমস্ত সিদ্ধান্তকে তিনি ফলিত করতে চাইতেন জীবনচর্যায়। তিনি মায়ার নতুন নামকরণ দিলেন—কামকাঞ্চন।

ঠাকুর কাঞ্চন-বিজয় করলেন এই ভাবে—এক হাতে টাকা, অপর হাতে মাটি। গঙ্গার ধারে বসে বিচার—টাকাতে কি হয়? ঘর, বাড়ি, মান, ঐশ্বর্য হয়। মাটিতেও ঠিক তাই হয়। ভগবান লাভ তো হয় না। টাকা আর মাটি তাহলে একই বস্তু। কাকবিষ্ঠা। টাকা আর মাটি দুটোই জলে যাও। গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হলো টাকা আর মাটি।

এইবার কাম-বিজয়। সেই রাতেই সেই দিব্যঘটনা। সারদা ঠাকুরের পাশে একই শয্যায় নিদ্রিত। 'ধর্মবিজ্ঞানী, অতিসাহসী গবেষক রামকৃষ্ণ' নিজের মনকে বসালেন বিচারে—

"মন ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়; সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না, সত্য বল, তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও তো এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর।"

ঠাকুর যেই হাত বাড়াতে গেলেন, অমনি গভীর সমাধি। ঠাকুর বলেছেন: "ও যদি এত ভালো না হতো, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পারে! বিবাহের পর মাকে ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম, মা আমার পত্নীর ভেতর থেকে কামভাব এককালে দূর করে দে। মা সে-কথা সত্যসত্যই শুনেছিলেন।'

ফলহারিণী-কালীপূজার সেই রাত। ঠাকুরের সেই ঘর। আলিম্পনভূষিত দেবীর পীঠে শ্রীসারদা অর্ধবাহ্যদশায় সমাসীন। কলসের মন্ত্রপূত বারি, বারেবারে সিঞ্চিত হলো তাঁর অঙ্গে। তাঁকে অভিষিক্ত করে, মন্ত্র শ্রবণ করিয়ে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ঠাকুর—

"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।"

শ্রীমা-ই ঠাকুরের প্রথম ও প্রধান শিষ্যা, আবার শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধিতা। দুজনেই সমান। অংশে অংশে মিলে পূর্ণ।

দুজনেই মার সখী

প্রশ্ন করেছিলেন গিরিশ। ঠাকুর সেদিন বলরাম মন্দিরে ভক্তসঙ্গে ভাবাবেশে রয়েছেন। তারিখটা হলো ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল। গিরিশ, শ্রীম ও অন্যান্য ভক্তরা রয়েছেন। কথা বলতে বলতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন। দেশ কাল বোধ চলে যাচ্ছে। অতি কষ্টে ভাবসম্বরণ করার চেষ্টা করছেন। ভাবে বলছেন : "এখনও তোমাদের দেখছি, কিন্তু বোধ হচ্ছে, যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ—কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এসব কিছুই মনে নেই।"

কোনও রকমে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে বলছেন : "জল খাব।" সমাধিভঙ্গের পর মন নামাবার জন্যে ঠাকুর এই কথা প্রায় বলে থাকেন। গিরিশ নতুন আসছেন। এইসব দেখেননি, জানেন না, তাই জলের সন্ধানে ব্যস্ত হলেন। ঠাকুর বারণ করছেন, আর বলছেন : "না বাপু, এখন খেতে পারব না।"

প্রকৃতিস্থ ঠাকুর তখন নিজের মহাভাবের অলৌকিক অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন। শেষে বলছেন : "আমার অবস্থা নজিরের জন্যে। তোমরা সংসার কর অনাসক্ত হয়ে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মতো। কলঙ্কসাগরে সাঁতার দেবে, তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।"

গিরিশ তখন হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন : "আপনারও তো বিয়ে আছে?" সঙ্গত প্রশ্ন। ঠাকুরের বিবাহের কি প্রয়োজন ছিল! কামিনী আর কাঞ্চন দুটির প্রতিই ঠাকুরের অসীম বিতৃষ্ণা। হাতে টাকা পড়লে আঙুল বেঁকে যায়। ঠাকুরের বর্ণনা : "সিঁথির মহিন্দর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছল রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন দিয়েছে?" রামলাল বললে, 'এখানের জন্যে দিয়েছে।' তখন মনে উঠতে লাগল যে, দুধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একবার বুকের ভিতর বিল্লি আঁচড়াতে লাগল। তখন রামলালকে গিয়ে বললাম, 'কাকে, দিয়েছে? তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে?' রামলাল বললে, 'না আপনার জন্য দিয়েছে।' তখন বললা'ম, 'না, এক্ষুণি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়, তা না হলে আমার শান্তি হবে না।"

কাঞ্চনে যাঁর আসক্তি নেই শুধু নয়, মুদ্রা স্পর্শ মাত্রে যাঁর হাত বেঁকে যায়, অন্যের

কাছে তাঁর সেবায় দেওয়া অর্থ মাঝরাতে বেড়ালের মতো আঁচড়ায়, সেই ঠাকুর আমার সংসারী ! সংসারীর জন্য তাঁর করুণা ঝরে পড়ত। তিনি আক্ষেপ করতেন : "বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে।" ঠাকুর বলতেন : 'আমার সন্তানভাব।" নারী তাঁর চোখে জননী। তাহলে কেন বিবাহ করলেন ?—গিরিশের অতি সঙ্গত সাহসী প্রশ্ন।

সেই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন . "সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন করে হবে। গলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায়, সামলাতে পারি নাই। একমতে আছে, শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্য। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল।"

ঠাকুরের কথায় সকলেই হাসলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন : "কামিনী কাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।"

বিবাহ করবে সংসারীও হবে ; কিন্তু থাকবে কি ভাবে ? সেই শিক্ষাটুকুও তো দিতে হবে গুরুর গুরু জগদ্‌গুরু অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে। শুধু মুখের উপদেশ নয়—আপনি আচরি ধর্ম। শ্রীশ্রীমা একদিন মৃদু প্রশ্ন করেছিলেন। বিবাহের অনেক বছর পরে । মা তখন যুবতী, প্রশ্নটা সরাসরি—"আমি তোমার কে ?" ঠাকুর তখন মহাভাবে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"আনন্দময়ী।"

মা আনন্দময়ী। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দেন। ঠাকুর বলছেন : "পায়ে হাত বুলায়ে দেয়, তারপর আমি আবার নমস্কার করি।"

এই ভাবে সাধারণ সংসারীরও হতে পারে, যদি তাঁরা ঠাকুরের ভাবটি ধারণ করেন। সহধর্মিণী সেবাদাসী নয়, ভোগ্যা নয়, তিনি আনন্দময়ী। মাতৃস্বরূপা। শক্তিরূপিণী। বিদ্যার সংসারে এই ভাবই খেলে। বিদ্যার সংসার হয় কিভাবে ? ঠাকুর বলছেন : "ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার, সে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন তাতে নাই। কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে, ঘরে ঘটিবাটিও আছে, হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে, এদের জন্যেও ভাবি।"

অবতারপুরুষের সংসারচিত্রটি বড় মধুর। ঠাকুরের বয়স তখন বাইশ কি তেইশ, শ্রীশ্রীমা তখন ছ-বছরের বালিকা। বিবাহ হলো। কেন বিবাহ। ঠাকুর বলছেন : "সকলে বললে, পাগল হলো, তাই তো এরা বিবাহ দিলে। উন্মাদ অবস্থা, প্রথম চিন্তা হলো, পরিবারও এইরূপ থাকবে, খাবে-দাবে।"

তিনি জগজ্জননী হবেন। ঠাকুর তাঁকে সেবা শেখাবেন, জ্ঞান দেবেন, তাঁর ভাবাদর্শ ধারণের শক্তি দেবেন। সন্তান নয়, ঠাকুরকে ধারণের জন্যে তিনি জননী হবেন। রামকৃষ্ণ-দীপাধারে তিনি হবেন তৈল, শিখা নরেন্দ্রনাথ।

মায়ের স্থান হলো নহবতে। একটি, দুটি সন্তান তো নয়, আবিশ্ব ভক্তমণ্ডলীর জননী তিনি। মা নহবতে থাকতেন, অনেক সময় জানাই যেত না, তিনি আছেন। নীরব সেবিকা। বোঝা যেত তখনই যখন নহবত থেকে ভক্তদের জন্যে আসত রুটি, ছোলার

ডাল। নহবত থেকে মাঝে মাঝে আসতেন ঠাকুরের কাছে, তাঁর সেবায়। ঠাকুর বলেইছেন, আমার সন্তান ভাব। আবার সর্বদাই ভাবে বিভোর। কে দেখবে তাঁকে। তিনি মায়ের ওপর কতটা নির্ভর করতেন, বোঝা যায় তাঁর এই উক্তিতে : 'উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে। মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত ; এমন কত দিন ! সব ভক্তি-ভক্ত ত্যাগ করলুম। জড় হলুম ! দেখলুম মাথাটা নিরাকার, প্রাণ যায় যায়। রামলালের খুড়ীকে ডাকব মনে করলুম।" আশ্চর্য নয়। অমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় ঠাকুর কাকে ডাকতে চাইছেন। শ্রীশ্রীমাকে।

আমার আত্মভোলা, জগৎভোলা ঠাকুরের সুমিষ্ট একটা দাম্পত্যজীবনও ছিল। তার চিত্র ধরা আছে এই কথায়—"আমি একজায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়িকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে। আর যাওয়া হলো না।" পরেই ঠাকুর মন্তব্য জুড়েছেন : উঃ, আমি সংসার করি নাই, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তাতেই এই। সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কিরকম বশ।"

রামকৃষ্ণ-সেবিকা মা সারদা। একটি কথায় ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পরিষ্কার। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন—প্রসঙ্গটা ছিল ইন্দ্রিয় ও জিতেন্দ্রিয়—"তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন করে ? দুজনেই মার সখী।" আর তো কিছু ভাবা যায় না ! এ-লীলা কেমন লীলা।
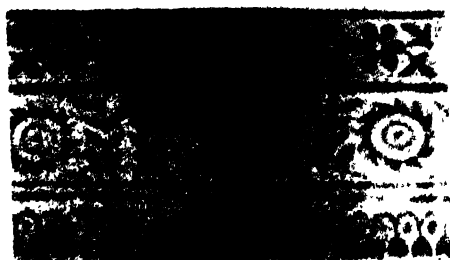
শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানীও

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী, সমাজসংস্কারক, অসাধারণ পর্যবেক্ষক, সংগঠক এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। সভ্যতার উত্থান-পতনের সংবাদ তিনি রাখতেন। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিদ, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, গীতা, চণ্ডী তন্ত্র লোকসাহিত্য সবই তিনিই পড়েছিলেন। পণ্ডিত শুধু পড়েন আর উগরে দেন। তাঁর নিজের অতুলনীয় উপমায়, পায়রার গলার মটরদানার মতো জ্ঞান গজগজ করে, হজম হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক পরিপাক শক্তিতে সব হজম করেছিলেন। যার ফলে তিনি শুধু মহাসাধক নন, হয়ে উঠেছিলেন সর্বকালের সেরা একজন জ্ঞানী। তিনি শুধু নিজের কালকে নাড়া দিয়ে যাননি, নাড়িয়ে দিয়েছেন ভবিষ্যকালের চিন্তাধারাকে। এমন একজন সুষম, উদার, ফলিত চিন্তাবিদ ইতিহাসে খুব কমই এসেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিলনা কারোর। আজও নেই। কারণ জাগতিক কোনও কিছুর প্রত্যাশা ছিল না তাঁর। কোনও কিছুর দাস ছিলেন না তিনি। তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রভু। এমনকি ধর্মের দাসত্বও তিনি করেননি। কখনও বলেননি, আমার ঘড়িই ঠিক চলছে। মন্ত্রশিষ্য করেননি। মঠ, মিশন, আশ্রম তৈরি করিয়ে গেরুয়া ধারণ করে, গুরু হয়ে বসেননি। নিজের পদযুগল এগিয়ে দিয়ে বলেননি, প্রণাম করো, আমি ওমুক সম্প্রদায়ের গুরু মহামণ্ডলেশ্বর! নীরবে, সংগোপনে চেষ্টা করো একটি মাত্র বস্তুকে ধরার। বস্তুটি হল সত্য। নিখিল বিশ্ব যে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ঘুরপাক খাচ্ছে চন্দ্র, সূর্য, তারা। রাম, রহিম, শিব, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু নিয়ে কাজিয়া কোরো না। ঈশ্বরের কোনও রূপ নেই। জগৎকারিণী মহাশক্তির নাম ঈশ্বর। দূর থেকে দেখ সমুদ্রের জল নীল, কাছে যাও, কোনও রঙ নেই। যত মত, তত পথ। পথের শেষে যাঁর দর্শন, তিনি তিনিই। তিনি কোনও সম্প্রদায়ের নন। তাঁর কোনও জাত নেই। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার ; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার ; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার ; আর দড়ি দিয়েও উঠতে পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার।

সত্য বিস্মৃত হয়ে যারা ধর্ম লড়াই করেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে ; আমি বলি, তা থাকলেই বা,

। ধর্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা অন্তর্যামী থাকলেই হল ; তাঁর উপর ভালবাসা, টান থাকলেই হল। তিনি যে অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর, এক বাপের অনেক ছেলে, বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা—এই সব স্পষ্ট বলে তাকে ডাকে আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে। যারা 'বা' কি 'পা' পর্যন্ত বলতে পারে—বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন ? বাবা জানেন যে ওরা আমাকেই ডাকছে তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।'

'আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে ; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে একঘাটে বলছে জল, মুসলমানরা আর-একঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি। ইংরেজরা আর এক-ঘাটে খাচ্ছে বলছে ওয়াটার ; আবার অন্য লোক একঘাটে বলছে aqua, এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু জ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী। আবার লাটিন ভাষাও জানতেন। তা না হলে aqua বলছেন কী ভাবে। বিজ্ঞানী এই কারণে শুধু বললে তো হবে না, শুধু পড়লে হবে না, শুধু কপচালে হবে না। দাঁড়ের চন্দনা খুব কপচায়, রাধেকৃষ্ণ তবু বেড়ালে ভয়। গ্রন্থকে গ্রন্থি করলে হবে না। তিনি বলতেন—'গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি-গাঁট বিবেক-বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা, অহংকারের গাঁট বেড়ে যায় মাত্র।' এ যেন কনফুসিয়াসের প্রতিধ্বনি—থিঙ্কিং উইদাউট রিডিং, রিডিং উইদাউট থিঙ্কিং, বোথ আর ইউসলেস। সব চিন্তাবিদই একই সত্যে উপনীত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে কিন্তু পাঁজি নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না, তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্মকথা লেখা আছে—শুধু পড়লে ধর্ম হয় না—সাধন চাই।' সত্যকে সাধন দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে বিজ্ঞানীর মতো। সব পথই সত্যধামে গেছে বললেই তো হবে না, করে দেখাতে হবে সাধনার পরীক্ষাগারে। তিনি বলছেন 'আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান আবার শাক্ত বৈষ্ণব, বেদান্ত—এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে।' শেষে কি দেখলেন ? 'দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলি আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।'

সত্য এক। সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা, কলি কোনও কালেই সত্যের সংজ্ঞা পাল্টাবে না

আর এক মহাসাধক ঠাকুর সীতারাম বলেছেন—'এ সংসারে শ্রীভগবানের নাম নিয়ে মানুষ আনন্দে থাকতে পারে, যদি পরস্পর ভেদ-জ্ঞান না থাকে। তা কি সম্ভব হয় যোগিগণ বলেন, শান্তিকামী, তুমি শ্বাসে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে আমরা সকলে একপ্রাণ অর্থাৎ নিঃশ্বাস বাহিরে পড়ল আকাশে, প্রশ্বাস আকাশ থেকে বায়ু নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল, তা হলে আমরা এক আকাশের বায়ু নিয়ে অর্থাৎ আকাশস্থ এক মহাপ্রাণের আশ্রয়ে সকলে বেঁচে আছি। আমরা সবাই একপ্রাণ, ব্যাস সব জ্বালার অবসান।'

লালনেরও একই কথা—'ধর্ম-প্রভু জগন্নাথ। চায় না রে সে জাত-অজাত। ভক্তের অধীন সে। যত জাত বিচারী/দুরাচরী/ যায় তার সব দূর হয়ে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে একজাতের মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন, 'বাবু ক্লাস'। এ

বুদের নিয়েই মহা সমস্যা। এঁদের হ্যাট, গ্যাট, ম্যাটে দেশ অশান্ত। ধর্ম আর রাজনীতি, জনীতি আর চাঁদির লড়াই কুরুক্ষেত্রের দরজা খুলে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। নতেন অস্তমিত শতাব্দিতে এমনটি হবে। তাই ভেকধারী ধর্মের জড় মেরে য়েছিলেন। মন্দিরে মাধবের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। ভোঁ ভোঁ শাঁক ফোঁকা চাননি। লেছিলেন ক্ষুদ্র আমিটিকে মারো। আমি গেলে ঘুচবে জঞ্জাল। হাম নয় HIM। সেই ড় আমিই হল 'হিম'—তিনি সব মানুষের আকর। ধর্ম উপলব্ধির বস্তু। 'নাক তেরে কটে তাক' বোল মুখে বলা সহজ, হাতে বাজানো কঠিন। সেই রকম ধর্মকথা বলা সাজা, কাজে করা বড় কঠিন।' ভিতরের বন্ধ্যা আমি ক্ষেত্রটিকে প্রেম-বারি সিঞ্চিত রে ভক্তির জল দিয়ে কর্ষণ করো, তবেই হবে কৃষ্ণ। তবেই দেখা যাবে বাসুদেব সর্বম। ব তিনি। সব তিনি। সব তিনি। সব তাঁর! সব তাঁর! সব তাঁর! আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ।

'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়'

কথামৃতের শেষ পরিচ্ছেদে এসে প্রাণটা হুহু করে ওঠে। ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙানো গৌর নিতাইয়ের ছবি একখানা বেশ ছিল। গৌর নিতাই সপার্ষদ নবদ্বীপে সংকীর্তন করছেন। রামলাল শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, 'তা হলে ছবিখানি এই এঁকে মাস্টারকেই দিলাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আচ্ছা, তা বেশ।'

সব ছাড়ার পালা। যাকে যা দেবার আছে সব দিয়ে যাচ্ছেন একে একে। যা বলার আছে সব বলে যাচ্ছেন।

ঠাকুর হঠাৎ একদিন মৌনী হলেন। সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। ১১ অগস্ট ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। আগের দিন গেছে অমাবস্যা। শ্রীম লিখছেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি কি জানিতে পারিয়াছেন যে, শীঘ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন! জগন্মাতার ক্রোড়ে আবার গিয়া বসিবেন? তাই কি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন? তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিতেছেন। রাখাল ও লাটু কাঁদিতেছেন। বাগবাজারের ব্রাহ্মণী এই সময় আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে লীলায় প্রত্যক্ষ অংশ নিতে পারিনি বা নিলেও দেহরূপ বদলাতে বদলাতে বর্তমানের নামরূপে এসে বিস্মৃত, সেই লীলায় অমৃত স্বাদে কথামৃত জমজমাট। ঠাকুর, পরম ভক্ত শ্রীমর মাধ্যমে অক্ষরের মালায় স্তব্ধ করে রেখে গেছেন, সেই কাল, সেই ভাব, সেই আন্দোলনকে। ঠাকুরের হাঁটাচলা, ওঠাবসা, ফিরে তাকানো, কথা বলা, হাত নাড়া, ক্ষণে ক্ষণে ভক্তদের আসা-যাওয়া, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কাষ্ঠপাদুকার শব্দ তুলে মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টাবাদন, পঞ্চবটীতে ঘুরে বেড়ানো, ভক্তসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গ আরতির কাঁসর ঘণ্টা, কথামৃতের দুই মলাটে চিরকালের জন্যে বন্দী হয়ে আছে। আজও জীবন্ত।

দ্বিতীয় কারণ, ঠাকুর যেই নিত্যধামে আরোহণ করলেন দক্ষিণেশ্বর যেন ফাঁকা হয়ে গেল। 'নন্দকুল চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।' পদব্রজে অথবা নৌকাপথে কি ফিটনে চড়ে, দূর থেকে ভক্তরা আর আসেন না। মা আছেন ; কিন্তু সেই পঞ্চবটীর প্রাণপুরুষ

গরে গেছেন অমর্ত্যলোকে। দেবী আছেন ; কিন্তু তাঁকে জাগ্রত করার সাধকপ্রবর জেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তীর্থ আছে, স্মৃতি আছে, লীলা নেই। অন্তরঙ্গ পার্ষদ যাঁরা লেন, তাঁদের সেই মুহূর্তের শূন্যতা দুঃসহ। সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন। কোথায় রা দানা বাঁধবেন। বরাহনগরের জীর্ণ কুঠিতে তাঁরা সমবেত হয়েছেন, ঠাকুরের পট তিষ্ঠা হয়েছে, পূজার্চনাদিও হচ্ছে, সাধন-ভজনেরও কমতি নেই ; কিন্তু কারুরই মন নছে না। যিনি চলে গেলেন তাঁর তো কোনোও দ্বিতীয় হয় না। কথামৃতের পরিশিষ্টাংশ ন দীর্ঘ একটি বিলাপের মতো। সন্তানদের অনেকটা দিশাহারা অবস্থা। ঠাকুর মকৃষ্ণের 'টাকা মাটি আর মাটি টাকা' ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আত্মদর্শন, 'যা পাবি বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' 'গয়া-গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।' নি কিছু প্রতিষ্ঠা করে যাননি। বিশেষ কোনো মত, বিশেষ কোনো পথ, বিশিষ্ট কোনো র্ডার। বেছে বেছে, আধার বুঝে, দশ-বারোটি বৈরাগ্যবান্ যুবকের অন্তরে বীজ ফেলে য়েছিলেন। এ যেন তাঁর নিজেরই 'প্যারেবলস'-এর ধারা অনুসরণ। পাখি ঠোঁটে করে জ নিয়ে যেখানে সেখানে ফেলে। কোন্‌টা পাথরে পড়ল, কোনটা পড়ল জলে, কোন্‌টা ভূমিতে, ঠিক জায়গায় যেটি পড়ল, সেইটিই অঙ্কুরিত হলো, ধীরে ধীরে পরিণত হলো শাল বৃক্ষে। মঠ, মন্দির, মসজিদ অথবা কোনো অর্ডারে ঠাকুর নিজেকে জড়াতে চান । তাঁর অসাধারণ মতবাদ—যত মত তত পথ।

'যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।'

আমার মত, আমার পথ বলে যাঁরা দম্ভ করতেন ঠাকুর মুচ্‌কি হেসে বলতেন, ওরে, যে মতুয়ার বুদ্ধি।

'যদি হৃদয় মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে ! আগে চিত্তশুদ্ধি কর, মন শুদ্ধ হলে ভগবান পবিত্র াসনে এসে বসবেন। চামচিকের বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগারজন মচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব তিষ্ঠা—তার পর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেক্‌চার দাও ! আগে ডুব দাও। ডুব দিয় রত্ন তোলো, রপর অন্য কাজ। কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য ই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেক্‌চার ! লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে র্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায় তাহলে লোকশিক্ষা দিতে পারে।'

'তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥

তিনি নিজে দম্ভশূন্য, সাধারণের থেকেও সাধারণ মানুষ ছিলেন। বুঝতেই দিতেন , তিনি অবতার। দক্ষিণেশ্বরে এসে কেউ ধর্মকথা, তত্ত্বকথা শুনতে চাইলে লহমায় খে নিতেন আধারটি কেমন। যাই দেখতেন মতুয়া, অমনি বলতেন, যাও না যাও, ই মন্দিরে মা-ভবতারিণী আছেন, পঞ্চবটী, বেলতলা, গঙ্গা, বিল্ডিং দ্যাখো, সিনারি খ।

ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না টাটে বসে গুরুগিরি করার। তিনি সার জানতেন, ঈশ্ব
মন দেখেন। মুখে এক, মনে আর এক, ও চলবে না।

'লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঘ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

তাঁর কাছে অনেকে এসেছেন, একবার, দু'বার, বহুবার, দর্শন হয়েছে, শ্রবণ হয়েছে
এদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই 'ইনার-অর্ডারে' স্থান পেয়েছিলেন। মায়ের পায়ে দেবা
জন্যে বেছে বেছে তুলে নিয়েছিলেন মাত্র কয়েকজনকে। তাঁদের তিন টানকে একটা
করে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বলতেন, 'তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ী
বিষয়ের ওপর, মায়ের সন্তানের ওপর, আর সতীর পতির ওপর টান। এই তিন টা
যদি কারোও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।'

ঠাকুর যাঁদের তুলে নিয়েছিলেন, তাঁদের তিনটান এক হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে
ধাবিত হয়েছিল।

'তেজস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্তাতৃষ্ণাঃ
রাগে কৃতি ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!'

ঠাকুর একদিন শ্রীমকে বলেছিলেন, 'দেখ, চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়; তার
ভালো গরু, মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনোও গরু ল্যাজে
হাত দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং-মিড়িং করে
লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; ভিতরে খুব তেজ।'
ঠাকুর হাসছেন আর বলছেন, 'আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন চিঁড়ের ফলার
আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎভ্যাৎ করছে।'

ঠাকুরের ভাব আর স্বামীজীর তেজ মিলে সারা বিশ্বে যে ভাবান্দোলন হয়ে গেল তা
কি কোনো তুলনা আছে? অবতার পুরুষরা এই ভাবেই একটা প্লাবন সৃষ্টি করে দিয়ে
যান। গৌতম বুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য করেছিলেন। করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

'অযুত কণ্ঠে বন্দনা-গীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে,
(তব) অমিয় বারতা দেশ দেশান্তরে
হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে।'

গীতায় ভগবান বলছেন,

'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥'

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যেই স্থিত হয়েছিলেন,

'যা নাই—তা হ'তে কিছু হয় না প্রকাশ,

থাকে যদি—কিছুতেই নাই তার নাশ।'

তিনি ছিলেন। তিনি আছেন। তিনি সত্য অবিনাশী। ঠাকুরের সার কথা ছিল, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা। 'এই ব্যাকুলতা। যে এই পথেই যাও, হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুলে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই —যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনি আবার ভালো পথে তুলে লন। আর সব পথেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু কারও ঘড়ি ঠিক যায় না। তা বলে কারু কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।'

ঠাকুর বড় আয়োজন করে দেহধারণ করে ছিলেন। ঠাকুরের কথায়, 'মা আমি কি যেতে পারি। গেলে কার সঙ্গে কথা কব ? মা, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকব।'

একান্তে দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রর সঙ্গে ঠাকুরের এই সব কথা হয়েছিল। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলছেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি, "আমি এসেছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে তখমা দিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমকে একদিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষা দেবে।'

নরেন্দ্র পরে শুনে ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আমি ওসব পারব না।'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর ঘাড় করবে।'

তিরোধানের পর সন্তানেরা যে একটু বিপদে পড়বে ঠাকুর মানসচক্ষে তা দেখেছিলেন। দেখে শ্রীমকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে।'

তিরোধানের অব্যবহিত পরের অবস্থা শ্রীম লিখে গেছেন। নরেন্দ্রনাথ তখনও বিশ্বজয়ী হননি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছেন। গুরুভ্রাতাদের দায়িত্ব নিয়ে কখন বরাহনগর মাঠে, কখন কলকাতায়। অর্থকষ্ট, নানা সংশয়। ঠাকুরের অনন্ত পরীক্ষা চলেছে। 'তুই পারবি না, তোর ঘাড় পারবে।'

যোগ-ভোগ গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয় !

শ্রীম লিখছেন : 'দু-তিনজনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ী ছিল না। সুরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, ভাই তোমরা আর কোথা যাবে ; একটা বাসা করা যাক। তোমরাও থাকবে, আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই। তা না হলে সংসারে এরকম করে রাতদিন কেমন করে থাকব। সেইখানে তোমরা গিয়ে থাক। আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচা চলিবে। সুরেন্দ্র প্রথম প্রথম দুই এক মাস টাকা ত্রিশ করিয়া দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অন্যান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ, ষাট করিয়া দিতে লাগিলেন। শেষে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত দিতেন।

বরাহনগরে যে বাড়ি লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও ট্যাক্স ১১ টাকা। পাচক ব্রাহ্মণের মাহিনা ৬ টাকা আর বাকী ডালভাতের খরচ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ডারেরর এই শুরু। শ্রীম লিখছেন ঃ 'ধন্য সুরেন্দ্র ! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া। তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। কৌমার-বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দুধর্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই তোমার ঋণ কে ভুলিবে ? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে। আজ বাড়ী ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে—আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে ! তোমার অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবারি বিসর্জন করিবে।'

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলা পাঠকের সামনে ঠাকুরের তিরোধান আর নরেন্দ্রের স্বামী বিবেকানন্দ হবার মাঝখানের কয়েকটি বছর যেন শূন্যতায় ভরা। শ্রীম প্রথম দিকের সংগ্রামের চিত্র যখন যেমন সুবিধে কথামৃতের পরিশিষ্টাংশে লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিকই, তবে বেশ বোঝা যায় প্রাণপুরুষের প্রয়াণে তিনিও ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হয়ে আসছেন। অন্তরে তাঁকে আসন দিয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছেন। তখন তাঁর ভাব :

'My Soul, in everything and yet beyond everything you must find your rest in the Lord, for He is the eternal rest of the Saints'.

যাঁর কাজ তিনি ঠিকই করিয়ে নেন। অল্প ব্যবধান, তার পরেই অনবদ্য আর একটি লীলা কাহিনী—"স্বামী-শিষ্য-সংবাদ'। লিপিকার আর এক গৃহী-সাধক, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। ঠাকুর কৃপা করেছিলেন শ্রীমকে। স্বামীজী কৃপা করলেন, শরচ্চন্দ্রকে।

শ্রীমর প্রথম দর্শনের কাহিনী বড় অপূর্ব। 'বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস।'

'মাস্টার সিধু (বরাহনগরে সিদ্ধেশ্বর মজুমদার)-র সঙ্গে বরাহনগরের এ বাগানে ও বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) আসিয়া পড়িয়াছেন।'

শ্রীম অবাক হয়ে দেখছেন, এক ঘর লোক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। তাঁরা ঠাকুরের কথামৃত পান করছেন। ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন।

দ্বিতীয় দর্শনে, ঠাকুরের ঘর বন্ধ ছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃন্দে।

শ্রীম প্রশ্ন করলেন—'হাঁগো, সাধুটি কি এখন ঘরের ভিতরে আছেন ?'

বৃন্দে—হাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।

মাস্টার—ইনি এখানে কতদিন আছেন ?

বৃন্দে—তা অনেকদিন আছেন।

মাস্টার—আচ্ছা ইনি কি খুব বইটই পড়েন ?

বৃন্দে—আর বাবা বইটই। সব ওঁর মুখে।

১৮৮২ আর ১৮৯৭, পনের বছরের ব্যবধান। স্থান নির্জন, নিরালা, দক্ষিণেশ্বর নয় খাস কলকাতা। বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ঘর। আর সেই বসন্তকাল।

ফেব্রুয়ারী মাস। নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ। বিলেতে থেকে সবে কয়েকদিন হলো ফিরেছেন। প্রিয়নাথবাবুর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। স্বামী তুরীয়ানন্দ শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজীর সামনে উপস্থিত করলেন। শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর সেই দিব্যকান্তির কোনোও বর্ণনা দেননি। ঠাকুর যাঁকে বলতেন, 'নরেনের অখণ্ডের ঘর।'

স্বামীজী ছিলেন, 'অল ফোর্স' দীপ্ত অগ্নিশিখা। সংস্কৃতে সম্ভাষণ করলেন। সাধু নাগমহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। স্বামীজী কিষ্টফিষ্ট'র চেয়ে প্রকৃত মানুষ চাইতেন। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, সবিবেক কর্মী। শিষ্যকে বললেন :

'মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসার সিন্ধোস্তরণেহস্ত্যপায়ঃ
যেনৈব যাতা যতয়োহস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি ॥

—হে বিদ্বন্! ভয় পেয়ো না, তোমার বিনাশ নেই, সংসার-সাগর পার হবার উপায় আছে। যে পথ অবলম্বন করে শুদ্ধসত্ত্ব যোগী এই সংসার-সাগর পার হয়েছেন সেই পথের নির্দেশ তোমায় আমি দিচ্ছি।

ঠাকুর শ্রীমকে অন্যভাবে বলেছিলেন, অনেক নরম করে সহজ করে। প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিয়ে করেছিস ? শ্রীম যেই বললেন, হ্যাঁ, ঠাকুর হতাশ হয়ে বললেন, যাঃ। প্রথম ধাক্কা। ছেলে হয়েছে শুনে, দ্বিতীয় ধাক্কা। শ্রীম বুঝতে পারছেন, ধীরে ধীরে ঠাকুর তাঁর অহংকার চূর্ণ করে দিচ্ছেন। শেষে পথও বাতলে দিলেন কৃপা করে—'তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।'

স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' পাঠ করতে বললেন। দেখিয়ে দিলেন বেদান্তের পথ। ঠাকুর বলতেন, রসেবশে, স্বামীজী বলতেন 'আমাদের ভেতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য-উৎসাহ।' আর 'চেতনের লক্ষণ কি ?' প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।' যেখানে struggle যেখানে rebellion, সেখানেই জীবনের চিহ্ন, সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ।' রস বশ নয়। একেবারে বিদ্রোহ।

স্বামীজী শিষ্যকে বললেন, 'সকলকে গিয়ে বল্, "ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না ; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, একথা বিশ্বাস করো, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।' ঐকথা সকলকে বল্ এবং সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ও ইতিহাসের মূল কথাগুলি mass-এর ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি Centre তৈয়ার করব—প্রথম তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাব, মতলব করেছি।'

দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণী, ধূপ, ধুনো, আরতি, ধ্যান, প্রাণায়াম। প্রাণপুরুষ ঠাকুর নিত্যধামে। সময় এগিয়ে গেছে পনের বছর। স্বামীজী পাশ্চাত্য কাঁপিয়ে এসেছেন। মেটেরিয়ালিস্টদের কাছে চাইতে যাননি, দিতে গিয়েছিলেন—বেদান্তধর্ম।

'আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তধর্ম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের

এখন আর কিছু নেই বললেই হয়।' স্বামীজী মিরার পত্রিকার সম্পাদককে বললেন, ধর্মের চর্চায় ও বেদান্তধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্যদেশে—উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনায় আমাদের কাছে গৌণ উপায় বলে বোধহয়।'

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে ঠাকুর বেরিয়ে এসেছেন বিশ্বমঞ্চে। একদিকে ভোগবাদী পাশ্চাত্য, আর একদিকে দরিদ্র প্রাচ্য। মাঝখানে প্রকৃত সাম্যকার বিবেকানন্দ। ক্লাসকে নয় জাগাতে চাইছেন মাসকে। মঠ তখনও বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মঠ আলমবাজারের ভাড়া বাড়িতে। স্বামীজী কখনো বাগবাজারে, কখনো আলমবাজারে, কখনো কাশীপুরে। যখন যেখানে, সেইখানেই ভক্ত ও বিদ্বজ্জন সমাগম। কেউ আসছেন বিশ্বমানবকে চোখের দেখা দেখতে। কেউ আসছেন, প্রাণের টানে পথের সন্ধান পেতে।

যিনি যেভাবেই আসুন, বৈদান্তিক, কর্মযোগী, তেজোময় স্বামীজীকে ঘিরে দক্ষিণেশ্বরের মতো শান্ত, একান্ত লীলা জমেছে না। জমতে পারে না। কারণ, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।' মন্দিরে, মসজিদে নয়, কঠোর প্রাণায়াম, ধ্যান জপে নয়, পথ অন্য, কর্ম অন্য।

'একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পেয়ে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু। এ কথা সর্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক, অশাস্ত্রীয় কুলগুরু প্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেসব সাধন করেও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হতে পাচ্ছে না। ধর্মের এ-সকল গ্লানি দূর করতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—শরীর ধারণ করে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হবে।'

স্বামীজীর পরিকল্পনা 'মাদ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র করে সর্ববিধ লোক-কল্যাণের জন্য নূতন ধরনের সাধু সন্ন্যাসী তৈরী করতে হবে।'

স্বামীজী মা-ভবতারিণীর কাছে ঐহিক কিছু প্রার্থনা করতে পারেননি। চেয়েছিলেন শুদ্ধাভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গোপাললাল শীলের বাগানে বসে শিষ্যকে বললেন :

'তুই কি বলছিস ? মানুষেই তো টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, একথা কবে কোথাও শুনেছিস ? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস তো জলের মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।'

মা কালীকে তিনি আহ্বান করেছিলেন, রক্ষাকারিণী শ্যামা হিসেবে, নয়।

'করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুতে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

ঠাকুর আর স্বামীজীতে এই তফাৎ। গৃহী, জ্ঞানী, ভোগী, ত্যাগী সকলকে নিয়েই

ছিল ঠাকুরের মহতী পরিবার। তাঁর দৃষ্টি সকলের উপরেই ছিল। তিনি ছিলেন—ভবরোগবৈদ্যম্। তিনি বলতেন, 'মা রাঁধেন ছেলেদের পেট বুঝে। একই মাছ কাউকে দিচ্ছেন ভাজা, কোনোও ছেলেকে ঝোল, কোনও ছেলেকে ঝাল।' ঠাকুর কোনোও প্রার্থীকে বললেন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। বৈরাগ্য। তিনটান এক কর। সংসারে থাক দাসীর মতো। কাউকে বললেন, না হয় স্বদারা সহবাস হলো। দিনান্তে না হয় একবারই তাঁর নাম নিলে। শিবের সংসার কর। আর সত্ত্ব গুণের সাধনা চালা। মা, তুমি আছ, আর আমি আছি। বিষয়ীর সঙ্গ বেশি করিসনি। আঁশটে গন্ধ সংসারী নাইবা হলি। অহংকার বিসর্জন দে। তুঁ হুঁ তুঁহুঁ-তেই হাম্বার মুক্তি। রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না। ঠাকুরের সব কিছুর মধ্যে একটা Personal সম্পর্ক ছিল। তাঁর কথামতো তিনি ছিলেন ধর্ম বৈদ্য। রোগীকে ওষুধ দিতেন না, খাইয়ে তার পাশে বসে থাকতেন, সেবা করতেন। শ্রীমকে প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিলেন, একটু বেশি বেশি এখানে আসবে। কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবেই।

স্বামীজী ছিলেন Wide —ব্যাপক। তাঁর সব পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল Mass —একজন নয়, বহুজন। বহুজনহিতায়। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুই নিজের মোক্ষ চাইছিস? তুই স্বার্থপর হবি কেন? তুই হবি বিশাল বটবৃক্ষের মতো। তোর ছায়ায় এসে কতো মানুষ বসবে।'

শরচ্চন্দ্র সেই স্বামী বিবেকানন্দকে পেয়েছিলেন। প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল। অসীম তেজ। শরচ্চন্দ্রকে একদিন বলছেন :

বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যে এই ideal ভুলে যায়, "বৃথৈব তস্য জীবনম্"। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তি দান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।

"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আমাদের জন্ম ; কি করছিস সব বসে বসে? ওঠ—জাগ, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর, নরজন্ম সার্থক করে চলে যা! "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ একটি প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ড। বিবেকানন্দ অগ্নি, রামকৃষ্ণ দ্যুতি। প্রায় পাঁচটি বছরের একটি দিনলিপি। স্বামীজী বলতেন, Practical Religion. শিষ্যকে একদিন বলছেন—মঠ প্রতিষ্ঠার পুণ্য দিনে। বহু পরিকল্পনা তাঁর। একটা International Religious Centre হবে। শিষ্য বললেন, 'মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা।' স্বামীজী বললেন, 'কল্পনা কি রে? সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন মাত্র করে দিচ্ছি—এরপর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাব। আর তোদের ভেতর idea নানা দিয়ে যাব। তোরা পরে সে সব workout করবি। বড় বড় Principle কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের

লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে ? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝতে হবে। তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি ? একেই বলে Practical Religion.'

স্বামীজী তাঁর স্বল্প জীবনকালে ঝটিকার মতো বয়ে গেছেন। স্বদেশ বিদেশ, বিদেশ স্বদেশ, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। শরচ্চন্দ্র অসীম নিষ্ঠায়, গুরু-কৃপায় সেই মহাজীবনকে চিরস্পন্দমান করে রেখে গেছেন। অক্লান্ত নদী, সাগর মোহনায় বিশাল হয়েছে, চলার ছন্দে কিছু ক্লান্তি এসেছে। যা চেয়েছেন তা হয়নি। শিষ্যের জীবনের হতাশা কাটাতে প্রয়াণের কয়েকদিন আগে বলছেন, হবে বই কি। আকীট-ব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে—আর তুই হবিনি ! ও-সব weakness মনেও স্থান দিবিনি। শ্রদ্ধাবান্ হ্, বীর্যবান হ্, আত্মজ্ঞান লাভ কর্, আর "পরহিতায়" জীবনপাত কর্—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।'

শিষ্য শরচ্চন্দ্র জানতেন না গুরুর সঙ্গে এই হবে তাঁর শেষ কথা। স্বামীজী বলছেন, 'আগামী রবিবার আসবি তো ?'

শিষ্য বললেন—'নিশ্চয়।'

স্বামীজী—'তবে আয় ; ঐ একখানি চলতি নৌকাও আসছে। রবিবারে আসিস।' শরচ্চন্দ্র নৌকো ধরার জন্যে ছুটেছেন। স্বামী সারদানন্দ বলছেন, 'ওরে কলার দুটো নিয়ে যা। নইলে স্বামীজীর বকুনি খেতে হবে।' শিষ্য বললেন, 'আজ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাব —আপনি স্বামীজীকে এই কথা বলিবেন।'

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ শেষ হচ্ছে এইভাবে, 'চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে সুতরাং শিষ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিষ্য নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধঘণ্টার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পঁহুছিল।'

নদীর টান। আর সময়ের টানে আমরা ১৯০২ থেকে চলে এসেছি ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। জীবনের দুই সঙ্গী কথামৃত আর স্বামী-শিষ্য-সংবাদ। ঐহিক কিছু সঙ্গে যাবে না। কি হলো আর কি হলো না, সে বিচারেও কাজ নেই। পরমপ্রাপ্তি হলো কৃপা। স্বামীজীর সেই কথা—

'তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন-বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার test কিন্তু হচ্ছে কাম-কাঞ্চনের অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনোই ঠিক ঠিক লাভ করেনি।'

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই কানে বাজে মঠের প্রার্থনা সঙ্গীত, 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন বন্দি তোমায়।' যেখানেই থাকি হুহু গঙ্গার বাতাস এসে লাগে গায়। আমার নিজের অনুভূতি, কথামৃত আর স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—অনুপম, অনাবিল এক জ্যোতির্ময় জগতে প্রবেশের দুই বিশাল স্তম্ভ। ঢুকে যাও, ঢুকে যাও সব ভুলে যাও। স্বামীজীর আদর্শে দাও নিজেকে নাড়া—সব weakness ঝরে যাক, আর ঠাকুরের আদর্শে বসে পড়—মনে, বনে, কোণে।

ঠাকুরের কাছে দরবার

ঠাকুর, আপনি বলেছিলেন, গৃহদুর্গ সর্বাধিক নিরাপদ স্থান। ইচ্ছে থাকলেই সেখানে বসে সাধন-ভজন করা যায়। ভালভাবেই করা যায়। সে-গৃহে যে আর দুর্গ নেই ঠাকুর। শতবর্ষ পরে গৃহ এখন শত্রুপুরীর চেহারা নিয়েছে। গৃহ একালে সুদৃশ্য হয়েছে অবশ্যই। সাজ-সজ্জার অভাব নেই। গুণী স্থপতিরা নকশা করে দেন। শয়নকক্ষ, বসার কক্ষ, ভোজন-পরিসর। প্রকৃতির ডাকে রাত-বিরেতে লণ্ঠন হাতে পুকুর পাড়ে ছুটতে হয় না। লাগোয়া স্নানাগার। অষ্টপ্রহর চলছে জলের ধারা। ডবল জানলা। বাহারী পর্দা, পেলমেট। সোফা, কার্পেট। ঢাকনা পরানো আলো। গান শোনাবার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। বাকসো বোঝাই সিনেমা। বোতাম ঘোরালেই দিল্লির প্রমোদ তরঙ্গ। রান্নাঘরে নির্ধূম অগ্নিশালায় চটজলদি রান্নার ব্যবস্থা। শিল নোড়া নির্বাসিত। গুঁড়ো মশলা। ভারতীয় পদের সংখ্যা কমে চীনে খাবারের প্রচলন। নারীপ্রগতি যত বাড়ছে ততই বাড়ছে সংসারের রুক্ষতা। মা কোথায় ? মায়েরা সব গেলেন কোথায় ? শিক্ষা আর স্বাধীনতা যেন একালের পরশুরাম। মাকে হত্যা করেছে। গৃহে আছে মনোরম, গৃহদেবতা নেই। পূজা-পার্বণ নাকি কু-সংস্কার। শাঁখ আর বাজে না, সন্ধ্যা আর দেখানো হয় না। ঠাকুর আপনি বলেছিলেন, টাকা মাটি। একালে টাকাই সব। টাকাই ঈশ্বর।

আপনি বলেছিলেন, সাত্ত্বিকের সংসার হবে শিবের সংসার। একটু অগোছালো, ধুলোটুলো হয়তো থাকবে, কিন্তু দুখচটে, তেলচিটে নয়। অপবিত্র নয়। অতিথি এসে অশ্রদ্ধা পেয়ে ফিরে যায় না। ভিখারি ভিক্ষা পায়, রাতে আলো জ্বলে ঘরে ঘরে। সুন্দর একটি ঠাকুরঘর থাকবে নির্জন, নিরালা, ধূপ-ধুনোর গন্ধভরা। সন্ধ্যায় একটি প্রদীপ জ্বলবে আপন মনে। আমার সন্দেহ হয় ঠাকুর, একালের কটি গৃহে আপনি জলগ্রহণ করবেন। অন্নগ্রহণ : সে তো অনেক দূরের কথা। আপনি যে স্পর্শদোষ ভীষণ মানতেন। দেহলক্ষণ দেখে মানুষ চিনতেন আপনি। আপানি বলে গেছেন—"হাড়পেকে, কোটর চোখ, ট্যারা এ-রকম অনেক লক্ষণ আছে, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না।" "দক্ষিণে কলাগাছ, উত্তরে পুঁই, একলা কালো বিড়াল কি করব মুই।" একালের কজনকে আপনি পা স্পর্শ করে প্রণামের অধিকার দিতেন, আমার সন্দেহ আছে। সেই ভগবতী দাসীর ঘটনা আমার মনে আছে। সে ছিল মথুরবাবুদের পুরনো দাসী। প্রথম বয়সে তার স্বভাব

ভালো ছিলো না। একদিন ভগবতী আপনার সঙ্গে নানা কথা কইতে কইতে সাহস পেয়ে আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আপনি এমন করে উঠেছিলেন, যেন বৃশ্চিক দংশন করলে। 'গোবিন্দ' বলতে বলতে ছুটে গেলেন ঘরের কোণের গঙ্গাজলের জালার কাছে। পায়ের সেই জায়গা দুটো জল দিয়ে ধুয়ে তবে শান্তি। আজকাল আমরা ভগবতী দাসীর চেয়েও বেশি শিথিল জীবন-যাপন করি। আমাদের চরিত্রের সব বাঁধনই প্রায় আলগা হয়ে গেছে। মানুষের বিচার একালে আর চরিত্র দিয়ে হয় না। হয় বৈষয়িক সাফল্য নিয়ে। গাড়ি, বাড়ি, অর্থ, সামাজিক পদমর্যাদা। একালে সাধুর চেয়ে ক্ষমতাশালী শয়তানই বেশি পূজনীয়। আমাদের তাহলে কি হবে ঠাকুর ! আপনাকে তো ত্যাগ করতে পারবো না। জীবনের সুর যে আপনি বেঁধে দিয়েছেন।

আপনি বলেছিলেন, "ঈশ্বরলাভের জন্যে সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদ-পদ্ম ধরে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে।" ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরতে পেরেছি কিনা জানি না, দুহাতেই কাজ করে চলেছি, অকাজ সব। অপেক্ষায় আছি, অবসর মিললেই দুহাতে তাঁর সেবা ; কিন্তু তাঁকে ধরার আগেই তো রোগে ধরবে। উপার্জন কমে আসবে। আর সংসার তো কাবুলিওয়ালার সংসার। সব সময় দেহি, দেহি। আসল দাও, সুদ দাও। পাঁকাল হয়ে পেছলাবার চেষ্টা করলে, মায়েরা আজকাল দুহাতে ছাই মেখে ধরে। আমি তো আপনার উপদেশ মতো সংসাররূপ কাঁঠালটি ভাঙার আগে দুহাতে চৈতন্যরূপ তেল মাখার চেষ্টা করিনি ঠাকুর। শুধু এইটুকু মনে রেখেছিলুম—"ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে ? যেকালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভালো। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে-তৃষ্ণা এ-সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ-যুদ্ধ সংসারে থেকেই ভালো। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর-টিশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল, 'আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম।' স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বললে, 'কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, যদি পেটের ভাতের জন্যে দশ ঘরে যেতে না হয় তবে যাও। তা যদি হয়, তাহলে এই এক ঘরই ভালো।' তোমরা ত্যাগ কেন করবে ? বাড়িতে বরং সুবিধা। আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্ব-দারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করবার লোক কাছে পাবে। জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দুখানা তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের !" জ্ঞান যার লাভ হয়নি তার কি হবে। নিজে সোজা থাকবার চেষ্টা করলেও সংসারের সদস্যরা মেরে ধনুক করে দেবার চেষ্টা করে। তাদের 'দেহি-দেহি' রব, আমার 'ত্রাহি-ত্রাহি' চিৎকার।

আপনি বলেছিলেন বিদ্যার সংসার, বিদ্যা-স্ত্রী। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলুম 'তুমি কি বিদ্যা-স্ত্রী ?' তিনি বললেন, 'কোয়ালিফিকেশন দেখেই তো এনেছিলে !'

'সে বিদ্যা নয়, সহমর্মী, সহধর্মী। ঢোকার কায়দা তো জানা হলো, বেরিয়ে আসার কায়দা জানো ?'

'সে মৃত্যু !'

'না। মরণ এসে ঘাড় ধরে বের করে দেবার আগেই নিজে তুলে নেবার কৌশল। কর্ম যখন মুক্তি দেবে তখন দুহাতে তাঁকে ধরার কথা বলেছেন ঠাকুর।'

'তখন হাঁড়ি চড়বে কিসে ?

'কেন পুত্র ?'

'তার তো কোনও চাকরিই নেই। এযুগে চাকরি পাওয়া একই কথা।'

'তাহলে রিটায়ার করার পর সামান্য যা কিছু মিলবে, তাতেই না হয় ছোটা খানা !'

'মেয়ের বিয়ে ? তাইতেই সব চলে যাবে ?'

'ঠাকুর, তাহলে কি হবে ! আপনার মতো সাহস করে বলি কি করে—'রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না !'
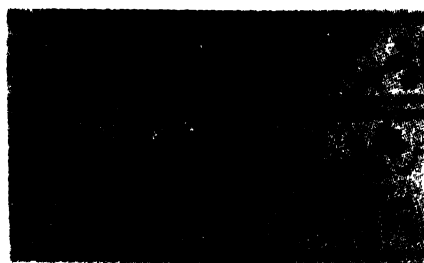
কাতরে কর করুণা

ঠাকুর, বড় দ্রুত সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে। আপনি জানেন কি, আমরা যৌথ পরিবা ভেঙে ফেলেছি। একালে সব একক পরিবার। স্বামী, স্ত্রী, একটি-দুটি সন্তান। দয়া ক কেউ কেউ মা-বাবাকে একটু আশ্রয় দেন চক্ষুলজ্জার খাতিরে। সে বড় করুণ দৃশ্য তাঁরা সংসারে থাকেন পরবাসীর মতো। উদাস হয়ে। পরিবারের ভালমন্দ সম্পর্কে ক বলার কোনো অধিকার তাঁদের থাকে না। সাধ্যমতো তাঁরা শ্রমদান করেন। তাঁদের এ নিরুপায় উপস্থিতির জন্যে নিত্য অশান্তি হয়। তাঁরা সহ্য করেন। প্রতি মুহূর্তে ভাবে কবে 'ডাক' আসবে। শিক্ষিত বাঙালী বলবেন, আমরা সব ধীরে ধীরে সাহেব হচ্ছি তো বিলেতে এইরকমই হয়। সেখানে বুড়ো মা-বাবার খবর শিক্ষিত, উচ্চ উপার্জনকারী প্রগতিশীল যুবকরা রাখে না। ওসব হলো বাজে ভাবালুতা। যতদিন শক্তি, ততদি পৃথিবীর ভোগ---সুখাদি তোমার। যখন অথর্ব তখন তুমি জঞ্জাল। যৌথ পরিবার ভা মানে প্রাচীন বিশ্বাস, আদর্শ ও সংস্কারের অন্তর্জলি। একটা ধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছি করে ফেলা। আদর্শহীন ভাবে বাঁচা মৃত্যুরই সামিল। একালের কজন মানুষ প্রকৃ জীবিত! মানুষ বেঁচে নেই, বেঁচে আছে তার অভ্যাস। একালের মানুষ হলো কতকগুে অভ্যাসের সমষ্টি। খানিকটা লোভ, খানিকটা হিংসা, কিছুটা মিথ্যা, আলস্য, ফাঁকিবাজি ধাপ্পা, ধান্দা প্রভৃতির সমাহার। মানুষের ভেতর থেকে, আমের ভেতর থেকে যে আঁটি বেরিয়ে যায়, সেইরকম হুঁশটা বেরিয়ে চলে গেছে। মানুষের মানটা আছে। আ মানুষ এই গর্বটুকু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুর, আপনি ছিলেন ভবিষ্যদ্রষ্টা। আপনি জানতেন কৃপা ছাড়া মানুষের স্ব পাল্টাবে না। সেকালে আর একাল, সবকালের মানুষেরই স্বভাব এক। একমাত্র গুরুকৃপা মানুষের হুঁশ আসতে পারে, নইলে নয়।

ঠাকুর, আপনি তিরস্কার করে বলছেন—স্ত্রী-সন্তানের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে টাকার জন্যে লোক কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের কান্নার তিনটি বস্তু পাও গেল---স্ত্রী, সন্তান, টাকা। যৌবনের তিনটি প্রবল নেশা---স্ত্রী, সন্তান, অর্থ। কি সেকা কি একালে। অতঃপর আপনি স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের স্বরূপও উন্মোচন করেছেন বলছেন- "বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হাত-পা বাঁধা। আবার মনে ক

যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে—তুমি চললে, আমার কী করে গেলে ?"

তার মানে সর্বকালেই স্বার্থ। একালে একটু বেশি। মানুষের বার্ধক্যের সেই একই চিত্র—তুমি আমার জন্যে কী করে গেলে ? নিঃস্বার্থ প্রেম বলে কিছু নেই। ছিল না কোনও কালে। সংসার মানে একটা রফা। দেওয়া আর নেওয়ার সম্পর্ক। গরু যতদিন দুধ দেবে, ততদিনই তাকে দলাই মলাই—কুঁড়ো দেবে, জাবনা দেবে, ভেলি গুড়ের ঢেলা গেলাবে। বুদ্ধিমান সেই কারণে রেস্তোটি ঠিক রাখে। শেষদিন পর্যন্ত সেইটা বাজায়। বাজনা শুনে এগিয়ে আসে সেবা করতে, লোভে লোভে। বুড়ো মরলে সব আমার হবে। আপনার জন কেউ না এলেও পর আসে। তাই তো প্রবাদ—আপনার চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়েও বন ভাল।

সময়ের পথ ধরে আরও অতীতে গেলে দেখবে সেই এক হতাশ চিত্র। রামপ্রসাদ গাইছেন—"যার জন্য মরো ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে। সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে।" 'কেউ কারো নয়' এই বোধ সে-যুগের সমাজও গেঁথে দিতে পেরেছিল অন্তর্মুখী মানুষের মনে। কাম আর কাঞ্চনে মানুষের প্রবল আসক্তি সহজে যাবার নয়। সব যুগের মানুষই ছোঁক ছোঁক করে সারা জীবন। করবেই, কারণ—'আহারনিদ্রাভয়—মৈথুনঞ্চ সমানমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।' পশু আর মানুষে খুব একটা পার্থক্য কোথায় ! তাই আপনি বারে বারে আঘাত করেছেন কঠিন কঠোর ভাষায়। বলেছেন, বিচার কর। নিজের সঙ্গে বিচার। বলছেন 'বস্তুবিচার'। পুরুষভক্তদের কাছে বলছেন তো ? তাই প্রথম বিচারেরর বিষয় কামিনী। বিচার কর। ঠাকুরের বিচার আবার সাংঘাতিক। বলছেন—একেবারে এই ভাবে : "মেয়েমানুষের শরীরে কি আছে—রক্ত, মাংস, চর্বি, নাড়ীভুড়ি, কৃমি, মুত, বিষ্ঠা এইসব। সেই শরীরের ওপর ভালবাসা কেন ?" স্বামীজী হলেন আগুন। তিনি আরও কঠিন ভাষায় বলছেন, শ্রীমকে—নির্লিপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না।....যে স্থানে কৃমি ক্লেদ, মেদ, দুর্গন্ধ—

"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধ নিরন্তকান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥"

কী অপূর্ব কথা আচার্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলছেন ! কী সুন্দর উপমা।

'লক্ষ্যচ্যুতং চেদ যদি চিত্তমীষদ্
বহির্মুখং সন্নিপতেত্ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ
সোপানপঙক্তৌ পতিত্যে যথা তথা॥'

অসাধারণ চিত্র ! আমি একটা বল নিয়ে সিঁড়ির উচ্চধাপে দাঁড়িয়ে আছি। বল হলো আমার মন, আমার চিত্ত। আমি সেই বলটা লোফালুফি করছি। হলো কি, বলটা হঠাৎ আমার হাত ফসকে সিঁড়ির ধাপে পড়ে গেল। আর কি কোনও উপায় আছে। সেই

বল লাফাতে লাফাতে সোজা চলে যাবে নিচের দিকে। একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে। আচার্য শঙ্কর বলছেন--বহির্মুখ চিত্তও বিষয় হতে বিষায়ান্তরে এই ভাবেই নিম্নগামী হবে। তাকে আর ফেরানো যাবে না।

"বিষয়েষ্বাবিশেচ্চেতঃ সংকল্পয়তি তদ্‌গুণান্।
সম্যক্ সংকল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম॥"

ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্রসেস' বা প্রক্রিয়া, সাইকেল বা চক্র আচার্য শঙ্কর সেইটি দেখিয়ে দিয়েছেন। মনে বিষয়-স্মৃতি জাগল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল চিন্তা, বিষয়টি কেমন, তার গুণ, রমণীয়তা। সঙ্গে সঙ্গে কামোদ্রেক। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বিষয় লাভের জন্য।

ঠাকুর এইবার কাঞ্চন বিচার করছেন—"টাকায় কী হয় ? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার ; বুঝেছ ?"

মাস্টারমশাই বলছেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে বস্তুবিচার।"

ঠাকুর বলছেন—হ্যাঁ, বস্তুবিচার ! এই দেখ টাকাতেই বা কী আছে আর সুন্দর দেহেই বা কী আছে। বিচার কর সুন্দরীর দেহতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল-মূত্র এইসব আছে। ঈশ্বরকে ছেড়ে এই সব বস্তুতে মানুষ কেন মন দেয় ?"

সেকাল আর একাল, মানুষ আর মানুষের সমাজ কিছু মাত্র বদলায়নি। ঠাকুর সমাজের আর একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। সেটি হলো অকারণে পরের ব্যাপারে নাক গলানো। ঠাকুর স্বামীজীকে প্রশ্ন করছেন—"নরেন্দ্র তুই কী বলিস ? সন্ন্যাসী লোকেরা কত কী বলে ! কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। হাতি কিন্তু ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে তুই কী মনে করবি ?"

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর উত্তর—"আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।"

কি ঠাকুরের কালে, কি আমাদের এই কালে, দেব-মানব ও পশু-মানবের সহ অবস্থান। তারও আগে তুলসীদাসের কালেও সেই একই চিত্র—যব হাতি চলে বাজারমে কুত্তা ভুঁকে হাজারমে। সাত্ত্বিকের ওপর তামসিকের অত্যাচার মানবসমাজের এক বৈশিষ্ট্য। নিরীহ, অক্রোধী মানুষকে মানুষ মারবে। অহিংস মানুষের মৃত্যু হয় সহিংস মানুষের হাতে। মানুষের সমাজ এই নীতিতেই চলে। অভ্যাস করে। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল এই মানুষ। অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের শিষ্য মনস্তাত্ত্বিক উইলহেল্ম রাইখের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানুষের উত্তরাধিকারটি কি—"You are heir to a dreadful past. Your heritage is a burning diamond in your hand." ভয়ঙ্কর অতীতের আমরা উত্তরাধিকারী। আমাদের ঐতিহ্য একখণ্ড জ্বলন্ত হীরের মতো আমাদের হাতের তালুতে। এই হলো মানুষের সর্বকালের পরিবেশ। রাইখের বর্ণনায় চিত্রটি সুপরিস্ফুট—মানুষের হাতেই

ানুষের নির্যাতন। গ্রহান্তরের মানুষ এসে আমাদের নির্যাতন করে না— "He suffers ind rebels, he esteems his enemies and murders his friends, wherever he gains ɔower as a representative of the people, he misuses this power and makes it into omething more cruel than the power which previoulsy he had to suffer at the ıands of individual sadists of the upper class."

এই প্রসঙ্গেই ঠাকুরের সেই সাপের গল্প। রাখালরা দৌড়ে এসে বললে—"ঠাকুরমশাই। ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে।" ব্রহ্মচারী লেলেন—"বাবা তা হোক। আমার তাতে ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি।" সাপের গুরু লেন ব্রহ্মচারী। মন্ত্র দিলেন। বলে গেলেন, "মা হিংসি"। অহিংস হয়ে যাও। দীর্ঘকাল রে ফিরে এসে দেখেন, সাপ মরো মরো। রাখালেরা প্রথম প্রথম ইট মেরে, ল্যাজ রে খুব ঘুরপাক খাইয়ে আছড়ে ফেলে আধমরা করে দিয়েছে। অবস্থা দেখে ব্রহ্মচারী ইংস্র সমাজে অহিংস হয়েও বেঁচে থাকার কৌশলটি বলে গেলেন—"আমি কামড়াতেই ারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়।"

ঠাকুর হলেন সর্বকালের গুরু। কাল সেই একই আছে। হিংস্র সমাজ। কাম-কাঞ্চনের াস মানুষ। তার হাতে জ্বলন্ত হীরকখণ্ডের মতো তার ঐতিহ্য। গণপ্রতিনিধি অতীত ংস্কার করতে গিয়ে গড়ে তুলবে নিষ্ঠুরতম বর্তমান। সংসারের অন্তঃসারশূন্যতা দেখেও উটের মতো কাঁটাগাছ চিবোবে। দু-কষ বেয়ে রক্ত গড়াবে। গেল গেল বলে মানুষ চিৎকার করবে আবার ছুটেও যাবে সেই হাড়িকাঠে মাথা গলাতে। অমলিন আনন্দের উৎস ঠাকুর। লছেন—বিচার কর। বস্তুবিচার। একটা হাত-সংসারে আর এক হাত ঈশ্বরের পায়ে। অনিষ্ট করো না কিন্তু ফোঁস ছেড় না। আর,

"মা ভৈষ্ট বিদ্ধবংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসার সিন্ধোস্তরণেহস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োহস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥"

আচার্য শঙ্করের কথা, আশ্বাসবাণী—ভয় পেয়ো না। তোমার বিনাশ হতে পারে না। ংসার-সাগর উত্তীর্ণ হবার উপায় আছে। বিচারসহায়ে বিষয় ভোগবিমুখ হও। অতঃপর রণ নাও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের। আত্মানন্দ-বিভোর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ তখন তোমাকে অবশ্যই করুণা করবেন। কারণ তোমার করুণ অবস্থা দেখে তাঁর করুণা হবে।

ঠাকুর! কাতরে করো করুণা॥

ধ্রুবতারা

কিছু চাইব না। সামান্যতম সুখও আমি চাইব না। ঠাকুর আপনি আমাকে যা দেবেন তাই আমার প্রাপ্য ; কারণ আমি জানি না, কি চাইতে হয় ! কোনটা আমার শ্রেয় কোনটা আমার প্রেয়। আর চাইবই বা কেন ? আপনাতে যখন সমর্পিত আমি, তখন আপনিই তো জানবেন আমার প্রয়োজন। আপনিই তো আমার ভবরোগের বৈদ্য। আমার ওষুধ, আমার পথ্য সবই তো হবে আপনার বিধানে। অভিযোগে গ্রহণ করতে শিখি। দুঃখ, সেও আপনার দান, সুখ সেও আপনার দান, এই বোধে আমি যেন অবিচল থাকতে পারি। আমি যেন আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। আমি যেন আপনার দর্শন পাই। আমি যেন আপনার স্পর্শ পাই। আমি যেন আপনার পদশব্দ পাই। আমি যেন আপনাকে অনুসরণ করিতে পারি। আমার বিশ্বাস যেন টলে না যায়। একটা দানই আমি সকাতরে চাইব—কৃপা। নিরন্তর আমার এই প্রার্থনা—কৃপাকণিকা। কৃপা কি ? আপনাকে বিশ্বাস। একটু অহংকারও মিশুক না। কি সেই অহংকার। আমি আপনার সন্তান। রামপ্রসাদের অহংকার :

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি ॥

রাজা যার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তার আবার কিসের ডর ! ঠাকুর আপনিও বলতেন, রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না। বলতেন, মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে। রামকৃষ্ণের সন্তান আমি, আমার দিন ঠিকই চলে যাবে। প্রলোভন আমি জয় করতে পারব। আপনি বলেছিলেন, সংসারে থাকবি পাঁকাল মাছের মতো। সেই পাঁকালের পিচ্ছিলতা আমি পাব আপনার কৃপায়। আপনি বলেছিলেন, হনুমান হতে। মহাবীর বুক ফেঁড়ে দেখালেন, রামসীতা। আমার নিষ্ঠায়, আমার বুকেও যেন ঠাকুর আর শ্রীমায়ের আসন পাকা হয়। নিষ্ঠা হল, বালকের বিশ্বাস। বিশ্বাসে আমি যেন বালক হতে পারি। আপনি সেই জটিল বালকের গল্পটি বলেছিলেন—এক বিধবার একটি ছোট ছেলে ছিল। তার নাম জটিল। জটিল দূরে গুরুমশায়ের পাঠশালে পড়তে যেত। বিধবা বড় গরীব ছিল। তাঁদের আপন বলতে আর কেউ ছিল না। জটিলকে একটা বনের ভেতর দিয়ে পাঠশালে যেতে হত। বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে রোজই তার ভয়

রত। একদিন মায়ের কাছে কেঁদে সে বলল—'মা, একা একা পাঠাশলে যেতে আমার ড ভয় করে। আমার সঙ্গে একটি লোক দাও। নইলে আর পাঠশালে যাচ্ছিনে।'

জটিলের কথায় মায়ের মনে দুঃখ হল ; বললেন 'লোক কোথা পাব, বাছা। বনে মার এক দাদা থাকে। তার নাম মধুসূদন। ভয় পেলে তাকে ডেকো। সেই তোমার ঙ্গ যাবে।' বালক সরল বিশ্বাসে ডাকে মধুসূদন দাদা, তুমি কোথায় এসো! বালকের কে তিনি এলেন। সত্যিই এলেন, নির্জন বনপথ পার করে দিতে। গুরুমশাইয়ের মায়ের দ্ধ। সব ছেলেরাই সব কিছু দিচ্ছে। জটিল কি দেবে! মা বললেন, 'তোমার মধুসূদন দাকে জিজ্ঞেস করো'। তিনি বললেন, 'গুরুমশাইকে বোলো, তুমি দই দেবে'। কাজের ন জটিল ছোট এক ভাঁড় দই নিয়ে হাজির হল। গুরুমশাই ক্ষিপ্ত—এত নিমন্ত্রিত আর তটুকু দই। প্রহারে জটিল জ্ঞানহারা। ওদিকে অলৌকিক কাণ্ড, মধুসূদনের ভাণ্ড আর রোয় না। যত ঢালে তত দই। গুরুমশাই বললেন, 'জটিল, তোমার মধুসূদন দাদাকে কবার দেখাবে'! বনের প্রান্তে সবাই হাজির। জটিল ডাকছে, 'মধুসূদন দাদা এসো। মার গুরুমশাই দেখবেন।'

তিনি উত্তর দিলেন—'জটিল আজ আমি আসতে পারব না। তুমি সরল বিশ্বাসে মাকে পেয়েছ। তোমার গুরুমশায় ও অন্যান্য ছাত্রদের তোমার মতো বিশ্বাস নেই। রা আমায় দেখতে পাবে না। তারা চলে গেলেই আমি তোমার কাছে আসব'।

এই সংসার অরণ্যে, ঠাকুর আমি একলা পথিক। কেউ নেই আমার, অর্থ, সামর্থ্য, াকবল। আপনি আমার মধুসূদন দাদা। বালকের বিশ্বাসে ডাকি, ঠাকুর, ঠাকুর। াসের সুতোয় অবিশ্বাসের সামান্যতম ফেঁসোটি যখন ভক্তিলালায় মসৃণ হয়ে যাবে, নই তা রামকৃষ্ণ সূচের ছিদ্রে অনায়াসে প্রবিষ্ট হবে।

তবু যদি দুঃখ পাই জ্বালাযন্ত্রণা আসে আসুক। আপনি বলেছেন :

'কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে ল ; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ লেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে। শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত বাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছল। একজন কাঠুরে ম ভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে ; তিনি কত ভালবাসতেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু । কাঠুরের কাজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে র্ভুজ শঙ্খচক্রগদা পদ্মধারী ভগবানের দর্শন পেলেন দেবকী। কিন্তু কারাগার ঘুচলো । প্রারব্ধ কর্মের ভোগ আমাকে করে যেতেই হবে। আমার মন তৈয়ার। যে ক'দিন গ আছে, সেই কদিন দেহধারণ। কিন্তু আমার আনন্দ! আপনিই সেই আনন্দ।

ওহে ধ্রুবতারাসম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ।

পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে

ঠাকুর আপনি কি নারী-বিদ্বেষী ছিলেন? একালের নারীমুক্তির যুগের আধুনি
যদি এই কথা মনে করে আপনার প্রতি অভিমানী হয় তাহলে কি করা যাবে? আ
একদিন বললেন : "মেয়েমানুষের কাছে খুব সাবধান হতে হয়। গোপাল ভাব।
কথা শুনো না। মেয়ে ত্রিভূবন দিলে খেয়ে। অনেক মেয়েমানুষ জোয়ান ছোকরা, দে
ভালো, দেখে নতুন মায়া ফাঁদে। তাই গোপাল ভাব।" এই যে আপনি বললেন : '
ত্রিভুবন দিলে খেয়ে'। এই উক্তিটি শুনে মহিলারা হয়তো দুঃখ পাবেন। সংসারী জী
আপনি মেনে নিলেও, আদর্শ সংসার ও সংসারীর একটি ধারা আপনি বারে বারে নি
করে গেছেন। সংসার যে আদতে এক ধোঁকার টাটি, সেকথা আপনি স্মরণে রা
বলেছেন। সেদিন একটি সুন্দর গল্পেও বলেছিলেন : "গুরু শিষ্যকে একথা বুঝাচ্ছিলে
ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। শিষ্য বললে, আজ্ঞা মা, পরি
এরা তো খুব যত্ন করেন ; না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন। গুরু বলে
ও তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার নয়। এই
বড়ি কয়টি তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি বাড়িতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো। লে
মনে করবে যে, তোমার দেহত্যাগ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তোমার সব বাহ্যজ্ঞান থাক
তুমি দেখতে শুনতে সব পাবে—আমি সেই সময় গিয়ে পড়ব। শিষ্যটি তাই কর
বাটীতে গিয়ে বড়ি কটি খেলে। খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। মা, পরিবার,
সকলে কান্নাকাটি আরম্ভ করলো। এমন সময় গুরু কবিরাজের বেশে গিয়ে উপ
হলেন। সমস্ত শুনে বললেন, আচ্ছা এর ঔষধ আছে—আবার বেঁচে উঠবে। তবে এ
কথা আছে। এই ঔষধটি আগে একজন আপনার লোকের খেতে হবে, তারপর
দেওয়া যাবে। যে আপনার লোক ঐ বড়িটি খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এ
ওরা মা কি পরিবারে এঁরা তো সব আছেন, একজন না একজন কেউ খাবেন, স
নাই। তা হলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে।

"শিষ্য সমস্ত শুনছে। কবিরাজ আগে মাকে ডাকলেন। মা কাতর হয়ে ধূলায় গড়া
দিয়ে কাঁদছেন। কবিরাজ বললেন—মা আর কাঁদতে হবে না। তুমি ওই ঔষধটি খ
তাহলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে। তবে তোমার এতে মৃত্যু হবে। মা ঔষধ হাতে ভা

লাগলেন। অনেক ভেবে চিন্তে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা আমার আর কটি ছেলে মেয়ে আছে, আমি গেলে কি হবে, এও ভাবছি। কে তাদের দেখবে, খাওয়াবে, তাদের জন্যে ভাবছি। পরিবারকে ডেকে তখন ঔষধ দেওয়া হলো—পরিবারও খুব কাঁদছিলেন, ঔষধ হাতে পরে তিনিও ভাবতে লাগলেন। শুনলেন যে, ঔষধ খেলে মরতে হবে। তখন কেঁদে বলতে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার, তাতো হয়েছে গো, আমার অপগণ্ডগুলির এখন কি হবে বল ? কে ওদের বাঁচাবে ! আমি কেমন করে ও ঔষধ খাই ? শিষ্যের তখন ঔষধের নেশা চলে গেছে। সে বুঝলে, যে কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বললেন, তোমার আপনার কেবল একজন—ঈশ্বর।"

পরে আর একদিন এই গল্পটাই আপনি একটু অন্যভাবে বলে আর এক কাহিনী সংযোজন করছিলেন, সেটি আরও মারাত্মক। যেমন, "আর একজন শিষ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্যে গুরুদেব যেতে পারছি না। শিষ্যটি হঠযোগ করতো। গুরু তাকেও একটি ফন্দি শিখিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে হঠযোগী ঘরে আসনে বসে আছে—এঁকেবেঁকে আড়ষ্ট হয়ে। সব্বাই বুঝতে পারলে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে, ওগো আমাদের কি হলো গো, ওগো তুমি আমাদের কি করে গেলে গো—ওগো দিদি গো, এমন হবে তা জানতাম না গো। এদিকে আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে।

"এখন একটি গোল হলো! এঁকেবেঁকে আড়ষ্ট হয়ে থাকাতে সে দ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দৌড়ে গিয়ে একটি কাটারি লয়ে দ্বারের চৌকাঠ কাটতে লাগল। স্ত্রী অস্থির হয়ে কাঁদছিল, সে দুমদুম শব্দ শুনে দৌড়ে এলো। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, 'ওগো কি হয়েছে গো !' তারা বললে 'ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই চৌকাঠ কাটছি।' তখন স্ত্রী বললে, 'ওগো, অমন কর্ম করো না গো। আমি এখন রাঁড় বেওয়া হলুম! আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে। এ দুয়ার গেলে আর তো হবে না। ওগো ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে—হাত, পা ওঁর কেটে দাও।' তখন হঠযোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, 'তবে রে শালী, আমার হাতপা কাটবে।' এই বলে বাড়ি ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল।'

এরপর আপনি যোগ করলেন, উপসংহার, "অনেকে ঢং করে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে আর আর গহনা সব খোলে ; খুলে বাক্সের ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তারপর আছড়ে এসে পড়ে আর কাঁদে, 'ওগো দিদিগো, আমার কি হলো গো' !"

ঠাকুর, মায়ার সংসারে, স্বার্থের সংসারে নারীর চিত্র! এমন দর্শন, এমন নিপুণ পর্যবেক্ষণ আপনার মতো অন্তর্যামীর পক্ষেই সম্ভব। আর সাহস। বেপরোয়া সাহস। কোনো রাখঢাক নেই। রামপ্রসাদ বলেছিলেন গানে একটু নরম করে, 'যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে। সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥'

গিরিশকে আপনি একদিন বললেন, "দেখ না, মেয়েমানুষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্যারূপিণী মেয়েদের। পুরুষগুলোকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে দেয়। যখনই দেখি স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বসে আছে তখন বলি, আহা ! এরা গেছে—হারু এমন সুন্দর ছেলে তাকে পেতনীতে পেয়েছে ! ওরে হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল, আর হারু কোথা গেল ! সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নাই, সে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই। বটগাছের পেতনীতে হারুকে পেয়েছে। "স্ত্রী যদি বলে 'যাও তো একবার'—অমনি উঠে দাঁড়ায়, 'বসো তো'—অমনি বসে পড়ে !"

একালের ভাষায় আমরা যাকে বলি জরু কা গোলাম। আপনার সেই বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ীর গল্প। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তিনি ভাবতে লাগলেন, "এরা সিদ্ধ হলো, লোককে যা বলবে তাই ফলবে, যে দিক দিয়ে যাবে সেই দিকেই ভয় ; কেননা লোকে না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে।" বীরভদ্র তাঁদের জন্যে মেয়েছেলেদের ফাঁদ পাতলেন। একশো বেরিয়ে গেল কেটে ; বারশোর জুটলো সেবাদাসী। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকতে আর সে বল রইল না, কেননা সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়।

ঠাকুর, সংসারীকে আপনি সত্যিই কি তেমন বিশ্বাস করতেন ? সংসার থেকে দূরে থেকে সংসার দেখেছেন আর বলেছেন, "কেবল ঝগড়া, কোঁদল, হিংসা, তারপর রোগ, শোক, দারিদ্র্য। দেখে বললাম—'মা এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও।' সকলেরই ঈশ্বরের দিকে মন—বিদ্যার সংসার, এরূপ প্রায় দেখা যায় না। তাই বলি, মা যদি কখনও শরীর ধারণ হয়, যেন সংসারী করো না।"

তাই তো বলি ঠাকুর, মায়েরা যাই ভাবুন, মলাট উলটে স্বরূপ তো আপনি দেখিয়ে দিলেন। আমরা এই শ'য়ে শ'য়ে ন্যাড়া এখন কি করি ? পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। তবে এটাও ঠিক নির্বোধ উটের তো কাঁটা গাছই পথ্য। আপনি তো চেতনের সারথি। অচেতনের জন্যে, 'তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বস। অথবা, যাও বেশ বিল্ডিং দেখ গে।'
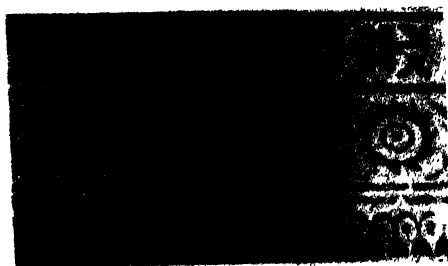
সরষে পেষাই

ঠাকুর আপনি বলুন, দুটি দিকের সমন্বয় কিভাবে সম্ভব ? ধর্ম আর কর্ম ! একালের কর্ম আর কর্মস্থল আপনি জানেন। জানেন সেখানকার পরিবেশ কেমন। একালের মানুষের মানসিকতা আপনার অজানা নয়। চরম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মানুষ রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছে। ভোগবাদ চরম আকার ধারণ করেছে। শান্ত, সুস্থ জীবনের ছবি হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষ সদ্ভাব আর থাকছে না। সমাজের চালচিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে। মানুষের আধ্যাত্মিকতা অবিশ্বাসে তলিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করব ঠাকুর ? আমার যারা আপনাকে ধরে আছি ! আমাদের আঘাত যে বড় প্রবল হয়ে উঠছে !

আপনি বলেছেন, "সহ্য করো। যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।" সহ্য করতে করতে আমরা এখন এমন জায়গায় এসে পড়েছি যখন আর নিজেকে সহনশীল বলে মনে হয় না, মনে হয় অত্যাচারিত, নিপীড়িত। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি একটা মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপ। আপনি আপনার সাপকে বলেছিলেন, হিংসা করিস না, যাকে-তাকে বড়ো ছোবল মারতে যাসনি। নিরীহ সাপ যখন অত্যাচারিত হতে হতে প্রায় মরো মরো, আপনি তখন বললেন, তোকে তো আমি ফোঁস করতে বারণ করিনি। 'ফোঁস' মানে প্রতিবাদ। আমরাও প্রতিবাদের চেষ্টা করে দেখেছি। কোন লাভ নেই। সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একক কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। আজকাল ফ্যাশান হয়েছে প্রতিবাদকারীকে ধরাধাম থেকে নির্দ্বিধায় সরিয়ে দেওয়া। সব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হলেও মানুষের জীবনের মূল্য প্রায় নেই বলেই হয়। অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনের মতো অখণ্ড অসভ্যতায় দেশ ভেসে যাচ্ছে। আমরা এখন কি করব ঠাকুর ? ফোঁস করলেও যে বিপদ !

আপনি বলেছিলেন, "তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।" ঠাকুর, এখন দেখছি জগৎ-সংসারে অন্য তেলের কারবার চলেছে। তোষামোদের তেল ! বড় মানুষ, ক্ষমতাশালী মানুষকে কখনো চাটুকারিতার তেল, কখনো উপঢৌকন দিতে পারলে পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করতে পারে। বিষয়কে তো আর 'বিষ' বলছে না কেউ, বলছে অমৃত। ক্ষমতাশালীকে তৈল মর্দন করতে পারলে বিষয়ামৃত পাওয়া যায়। আত্মার

শক্তি, বিদ্যার শক্তি, জ্ঞানের শক্তির চেয়ে দেহের শক্তির ভয়ঙ্কর কদর। বলের মধ্যে পশুবলই শ্রেষ্ঠ বল। সভ্যতার সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে। অসভ্যতাই সভ্যতা হচ্ছে। ত্যাগের বদলে গ্রহণই হচ্ছে নীতি। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের ঝান্ডাটি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড় মৃগয়ায়। কে মরল, কে বাঁচল তোমার দেখার দরকার নেই। তুমি নিজে সুখভোগের চেষ্টা কর। এই নীতি যদি তুমি পরিত্যাগ কর, লোকে তোমাকে বোকা-হাঁদা বলবে। পরিবার-পরিজন বলবে অপদার্থ। ঈশ্বরে ভক্তির অর্থ করবে—ভণ্ডামি। মুখের ওপর স্পষ্ট বলবে, সংসারে কেন ? সংসার করেছ কেন ? সন্ন্যাসী হলেই পারতে। নিজে মরছ, মর আর পাঁচজনকে মারার অধিকার তোমার নেই। আমরা চাই। আধুনিক জীবনের সবরকমের ভোগ-সুখ আমরা চাই। তোমার ঈশ্বর নিয়ে তুমি থাক, আমাদের ঈশ্বর হলেন আধুনিক জীবনের সাজ-সরঞ্জাম। আমাদের ভবিষ্যৎ তোমার ঐ তত্ত্বকথায় নেই, আছে তোমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সে। আত্মোপলব্ধির পথে তুমি কতটা এগোলে আমাদের জানার দরকার নেই। আমরা জানতে চাই, চাকরিতে কতটা উন্নতি করলে ? ক্ষমতা কতটা বাড়ল। আমাদের বৈষয়িক সুখ তুমি কতটা বাড়াতে পারলে ! তোমার জ্ঞান আমরা চাই না। তোমার অর্জিত ঐশ্বর্যই আমরা ভোগ করতে চাই।

ঠাকুর, অতিশয় প্রকট হয়ে উঠেছে আমাদের আত্মিক সংগ্রাম। যারা আপনার ভাবে ভাবিত, সংসার থেকে ক্রমেই তারা আরো দূরে সরে যাচ্ছে। ব্যবধান বাড়ছে। বাড়ছে নিঃসঙ্গতা। মনে হয় ভালই হচ্ছে। আগে ছিল আপনার জন্যে কখনো-সখনো দু-এক ফোঁটা চোখের জল। এখন অহরহ-ক্রন্দন। বনের পথে সেই জটিল বালকের মতো—কোথায় আমার মধুসূদনদাদা ! তুমি এসো। আগে আপনাকে ডাকার মধ্যে হয়তো শৌখিনতা ছিল। অ্যামেচার রামকৃষ্ণানুরাগী। এখন সেই ডাক অনেক আন্তরিক। অনেক কাতর। সেই ডাকে 'তিন টান' এক হতে পেরেছে। বুঝেছি চারপাশে যা ঘটছে সবই আপনার ইচ্ছায়। এই পরিস্থিতিতে না পড়লে আমাদের মোহ-নাশ হতো না।

আপনি বলেছিলেন, 'নাক তেরে কেটে তাক' বোল মুখে বলা সহজে, হাতে বাজানো কঠিন। সেইরকম ধর্মকথা বলা সোজা, কাজ করা বড় কঠিন। আগে, ঠাকুর আপনাকে সাধতুম মুখে। এখন সাধি অন্তরে। আপনি বলেছিলেন, ঈশ্বর মন দেখেন। আপনি আমাদের মন দেখুন। মন আর মুখ এক হয়েছে কিনা ! মুখের বোল মনের আঙুলে ফুটছে কিনা। আপনার অসীম কৃপা আমাদের আজ এই পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে। মোহনাশ, তমোনাশ। এইতো পেয়েছি সাধন-পরিমণ্ডল। আপনি বলেছিলেন, "দীঘিতে বড় বড় মাছ আছে, চার ফেলতে হয়। দুধেতে মাখন আছে, মন্থন করতে হয়। সরিষার ভেতর তেল আছে, সরিষাকে পিষতে হয়। মেথিতে হাত রাঙা হয়, মেথি বাটতে হয়।' জীবনের ওপর সেই প্রক্রিয়াই চলেছে। কি আনন্দ !

কেন

ঠাকুর সাহস করে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। অসন্তুষ্ট হবেন না। আপনি বললেন, 'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ-ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে ; টাকার জন্যে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় ; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কেঁদেছে, ডাকার মতো ডাকতে হয়।' আপনি গান ধরলেন, 'ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।' গান শেষে বললেন, 'ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হয়। তারপর সূর্য দেখা দেবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান।' সেইখানেই আমার অভিমান। তিনি আমার মা। শ্যামা মা। নির্জনে বসে আমি মাকে বললুম—'মা তুমি আমাদের কেমন মা ? কতকাল ধরে সেই একই কথা শুনে এলুম—আমি তোকে দুঃখ দোবো, জ্বালা-যন্ত্রণা দোবো, তোর সব কিছু কেড়ে নোবো, কেন ? না, তাহলে তুই আমাকে ডাকবি। যে করে আমার আশ, আমি করি তার সর্বনাশ। বা, কথা। আমি যদি তোমার ছেলে হই, তাহলে তুমি আমাকে কাছে ডাকবে না কেন। তোমার সামান্য কৃপায় তো আমার মন ঘুরে যেতে পারে। দেহ যখন দিলে, তখন দেহের প্রয়োজনে তো আমাকে জীবিকা খুঁজতেই হবে। হা অন্ন ! হা অন্ন। এ তো মা তোমারই খেলা। অন্নদান করেই তো পাঠালে। পাশাপাশি পাঠিয়ে দিলে অন্নদাতা। তোমার সৃষ্টির প্রয়োজনেই তুমি পুরে দিলে সংসার-বাসনা। সংসারের প্রয়োজনেই বিবাহ। বিবাহ মানেই সন্তানাদি। আমার ইচ্ছেতে তো কিছু হয়নি মা। সবই তোমার ইচ্ছে। সাধকই তো বলেছেন—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। তুমি আমাকে সংসারের চক্রে ফেলবে। দাসত্ব করাবে। হা অন্ন, হা অন্ন করে দিগ্বিদিকে ছোটাবে। তারপর তুমিই আমাকে সংসারবদ্ধ জীব বলে ঘৃণা করবে। সেভাবে তোমাকে ডাকা হলো না বলে সরে থাকবে। এ তোমার কেমন বিচার ! আমার জাগতিক মা কি আমাকে দিনান্তে ডেকে ঘরে তুলতেন না ! আমার জন্যে ব্যাকুল হতেন না ! আমি ভুলে থাকলেও তিনি তো আমাকে ভুলতেন না। আর তুমি জগৎ-মাতা হয়ে এই ব্যবস্থা করলে যে, আমাকে যতরকম বিপদে ফেলে আমাকে দিয়ে গলা ছেড়ে কাঁদাবে। আমার জীবিকা টলোমলো হবে, পুত্র-কলত্র অকালে চলে যাবে, মামলা-মকর্দমা, চূড়ান্ত অপমান, সবই আমাকে সহ্য করতে হবে। সব হারিয়ে

সর্বহারা হয়ে আমি তোমাকে ডাকবো। তাতেও তোমার কৃপা হবে কিনা কে জানে! এমনই অনিশ্চিত ব্যাপার। তখন সাধকরা বলবেন—এক জন্মে কি হয় বাবা! কত জন্ম সাধনা করলে তবেই না মাকে পাওয়া যায়! আবার এও শুনলাম, মিনমিনে আস্তিকের চেয়ে নাস্তিক ভালো। শত্রুরূপে ভজনা। কংসের মতো, মহিষাসুরের মতো, রাবণের মতো। আমার বড় অভিমান মা তোমার ওপর। একবারও কি আমার কথা তোমার মনে পড়ে না! তাহলে সাধক কেন বললেন—কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়। আমার জাগতিক মাতা যদি আমার প্রতি উদাসীন হতেন, জগৎ কি তাঁকে ক্ষমা করত। আর তুমি জগৎ-মাতা বলে সবকিছুর উর্ধ্বে! তোমার বিধানই বিধান, আর আমার অভিমান ভেসে যাবে? সারাটা জীবন আমি অনাথের মতো ঘুরবো? সংসারের খিদমৎ খেটে যাবো। খারাপ যা কিছু হবে, সবই আমাকে ভেবে নিতে হবে, তোমার পরীক্ষা। চোখের জল ফেললে বলতে হবে, মা, সবই তোমার পরীক্ষা, তুমি যা করছ সবই আমার মঙ্গলের জন্যে। সাধক বলবেন—'মাকে হেরবো বলে ভাবনা তোমরা কেউ করো না আর। সে যে তোমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবাকার। ছেলের মুখে মা, মা বুলি শুনবে বলে শিবরাণী আড়াল থেকে শোনে, পাছে দেখলে যদি না ডাকে আর।' কি সুন্দর। সারা জীবন আমি ছটফট করবো, আর তুমি আড়াল থেকে দেখবে। কারণ দর্শনমাত্রই আমার ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি একবার দেখা দিয়ে দেখ না, আমার অবস্থাটা কি হয়!'

ঠাকুর আপনিই বলুন। আপনারও তো এই একই অভিমান হয়েছিল। রামপ্রসাদকে দেখা দিলি মা, আমাকে দেখা দিলি না বলে, মায়ের হাতের খড়্গ নিয়ে নিজের জীবন বলি দিতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই এক রোকে মায়ের দর্শন পেলেন। তারপর কি হলো আমরা সবাই জানি। টাকা মাটি হলো, মাটি টাকা হলো। আপনি পরমপুরুষ, আমি শুধুই পুরুষ। তাহলে অহৈতুকী কৃপা কথাটা কোথা থেকে এলো? বৃষ্টিধারায় পৃথিবী স্নাত হয়, তার জন্যে পৃথিবীকে তো সাধনা করতে হয় না। তার সুন্দর ব্যবস্থা তো তিনিই করে রেখেছেন সৃষ্টিকালে। তিনের চার ভাগ জল করলেন আর একের চার ভাগ স্থল। সূর্যকে এনে বসালেন গ্রহরাজির মাঝখানে। স্থল যেই উত্তপ্ত হলো বাতাস উঠে গেল ওপরে। জলকণা নিয়ে বাতাস ছুটে এলো জলভাগ থেকে। জলকণা উড়ে গেল মেঘের পেখম মেলে। উর্ধ্বাকাশের শৈত্যে জমে বিদ্যুতের স্পর্শে নেমে এলো বারিধারা হয়ে। কাল থেকে কালান্তর এই আবর্তনই চলবে। বিজ্ঞানের হাতে পৃথিবীকে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমাদের জীবন! কৃপাধারা কেন আসে না অযাচিত। আমাদের জীবনও তো সংসার-কটাহে উত্তপ্ত নিয়ত, মন উড়ে যাচ্ছে বিষয় থেকে। বিষয় মনে হচ্ছে বিষ। অবিরত মন বলছে—মা তুমি কোথায়? বলছে—'মন চল নিজ নিকেতনে সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে। বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেউ নয় আপন।' তবু মা আসেন না। ক্ষণিকের তরেও না।

ঠাকুর আপনি বললেন, 'বিড়ালের ছানা কেবল মিউমিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে—কখনো হেঁশেলে, কখনো মাটির ওপর,

কখনো বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউমিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।' তাই যদি হয়, তাহলে আর কবে তিনি আসবেন ! অবিরতই তো মিউমিউ করছি। আপনি বলেছিলেন, ঈশ্বর মন দেখেন। মনে-মুখে এক হতে হবে। সে পরীক্ষাও দিতে রাজী আছি। 'আর কবে দেখা দিবি মা ! হর মনোরমা ! দিন দিন তনুক্ষীণ, ক্রমে আঁখি জ্যোতিহীন।' আর একটা জীবনও তো চলে গেল।

মা যদি সংসারী জীবকে এলে দেন তাহলে তারা তো আরও নষ্ট হয়ে যাবে। মায়ের সংসারে মা কেন গোছাবেন না ! কেন মা আমাকে শাসন করে পথে আনবেন না ! জীবনের পর জীবন নষ্ট হতেই থাকবে। তারপর একজীবনে আমি মায়ের দর্শন পাব। আপনি বলবেন, তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চোখে তাঁকে দেখে, সেই কানে তাঁর বাণী শোনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গযোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে আত্মার সঙ্গে রমণ হয়। ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব হলে তবেই তো চারদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারিদিকে হলদে দেখা যায়। তখন আবার 'তিনিই আমি' এটিই বোধ হয়।'

ঠাকুর, সবটাই আমার দিকে। আমাকে হতে হবে। মা কেন হওয়াবেন না ?

রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুল

পরিবেশের চুর হয়ে আছি ঠাকুর। অহরহ দোলা দিয়ে যাচ্ছে। কোদলানো পথে গাড়ি করে গেলে যেমন হয়। লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, টাল খাচ্ছে, টোল খাচ্ছে। স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এ কেমন ভ্রমণ। কবে একটু মসৃণ পথে আমার হাওয়া-গাড়ি ফুরফুর করে চলবে ? নাকি এইভাবেই সারাটা পথ চলবে ?

"এ-প্রশ্ন তোমার একার নয় ! সব সংসারীরই এক প্রশ্ন। ঢেউ আসছে, ঠেলে তুলছে, মারছে সপাটে আছাড়। তটভূমি, সোনালী বালি খামচে ধরার চেষ্টা করছে। আর জলে নয়। অপসৃয়মাণ বালি আবার হড়কে ফেলে দিচ্ছে লোনা জলে। নাকানি-চুবানি। অসহায়। একরাশ ডাবের খোলার মতো দুলতে দুলতে ভাসছে একা তুমি নও, আরও সবাই। এক একজনের এক এক নাম। এই তোমার ভবসংসার।

"যতক্ষণ নিজে হাঁচড়-পাঁচড় করবে ততক্ষণ মুক্তি নেই। কারণ, মুক্তি তোমার হাতে নেই। শরীরে নেই। সক্রিয় চেষ্টায় নেই। আছে তোমার মনে। আছে তোমার প্রশ্নে ও আমার উত্তরে। যেমন, আমিও জানি, 'প্রায় ও বর্ষা লেগেই আছে, সূর্য দেখা যায় না !' এই তো সংসার। 'দুঃখের ভাগই বেশি .' কেন ? সে দুঃখ তোমার নিজের তৈরি। তোমার মোহ ! জেনে রাখো, কামকাঞ্চন-মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না।' এই মেঘমুক্তির উপায় কি ? কোন্ বাতাসে এই মেঘ উড়ে যাবে ? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

"অতি সহজ বিধান আবার অতি কঠিন। কঠিনতমও বলা চলে। ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে ? আসবে ধাক্কা খেতে খেতে। আহত ক্ষত বিক্ষত হতে হতে। তখন আপনিই মন বলবে

'মন-মাঝি তোর বইঠা নেরে।
আমি আর বাইতে পারলাম না॥'

"অসহায়বোধ থেকেই আসে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা। যতক্ষণ ভোগ, যতক্ষণ কাম-কাঞ্চন, সংসারে আসক্তি, যতক্ষণ আস্বাদনের ইচ্ছা, আহা দেখি না একটু নেড়ে চেড়ে, বিড়ালের আরশোলা ধরা, ততক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা। হবে না। সুতো—মনসুতো ঈশ্বর ছুঁচে

ঢুকবে না। কামনার ফেঁসো বেরিয়ে আছে। ভক্তিলালায় মসৃণ করে নিতে হবে। সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্যে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয় ; যখন কাম-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ পায় তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। ভোগ না করলে ত্যাগ অনেকের হয় না।

"অনেক ছটফটানির পর হঠাৎ বিচার আসে। কি ভোগ সংসারে করবে ? কাম-কাঞ্চন ভোগ ? সে তো ক্ষণিক আনন্দ—এই আছে, এই নেই। আমি বললে, হবে না, নিজে পরখ করে দেখ। মনে একটা খাতা খোলো। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বুকের মতো। একপাশে ডেবিট, আর একপাশে ক্রেডিট। যত বাতি গলে গেল, খেলা কি তত জমলো ? জ্বালা যত পেলে, আনন্দ কি সেই পরিমাণ হলো ? বুঝতে পারছ না ? তুমি অজ্ঞান। যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়। তাদের হাতে আতসকাঁচ তুলে দিয়ে লাভ কি ! আতসকাঁচের ওপর সূর্যের কিরণ পড়লে কত জিনিস পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতসকাঁচ নিয়ে গেলে ওটি হয় না। ঘর ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। তোমার হাতে আমি আতসকাঁচ দিয়েছি। মনের চোরকুটির ছেড়ে বেরিয়ে এস। কাম-কাঞ্চনের খুপরি পরিত্যাগ কর।

"জ্ঞানের পৃথিবী বাইরে নেই। জ্ঞান দিয়ে পৃথিবী সাজাও। বাইরে থেকে ভিতরে নয়। ভিতর থেকে বাইরে যাও। নিশ্চেষ্ট হয়ে সমর্পণ কর। সে কি রকম ? তাহলে শোন :

"একটি পাখি জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখির চটকা ভাঙল।

"ছিলে মায়ের কোলে, পিতার নিরাপদ আশ্রয়ে, জননী জাহ্নবীতে, পিতার অর্ণবপোতে, পৌগণ্ডলীলায়। হঠাৎ দেখলে কেউ নেই। সময়ের স্রোতে ভেসে গেছে। তখন পাখির চটকা, ভাঙল, সে দেখলে চতুর্দিকে কূলকিনারা নেই। তখন ডাঙায় ফিরে যাবার জন্যে উত্তরদিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেল, তবু কূলকিনারা দেখতে পেল না। তখন কি করে, ফিরে এসে মাস্তুলে আবার বসল।

"পাখি পুবে গেল, পশ্চিমে গেল, পাখি দক্ষিণে গেল। অকূল পাখী যখন দেখলে কোথাও কূলকিনারা নেই, তখন সেই যে মাস্তুলের ওপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল।

"শরণাগত। এই শরণাগতি এলে ভবার্ণব হয়ে যাব কৃপাসমুদ্রে। সংসার-পোত হয়ে যাবে নির্ভর, নির্ভার তরণী। তখন মনে আর কোনও ব্যস্তভাব না অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে, আর কোন চেষ্টাও নেই।"

এই তো আমার রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুল ॥

কলকাতা এবং রামকৃষ্ণলোক

ঠাকুর আপনার কাছে সমর্পণ করে দিলুম। আপনি কি আমাকে গ্রহণ করবেন? প্রথমেই তো আপনি আমার মন দেখবেন। দেখবেন আমি কতটা বিষয়াসক্ত। আমার আসক্তি ঘুচেছে কিনা। সুপুরিগাছের বেল্লো। না শুকোলে তো খুলে পড়বে না। দেখবেন আমি ঝুনো হয়েছি কিনা। ঝুনো হলেই না শাঁস আর খোলা আলাদা হবে। নাড়ালে খটখট শব্দ হবে। ঝুনো কাকে বলে? সংসারে আর রস পাই না। শুকনো মনে হয়। ভাল লাগে না। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন এক অস্তিত্ব। গাইতে ইচ্ছে করে

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এস।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায় গীতসুধারসে এস॥

সবকিছুর মধ্যে থেকেও ভেতরে সদাই এক হাহাকার। ঠাকুর, আপনি আমার এই হাহাকারকে অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আমার নিবেদন, আমার এই শূন্যতা। আপনি আমাকে নতুন আশায় বাঁচতে শেখাবেন। ধন, জন, মান সম্মান নয়, আনন্দে বাঁচার কৌশল শেখাবেন। ভয় থেকে যে মুক্ত হতে পারে সেই তো থাকে আনন্দে। কিসের ভয়। হারাবার ভয়। আমরা তো হারাতেই বসেছি। একটা একটা করে খসে পড়ছে জীবনের দিন। 'যাহা যায় তাহা যায়।' দিন গেলে তো আর ফেরে না। এগিয়ে আসে অনিবার্য জরা। এই সংসারের যা কিছু সবই তো অর্জন করেছি শরীর দিয়ে। শরীর দিয়েই ধরে রাখতে হবে। প্রথম প্রথম মনের সায় ছিল। দেহ যা করছে, মন তাতে উল্লসিত হচ্ছে। হঠাৎ সেই মন পড়েছে মুষড়ে। দেহনির্ভর সুখ তো চিরস্থায়ী হতে পারে না। দেহের অশ্বের লাগাম ধরা হাত শিথিল হলেই তো ছিটকে পড়ে যাব। অবিরত নৃত্য করেই বা ভাল লাগে। কিন্তু যে প্রান্তরে সব অশ্বারোহীই ছুটছে সেখানে আমি এক পাশে দাঁড়াই কি করে। বেঁচে থাকার এই আসিযুদ্ধে নিজের তরোয়াল তো খাপে ভরার উপায় নেই। প্রথমে পেয়েছি। অর্জন করেছি বিষয়। এখন চলেছে ধরে রাখার সংগ্রাম। যেন না হারাই!

ঠাকুর হয়তো বলবেন, শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে। স্বাভাবিক কারণেই জনপদের চেহারা পাল্টাচ্ছে। কলকাতার ভগ্নদশা দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। জীবন যন্ত্রণা প্রখর হচ্ছে। যেখানে সমস্যা ছিল না সেখানেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সরল আর কিছুই নেই

সবই জটিল। সহানুভূতি ভালবাসা উবে গেছে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক অতিশয় তিক্ত। হানাহানি, কাটাকাটি ছাড়া মানুষ আর কিছুই ভাবতে পারছে না। মানুষ ক্রমশঃ গুটিয়ে আসছে মনে। যা তোমার মন চায় তার কিছুই তুমি পাবে না। কোথাও শান্তি নেই। সেই তো ভাল। এই তো তোমার উপযুক্ত পরিবেশ—বাইরের মোহিনীমায়ায় তুমি আর আত্মবিস্মৃত হবে না। নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না। তোমার ইচ্ছে আরও উদগ্র হবে। তুমি বাইরে থেকে সরে আসবে ভেতরে। সেখানে তুমি আমাকে দেখবে। শুনতে পাবে আমার কণ্ঠস্বর। কলকাতার উপকণ্ঠে, বনে। কলকাতার দিকে আমি হাত বাড়িয়েছিলুম কেন জান? অশান্তিতেই মানুষ শান্তি খুঁজবে, বিক্ষিপ্ততায় খুঁজবে শৃঙ্খলা, অধর্মের পটভূমিতেই ধর্ম উজ্জ্বল হয়। মহা ভাগ্য তোমার। এই শহরে মিশে আছে আমার পদরেণু। এই শহরেই ঘটেছিল উনিশ শতকের জাগরণ।

ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তো কলকাতার মানুষ?

'হ্যাঁ ঠাকুর, একেবারে খাস কলকাতার না হলেও, সংলগ্ন এলাকায় বসবাস।'

'কলকাতা তো এখন অনেক দূর ছড়িয়েছে! কিলবিল করছে মানুষ। তুমি তো তাদেরই একজন!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার সময়েই কলকাতার মানুষ খুব কথা বলত—লম্বা, চওড়া কথা। বকে বেশী। সে অভ্যাস তো যাবার নয়। বরং এখন আরও বেড়েছে।'

(অবশ্যই আমি মাথা নিচু করে থাকব।) 'বেড়েছে মানে? সাংঘাতিক বেড়েছে। আমরা যে যেখানে আছি, অন্তত বকুনির স্রোতে ভেসে চলেছি। শব্দ আর শব্দ। উত্তাল, উন্মাদ শহর। কোথাও কোন শৃঙ্খলা নেই। সবই এলোমেলো আর বিশৃঙ্খল। কোন কিছুই আর বশে নেই। লাগামছাড়া জীবনস্রোত আইন-কানন, সংঘ-সংগঠন সব ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।'

'তোমার জীবনে তো তাহলে কোনও নির্জনতা নেই বাপু! নিভৃতে, একান্তে নিজেকে নিয়ে বসতে পারো কি?'

'আজ্ঞে না। কোনও উপায় নেই। আমরা এখন বাস করি পায়রার খোপে। কলকাতার জীবনকে আমরা এখন পোস্টাপিসের চিঠির খোপের মতো রেখেছি। ঠাকুর আপনি কতবার কত ভক্তের গৃহে পদার্পণ করে তাঁদের ধন্য করেছেন। মহামান্য কেশব সেন, বলরাম বসু, কাপ্তেন। আপনি ঝামাপুকুর রাজবাড়িতে কলকাতার জীবন শুরু করেছিলেন। আপনার সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর, রানী রাসমণির কালীবাড়িতে। শ্যামপুকুরে যে অন্ত্যলীলার শুরু কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তার পরিসমাপ্তি। সঙ্কীর্ণ পরিবেশ আপনি পছন্দ করতেন না! তেলচিটে সংসার আপনি ঘৃণা করতেন। সংসার আর সংসারীকে আপনি ঘৃণা করতেন না। ঘৃণা করতেন দুখচেটে সংসারীকে। আপনি বলতেন সংসার হবে শিবের সংসার। আমাদের পায়রার খোপে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানবার সাহস আমার নেই। অতিশয় অপবিত্র! আদর্শভ্রষ্ট। নিষ্ঠাশূন্য জীবনযাপন মাত্র। কোথায় চলেছি আমরা জানি : কিন্তু ফেরাতে পারি না কিছুতেই নিজেকে। এই খোপই শুধু সঙ্কীর্ণ

নয়, আমাদের মন ও মানসিকতাও ততোধিক সঙ্কীর্ণ। নিভৃত, নির্জন পরিবেশ কোথায়
স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের চাপাচাপি। আরাধ্য একটাই—অর্থ। সাধ
হলো নিদ্রা। ভগবান একটু ঘুম দাও।'

'আমি যে বলেছিলুম, সংসার থেকে মাঝে মাঝে একটু দূরে চলে যাবে। মাঝে মা
সংসার ছেড়ে দেবে। ধর, তোমরা ময়দানে চলে গেলে। কোনও পার্কে গিয়ে, একপা
একটা গাছতলায় নীরবে বসে রইলে কিছু সময়। নিজের ভাবে রইলে কিছুক্ষণ তন
হয়ে। এক সময় ফিরে এলে আবার তোমার সেই সংসারে।'

'ঠাকুর সেই কলকাতা আর নেই। যে কলকাতায় আপনি ফিটনে চেপে আসতে
চিৎপুর রোড ধরে যাবার সময় আপনি শিশুর আনন্দে বলতেন—চালাও, চালাও জো
চালাও, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। আপনার দুপাশ দিয়ে খেলে চলে যেন উনবি
শতকের আলোকিত জনপদের ছবি। আপনি দেখতেন কলকাতার টেরিকাটা যুবকে
জটলা। বন্ধু-বান্ধবদের নাম ধরে ডাকছে। দেখতেন সাজানো দোকানপাট। বেনিয়া
মুৎসুদ্দিরা হাঁটছেন ইঙ্গবঙ্গ পোশাকে। কারোর মাথায় গোলদার ছাতি। ময়দানে দেখ
গেছেন বেলুন ওড়া। সেখানে দেখেছেন সাহেবদের ফুট-ফুটে ছেলে। দেখে কৃষ্ণভা
উদ্দীপন হয়েছে আপনার! আপনি থিয়েটার পাড়ায় গিয়েছেন। থিয়েটার দেখে
অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশে। সে-কলকাতা যে আর নেই! পার্ক ও ময়দানের পরি
ভীতিপ্রদ। ভাগীরথীর তটভূমি ব্যবসায়ীদের দখলে। পারিবারিক পরিবেশ বিক্ষি
ততোধিক বিক্ষিপ্ত সমাজিক পরিবেশ। সর্বত্রই কোলাহল। হানাহানি, হামলা।'

'তাহলে কি হবে। আদর্শ পরিবেশ যখন নেই, আদর্শ মানুষও তাহলে হবে ন
তাহলে একটা গল্প শোন—একজন ধ্যানে বসেছে পঞ্চবটীতে। কিছুক্ষণ চেষ্টা-চরিত্রের
হতাশ হয়ে উঠে এল। কি হলো, না ধ্যান হলো না। ধ্যান করাই গেল না। মন চ
হয় যাচ্ছে কাকের ডাকে। এমন কোন দেশ আছে যে-দেশে কাক ডাকে না। সেই দে
গিয়ে ধ্যান জমাতে হবে!'

'বুঝেছি যা বলতে চাইছেন আপনি। স্বামীজীর ধ্যান চাই। পিঠে কম্বল। না ক
নয়, মশা। তবু ধ্যান ভাঙেনি তাঁর।'

'কলকাতার কর্মজীবী তুমি। উদয়াস্ত তোমাকে জীবন আর জীবিকার লড়াইয়ে ক্ষ
বিক্ষত হতে হবে। তুমি যদি আমাতে সমর্পিত হতে চাও, তাহলে নিজের অন্তরে খুঁ
নাও অদ্ভুত সেই নির্জনতা।'

'সেই নির্জনতার নাম রাখব রামকৃষ্ণলোক। যে-লোকেই থাকি না কেন,
রামকৃষ্ণলোক আমার হৃদয়াসীন। আর প্রভু আমার, সখা আমার, প্রিয় আ
শ্রীরামকৃষ্ণ।'

আপনি আর আমি

ঠাকুর ! যত আমাকে কষ্ট দেবেন ততই আমার সুখ ; কারণ ততই আমি আপনাকে ডাকব, ত্রাহি ত্রাহি। ভোগ আমার 'আমি' রোগ বাড়িয়ে তুলবে। আমার হাম্বা হাম্বা রবে সবাই অতিষ্ঠ হবে। ঘোর তামসিকতায় আমি আকণ্ঠ নিমজ্জিত হব। বিস্মৃত হব আপনাকে। মাঝে মাঝে আমার ভয় আসবে, এই বুঝি আমার ভোগের কাঠামো ভেঙে পড়ল। তাগা, তাবিজ পরব, মন্দিরে গিয়ে পুজো চড়াবো, সকাম প্রার্থনা—আমাকে আরো দাও আরো দাও। আমি হিসেবী হব, কৃপণ হব, নীচ হব, স্বার্থপর হব। মানুষকে ঘৃণা করতে শিখব। ঘৃণার বিনিময়ে আমি ঘৃণাই পাবো। একদল স্বার্থান্বেষী স্তাবক আমাকে ঘিরে থাকবে। আমি তোষামোদি প্রিয় হব। অহংকারে লঘু-গুরু জ্ঞান হারাব। ক্রমশই আমি আপনার সান্নিধ্যে থেকে দূরে, আরো দূরে সরে যাবো। জীবনের প্রহরে প্রহরে নিঃসঙ্গ শৃগালের মতো চিৎকার করব হুক্কা হুয়া কেয়া হুয়া। আপনি হাসতে হাসতে বলবেন, কুছ নেহি হুয়া বেটা, ভবরোগের শিকার হয়েছ। সত্ত্বগুণ হারিয়েছ। তোমাকে তমো-শৃগালে ধরেছে। তুমি পালে ঢুকেছ। প্রহরে প্রহরে চিৎকার করতে করতে একদিন দেখবে জীবন ভোর হয়ে গেছে। তখন আর তুমি নেই। পড়ে আছে তোমার শেষ মুহূর্তের আক্ষেপ। মায়ামৃগের পেছনে ছুটেছি। ধরতে পারিনি। ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলে গেছি জন্মচক্রে। আবার ফিরতে হবে, কোথায় কোনখানে, কি অবস্থায় তা তো জানি না। অতৃপ্তি নিয়ে গেছি, ফিরতে হবে অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে।

আপনি আমাকে যত রিক্ত করবেন, ততই আমি আপনার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর শুনতে পাব। শুনতে পাব করুণামাখা কণ্ঠে আপনি আমাকে বলছে, 'ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে, তার ঝাল লাগবে না ? সেজোবাবু (মথুরনাথ) বয়সকালে অনেকরকম করেছিল, তাই মৃত্যুর সময় নানারকম অসুখ হল। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। কালীবাড়িতে ভোগ রাঁধবার অনেক সুঁদরী কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা বেশ জ্বলে যায় তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা পোড়া শেষ হলে যত জল পেছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে উনুন নিভিয়ে দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ এ-সব থেকে সাবধান হতে হয়। দেখ না, হনুমান ক্রোধ করে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়ল অশোকবনে সীতা আছেন,

তখন ছটফট করতে লাগল, পাছে সীতার কিছু হয়।'

আমি অমনি সচেতন হব। প্রথম বয়সের অনাচার ডেকে আনবে শেষজীবনের যন্ত্রণাদায়ক যতেক ব্যাধি। কাম, ক্রোধ, লোভ যৌবনকে যেন সিক্ত কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত না করে। তখন আমি ফুরফুর করে জ্বলবো ঠিকই, আর শেষ জীবনে দেখব, নিবু নিবু উনুনের চোখ জ্বালানো ধোঁয়া। যত বিত্ত, যত প্রতিপত্তি, ততই কাম, ক্রোধ, লোভের বাড়াবাড়ি। তার চেয়ে বিত্ত যাক, সত্ত্ব থাক। আমার সদসৎ বিচার থাক। সৎ—নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎপথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতি পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙশ মারে। সেই মাহুতরূপী বিচার যেন সদা জাগ্রত থাকে। ভোগে থাকলে বিচার শুয়ে পড়ে।

ঠাকুর। আমি কাঁদতে চাই। কেন জানেন? আপনি বলেছেন,—'তাঁর কাছে কাঁদতে হয়।' দেহ, পরিবেশ, পরিস্থিতি যত আমাকে চাবকাবে আমি তখন সেই সীমাহীন শূন্যতায় কেবলই কাঁদব। নিত্যকে ধরার জন্যে আকুলি-বিকুলি করব। তখন আমার জীবনে হয়তো ফলতে পারে আপনার কথা—'তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনের ময়লাগুলো ধুয়ে গেলে তাঁর দর্শন হয়। মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার ছুঁচ—ঈশ্বর চুম্বক পাথর। মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের সঙ্গে যোগ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে ছুঁচের মাটি ধুয়ে যায়। ছুঁচের মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি। মাটি ধুয়ে গেলে ছুঁচকে চুম্বক পাথরে টেনে লবে—অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে তবে তাঁকে লাভ হয়। জ্বর হয়েছে, দেহেতে রস অনেক রয়েছে, তাতে কুইনাইনে কি কাজ হবে।'

এই চিত্তশুদ্ধির জন্যেই আমি জ্বালা-যন্ত্রণায় থাকতে চাই। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে চাই আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই। আর তখনই আমার সেই চেতনা জাগবে—'বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-বা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ওই কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, তুমি তো চললে আমার কি করে গেলে? আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, তেল পুড়ে যাব সলতে কমিয়ে দাও। এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে!'

এই হাত-পা বাঁধা অবস্থা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই। আমি জীবমুক্তি প্রয়াসী। আমার যেন সম্যক সেই বোধ হয়—'জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে।' নিষ্কৃতির পথ? আপনিই তো বলে দিয়েছেন তবে যে কটি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। তাঁকে ডাক তাঁর নাম কর তবে মুক্তি। তা না হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।' আপনি আমার সেই খুঁটি মনের সেই অবস্থায় পৌঁছতে চাই, যে অবস্থায় মন মুক্তির অনুগামী হবে। সেটা কি? সেও ত আপনি বলেছেন, 'ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে, এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে।' সে বৈরাগ্য কেমন? 'তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক, এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যা

ব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না।'

সে সংসারকে কি দেখে ঠাকুর ?

'সংসারকে পাতকুয়া দেখে ; তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল-'প দেখে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয় ; আর পালায়ও। বাড়ির বন্দোবস্ত রি, তারপর ঈশ্বরচিন্তা করব—এ কথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোখ।'

সংসার যদি আদর-আপ্যায়ন করে আচারের মতো করে রাখে তাহলেই তো আমার র্বনাশ। সংসার আমাকে যত ভাবে পারে চাব্‌কাক। উঠতে কোস্তা, বসতে কোস্তা। ামার সব মোহ ঘুচে যাক। তীব্র ব্যাকুলতায় আমি যেন ছটফট করি। কি রকম ? র্ম গেলে কেরানির যেমন ব্যাকুলতা হয়। সে যেমন রোজ অফিসে অফিসে ঘোরে, ার জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁগা কোনও কর্মখালি হয়েছে ? ব্যাকুলতা হলে ছটফট করে—কিসে শ্বরকে পাব।'

'গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোনো ভাবনা াই—এরূপ অবস্থা হলে ঈশ্বরলাভ হয় না।'

ঠাকুর আপনি আমার সুখের কেল্লা ভেঙে চুরমার করে দিন। আপনার হাত ধরে াড়িয়ে পড়ি। ধন নয়, জন নয়, শুধু আপনি আর আমি। নির্জন, নিঃসীম প্রান্তরে ই পথিক।

প্রণাম

ঠাকুর, আমি আপনার নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করি। ভীরু দুর্বল, অক্ষম, অপদা
বলে নয়। গৃহ ছেড়ে সন্ন্যাসী হব বলেও নয়। মানুষ হব বলে আমি আপনার শরণার্থী
গৃহে থেকেও আমি আপনার অনুগামী, আর সেইটাই আমার গর্ব। এত বিক্ষিপ্তত
এত চঞ্চলতা, এত প্রলোভন, কিন্তু সেই আপনারই নির্দেশ—'দেখিস, নিক্তির নিচের কাঁ
আর ওপরের কাঁটা, কাঁটায় কাঁটায় যেন এক হয়ে থাকে।' ওপরের কাঁটা হলেন আপ
আর নিচের কাঁটা হলো আমার মন। অনুক্ষণ রামকৃষ্ণলগ্ন। তার অর্থ ? রামকৃষ্ণ
শুধু একটা নাম নয়—বেঁচে থাকার বিজ্ঞান। ষড় রিপুকে বাগে রাখার বল্গা। আর যে
বলেছি, আপনি আমার অহংকার, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে—বাপটা বেটা সিপাহীকা ঘোড়
কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া। আপনি যার পিতা, তার কি বেচাল সাজে। ঠাকুর, চী
দেশে অনুপম একটা কথা আছে—ছেলে তার পিতাকে কতটা শ্রদ্ধা করে তা বোঝা যা
পিতার দেহাবসানের পরে। কিভাবে ? সন্তান তার পিতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পাল
করছে কিনা। পিতার আদর্শে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কিনা। পিতার জীবনধারা সে বজা
রাখতে পেরেছে কিনা ! যদি পেরে থাকে তবেই সে সুসন্তান। নয় তো সে ভ্রষ্ট। য
সে ছবিতে মালা ঝোলাক আর জন্মদিন, মৃত্যুদিন পালন করুক। কিছুই কিছু নয়

ঠাকুর আমি আপনার প্রকৃত অনুগামী হতে চাই। ভড়ং দেখিয়ে নয়। কাজে, স্বভা
আমার আচরণে। লজ্জাই হলো আমার দর্পণ ! যেমন ? লজ্জা দর্পণ হয় কি করে
যদি কেউ বলে—আরে ছি ছি—এই নাকি রামকৃষ্ণ-সন্তান ? এই তার কাজ, এই ত
কথা ! লজ্জা। সেই দর্পণে আমার মলিন, ভণ্ডমুখের প্রতিফলন। আমার আচর
আপনি যেন অপমানিত না হন। আপনি বলতেন—সাধু সাবধান। আমি নিজে
বলি—রামকৃষ্ণ সন্তান অতিশয় সাবধান। লজ্জা পেতে পেতে লজ্জা আর লজ্জা থা
না, হয় অঙ্গভূষণ। অপমানিত হতে হতে অপমান আর অপমান থাকে না, হয় গলা
পদক। লজ্জার দর্পণটি ভেঙে যায়। কথায় আছে এককান কাটা গ্রামের বাইরে দি
যায়, দুকান-কাটা যায় ভেতর দিয়ে। তার তো আর কোনও লজ্জা থাকে না তখন

আমি আপনার সম্মান বাড়াতে পারব না, অপমানের কারণ হব—এই আমার ভয়
এই ভয়ই আমার ব্রেক। যদি কেউ বলেন, আরে মুছে ফেল না তোমার পরিচয়। খু

ফেলে দাও তোমার অনুগামীর পোশাক। অনুসরণের পথ ছেড়ে বিস্মরণের দিকে যাও না। সে উপায় যে নেই। যে জানে সে জানে।

ঠাকুর একদিন সকালে ঝাউতলার দিক থেকে গাড়ু হাতে ফিরছেন। অদ্ভুত একটা শব্দ কানে এল তাঁর। উঁকি মেরে দেখলেন। দেখেন কি, একটা ঢোঁড়া সাপ একটা কোলা ব্যাঙ ধরেছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই এই অবস্থা। গিলতেও পারছে না, ওগরাতেও পারছে না। জাতসাপে ধরলে এই অবস্থা হতে না।' ঠাকুর যে আমার সেই জাতসাপ। অ্যায়সা ধরা ধরেছেন যে একেবারে নীল বিষে জর্জর। এই যখন আমার অবস্থা তখন ফেরার আর পথ কোথায়। এই জীবনটা আমাকে তাঁর হাত ধরেই কাটাতে হবে।

কোন হাত ? অপবিত্র হাত হলে তে চলবে না। পবিত্র হাত হওয়া চাই। সাবধান দিলেই তো হল না। সাফা হলো বটে। পবিত্র হতে হলে, সৎকর্ম আর সৎচিন্তার সাবান ঘষতে হবে। সৎকর্ম কি। দান-ধ্যান, গঙ্গাস্নান, তিলকসেবা, ঘণ্টা নাড়া, স্তোত্রপাঠ, নিরামিষ ভক্ষণ, তীর্থভ্রমণ ? না। ঠাকুর এক চড় মেরে বললেন—'ওসব নয়, নয়, নয়। নিজেকে ঠকিও না। তোমার ধারণা হবে—খুব হচ্ছে, খুব বুঝি এগুচ্ছি ! আসলে হচ্ছে না কিছুই। ও তোমার নিত্যকৃত্যের তালিকায় ঢুকে ভক্তিহীন, মনঃসংযোগহীন, যান্ত্রিক অভ্যাসের মতো হয়ে যাবে। কি রকম জানো ? আমার সেই লাগ ভেলকি গল্পটা তোমাকে বলেছিলুম, মনে আছে ?'

আছে ঠাকুর। লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি করছিল এক মাদারিঅলা, হঠাৎ জিভ উলটে সমাধি লেগে গেল। যেই তার সমাধি ছুটে গেল, অমনি আবার সে, লাগ ভেলকি শুরু করে দিল। এর অর্থ কি ঠাকুর ? এই প্রসঙ্গে এল কেন ?

তুমি ভাব, ভেবে বল।

তাহলে কি এইরকম ? প্রবল নামসংকীর্তন করছি, কি তারস্বরে বিশুদ্ধ সংস্কৃত স্তোত্র আওড়াচ্ছি, ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে প্রবল আরতি করছি। হঠাৎ একদিন ঘোর লেগে গেল। কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলুম। তার অর্থ এই নয় যে, আমার সিদ্ধিলাভ হয়ে গেল।

"ঠিক। ওটা সিদ্ধি নয়, ঘোর। নিতাই আমার মাতা হাতি' বলে ধেই ধেই নাচতে নাচতে শেষে আর বলতে পারি না, বলি, মা হা। ঘোর লেগেছে। সেকরার ধরো সমাধি হলো। সমাধি যেই ভাঙল, সে অমনি আবার হাতুড়ি ঠুকতে শুরু করল। একটু-আধটু সোনাও সরাতে লাগল। সেই তার আগের স্বভাব। স্বভাব বদলাচ্ছে কিনা দেখতে হবে। কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য কমছে কিনা। বাজে কথা শুনতেও ভাল লাগে না, কইতেও ভাল লাগে না। কেবল তাঁর কথাই শুনতে ভাল লাগে। দিবারাত্র তাঁর প্রসঙ্গেই রুচি অন্য প্রসঙ্গে অরুচি। তোমার হচ্ছে কিনা বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায়, তাঁকে মনে পড়ামাত্রই তোমার চোখে জল আসবে। ইষ্ট তোমাকে দর্শন দেবেন। দর্পণটি পরিষ্কার রাখ, দর্শন যদি পেতে চাও। সৎচিন্তা আর সৎপ্রসঙ্গ, অনুক্ষণ তাঁতে মগ্ন থাকা।" কিন্তু কর্ম তো থাকবেই। গৃহী যখন, তখন বিষয়কর্ম তো থাকবেই। কর্তব্য কর্ম। আমার ঠাকুর বলছেন, অবশ্যই থাকবে। স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে তোমাকে করতেই হবে।

সৎপথে জীবিকার্জন। কারোর কাছে হাত পাতবে না। আর দুখচেটে সংসারী হবে না সন্ধ্যায় সব ঘর যেন আলোকিত হয়। সিঁড়িতে প্রবেশদ্বারে অবশ্যই যেন আলো থাকে। ঠাকুর কেশব সেনের বাড়িতে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলছেন—এইসব জায়গায় আলো দেবে, আলো দিতে হয়। নিজের মনে বলেছিলেন, তদগত ভাবে। সামান্য নির্দেশ। যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ। গভীর কোনও তত্ত্বকথা নয় কিন্তু। অথচ এই একটি নির্দেশেই ঠাকুর, আমি আপনাকে আমার পরম পিতা হিসাবে ধরে ফেলেছি। গৃহীর প্রতি আপনার কি অসীম করুণা! সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে আলো দেবে। কেন? অন্ধকার, দারিদ্র্যের লক্ষণ, আলস্যের লক্ষণ, তামসিকতার লক্ষণ, উদাসীনতার লক্ষণ, অবহেলার লক্ষণ, অসচেতনতার লক্ষণ, মনের জড়তার লক্ষণ। আলো মানে আনন্দের প্রকাশ। চিদানন্দেরই প্রতিফলন। এই আলোর জন্যে গৃহী তুমি আলস্য ত্যাগ কর। দৈহিক এবং মানসিক আলস্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' ক্লীব হয়ে যেয়ো না। গৃহীর ক্লীবতা কী? বাহ্যক ও আভ্যন্তরীণ অন্ধকারে থাকা। গৃহকে আলোকিত করার জন্যে উপার্জন, হৃদয়েরগেহকে আলোকিত করার জন্যে সাধনা। অতিথি যেমন গৃহ দেখেন, ঈশ্বর তেমনি মন দেখেন। অন্ধকার গৃহে আলোকিত প্রাণী থাকতে পারে না। মন আলোকিত না হলে প্রাণী আলোকিত হতে পারে না। একটি উপদেশে আমার ঠাকুর প্রাণ আর পরিবেশের শেষ কথা বলে গেছেন। একালের হাজারটা সাইকোলজিস্টের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। আলো করে থাক। বাইরে আলো। ভেতরে আলো।

স্বামীজী ঠাকুরের এই কথাটি তাঁর নিজের মতো করে, কালোপযোগী করে বলেছিলেন, "ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির।...ধর্মকথা শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোনও ফল হবে না।"

অর্থাৎ ভাত-কাপড়ের সমস্যা মেটাও। অভাব দূর করে নিজের পরিবারে আলো আনো। দক্ষিণেশ্বরে আমার ঠাকুরের কাছে বেশ মজার এক মানুষ আসতেন। সংসারে বিষম বিতৃষ্ণা। সংসার ত্যাগই করে ফেলবেন এমন অবস্থা। তিনি ঠাকুরের ঘরে এলেন। ঠাকুরকে সবাই ঘিরে আছেন। ধর্মকথা হচ্ছে। তিনি একপাশে মাদুর পেতে ভোঁস ভোঁস করে খুব খানিক ঘুমিয়ে আবার মাদুরটি গুটিয়ে তুলে রেখে চলে যেতেন। তাঁর কাণ্ড দেখে ঠাকুর হাসতেন। অভাবীর বৈরাগ্য, অলসের বৈরাগ্য, রাজার বৈরাগ্য, লোকদেখানো বৈরাগ্য, ব্যবসায়ীর বৈরাগ্য, চোরের বৈরাগ্য, ভোগীর বৈরাগ্য, প্রকৃত বৈরাগ্য, কতরকমের বৈরাগ্য যে আছে, ঠাকুর সবই লক্ষ্য করেছিলেন। সংসার ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। বেশ কিছুদিন বেপাত্তা। বউ ছেলে মেয়ে পড়ে রইল অভাবে, অনাহারে, অসহায় অবস্থায়। মাসতিনেক যেতেই পোস্টকার্ড এল। বেনারসের ছাপ মারা—'আমার একটি কর্ম জুটিয়াছে। শীঘ্রই তোমাদের লইয়া আসিব।' মর্কট বৈরাগ্য অসহ্য ছিল আমার ঠাকুরের। অন্তর্যামী বুঝতে পারতেন। ধর্মকে যাঁরা পলায়নের পথ ভাবতেন তাঁদের ধমক

দিতেন—লজ্জা করে না, বিয়ে করেছ, ছেলেপুলেও হয়েছে, তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কে নেবে ? ভূতে ? পাড়াপড়শীরা ? আগে কর্তব্য করে এস, তারপর সব হবে।

তাহলে ঠাকুর আমার দুই হাতের পবিত্রতা আসবে কি ভাবে ?

এইভাবে, একটি হাত সৎ জীবিকায়, আর একটি হাত আমার চরণে। যেই কর্ম তোমাকে মুক্তি দেবে তখন তোমার দুহাত নিয়ে আমাকে ধরবে। সংসারের প্রতি তোমার কর্তব্য কতদিন ? না যতদিন তোমার সন্তান-সন্ততি জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ঠাকুর যে হাতটি আপনি ধরেছেন, সেই হাত বেয়ে যে ভাবতরঙ্গ আপনাতে প্রবাহিত হচ্ছে তার শুদ্ধতা, অশুদ্ধতার বিচার আপনি করবেন। আপনি বলেছিলেন—মন হলো মাছি। এই বিষ্ঠায় বসে, তো এই মধুতে। অনেক চেষ্টা করেছি আপনার নির্দেশে মনকে সেই মাছি করতে যা শুধুই ফুলে বসে। এখনও পারিনি। চেষ্টা করছি, পারছি না। কোনও আড়ম্বর রাখিনি, যেমন বলেছিলেন, মনে, বোনে, কোণে সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছি। আপনি বলেছিলেন সুতোয় সামান্য একটু ফেঁসো থাকলে ছুঁচের ফুটোয় ঢুকবে না। কামনা-বাসনার সামান্যতম ফেঁসো মনে লেগে থাকলে ঈশ্বররূপী সূচে প্রবেশ করবে না। রামকৃষ্ণ-সূচে মন প্রবিষ্ট করাতে যতটা পবিত্র হওয়া উচিত তা হয়নি। সে আমার মনমাছির অক্ষমতা। আপনার চরণ থেকে মাঝে মাঝে আমার মন টলে যায়।

স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, 'সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা।' কোন সাম্যাবস্থা, গীতায় ভগবান যেমন বলেছিলেন সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।' সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা ফিরে পেতে গেলে—'আমাদের প্রথমে তমঃকে ব্যর্থ করতে হবে রজঃ দ্বারা, পরে রজঃকে জয় করতে হবে সত্ত্ব দ্বারা। সত্ত্ব অর্থে সেই স্থির ধীরে প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শেষে অন্যান্য ভাব একেবারে চলে যাবে।' স্বামীজী আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, 'বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দাও, মুক্ত, হও, যথার্থ ঈশ্বরতনয় হও, তবেই যীশুর মতো পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে শক্তি, অনন্ত 'বীর্য' বোঝায়। দুর্বলতা-দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি মুক্তস্বভাব হও, তবে তুমি কেবল আত্মা মাত্র। যদি মুক্তস্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত।'

ঠাকুর আমার একটাই ভয়, যে হাত আপনি ধরেছেন, সেই হাত যেন অপবিত্র করে না ফেলি কর্মদোষে, কলুষিত চিন্তায়। আমার কারণে আপনি যেন ছোট না হয়ে যান। আমার এই ভয়ই আমার লাগাম। রামকৃষ্ণানুগতের বেচাল বড় দৃষ্টিগ্রাহী। যে হৃদয়গৃহে আপনি আসবেন সেখানে যেন সৎকর্ম, সদ্ভাবনার আলোটি জ্বলে। আরও কথা ছিল, আজ আর হলো না। প্রণাম॥

রামকৃষ্ণদাস

স্বামীজী বলেছিলেন : "গীতায় ভগবান যে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেন সে পূজা, জপ, ধ্যান এই সব কর্ম—অন্য কর্ম নয়।" তা আমরা যাঁরা সংসারী মানুষ, তাঁদের তো অন্য কর্ম করতেই হয়। ফাঁক-ফোকরে না হয় একটু জপ-ধ্যান হলো। সেও অবশ্য ছটফটে, চলচঞ্চল মন নিয়ে। তখন নিজের মধ্যেই একটা অপরাধবোধ জাগে—কেন মনকে বসাতে পারছি না ! দুধ ওথলানোর মতো, অবচেতন থেকে বাসনা-কামনাসমূহ ফুলে-ফুলে উঠছে। বসে আছি ঠিকই, স্থির হয়ে, চোখ বুজে। সবাই মনে করছে খুব ধ্যানে বসেছে, পরম ভক্ত। ভেতরে কিন্তু লড়াই চলেছে স্থির আর অস্থিরে। যে বসেছে সে বুঝতে পারছে সংগ্রামটা কোথায়।

আবার স্বামীজী বলেছেন : আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। না হলে হবে না। যত লোক আসক্তির বশ। শিব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা। শিব সংসারী—কিন্তু সংসারকে তিনি দাসী করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নির্লিপ্ত। ফস্ করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন।

শুনে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। আসক্তি নিয়েই তো সংসার। আর সত্যিই তো সংসারী মানুষ উঠতে বসতে স্বামী স্ত্রী সন্তান নিয়ে ব্যস্ত। মন যুগিয়ে চলার কি ঘটা। স্ত্রীকে নরম গলায় যখন স্বামী বলে, 'তুমি যা বলো সেইরকমই হবে।' কিংবা কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগে —'ওকে জিজ্ঞেস করো। ওর মত না হলে কিছুই হবার নয়।' আবার যে স্ত্রীর বশ নয়, সে হয়তো স্ত্রীকে উত্তম-মধ্যম না দিয়ে জলস্পর্শ করে না। তার মানে এই নয় সে মহাধার্মিক। সে হলো নর-পশু। তাহলে সংসারী জীব এখন করে কি ? হাজার হাজার জীবন ভেস্তে যাবে। কবে আমি ভালো সংস্কার নিয়ে আসব, এসেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হব, তবেই আমি অধিকারী হব তাঁর পথে এগোবার। তাও পথের শেষ দেখতে পাব কিনা জানি না।

কারণ স্বামীজী বলেছেন, "আরেক শক্তিতে আমায় করাচ্ছে। এই নানা কাজ চিন্তা পর্যন্ত তিনি করাচ্ছেন। ঠাকুর বলতেন, যতক্ষণ আমি ধ্যান করছি এই বোধ, ততক্ষণও আদ্যাশক্তির এলাকা। শক্তি মানতেই হবে। সোহহং বললে যে-আমি বোঝায়, সে-আমি, এ-আমি নয়। মন দেহ, এসব বাদ দিলে যা থাকে সেই আমি।"

এই উক্তির পর আমার অবস্থা আরও অসহায় হলো। মন দেহ বাদ দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আদ্যাশক্তির সমস্ত ইচ্ছা ফলবতী হচ্ছে আমার জীবনে। ঠাকুরের উপমায় আমি এক বেড়ালছানা। তিনি ঘাড় কামড়ে যখন আমাকে আঁস্তাকুড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলছেন, তখন আমি সেখানে, যখন নরম বিছানায় তুলছেন তখন আমি আরামে। তাহলে, আমার ইচ্ছার জোর কতটুকু।

স্বামীজীকে আমার অসহায় প্রশ্ন . "তাহলে আমার কি হবে।"

আমি জানি কি বলবেন স্বামীজী। প্রথমেই বলবেন--কৃপা। তাঁর কৃপা। ঠাকুর চলে গেছেন। বরানগরের মঠে স্বামীজী, সঙ্গে ঠাকুরের সন্তানগণ। জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন : "আচ্ছা মশায় সাধান করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে ?" স্বামীজী বললেন, "তাঁর কৃপা না হলে সাধন-ভজনে কিছু হয় না। তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়।" পরে আর একদিন তাঁর ভাইদের বলছেন : "পড়ে থাক, তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক।" বলেই আবিষ্ট হয়ে গান ধরলেন—"প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা। তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা। দো রোটি এক লেঙ্গটি তেরে পাস ম্যায় পায়া।"

স্বামীজী শ্রীমকে একটি পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন : "অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মানি, দুঃখকষ্ট না পেলে Resignation হয় না—Absolute dependence on God." দুঃখ আর কষ্ট মানুষকে তাঁর দিকে এগিয়ে দেয়। দুঃখ আর কষ্ট হলো তাঁর আশীর্বাদ। সংসার পাটাতনে আমরা এক-একটি জংধরা স্ক্রু। সেই স্ক্রু খুলতে হলে, প্রথমে এদিকে, ওদিকে হাতুড়ি মারতে হয়। মেরে মেরে জং ঝরিয়ে, তারপর স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ঘোরালে তবেই খুলবে। দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, অপমান-বঞ্চনা হলো সেই হাতুড়ির ঘা। আর গুরু হলেন সেই স্ক্রু-ড্রাইভার। ঠাকুর বলতেন, ব্যাকুলতা চাই। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে ঈশ্বর দেখা দেবেন। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

তবু স্বামীজীর মতো কৃপাধন্য একদিন মহা আক্ষেপে মাস্টারমশাইকে বলছেন : "ভগবান নেই বোধ হচ্ছে। যত প্রার্থনা করছি, একবারও জবাব পাইনি। কত দেখলুম মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। কত কালীরূপ ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম। তবু শান্তি হচ্ছে না।" এই 'হা ঈশ্বর' অবস্থাই সাধকের প্রকৃত অবস্থা। শ্রীচৈতন্যের হয়েছিল। ঠাকুরের হয়েছিল। স্বামীজী ও তাঁর সন্ন্যাসী ভায়েদের হয়েছিল। রাখাল মহারাজ বলছেন : "এখানে থেকে তো কিছু হলো না। তিনি যা বলেছিলেন, ভগবানদর্শন, কৈ হলো ! চলো নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।" স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বলছেন : "বেরিয়ে কি হবে ? জ্ঞানে কি হয় ? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস !" একজন ভক্ত বলছেন : "তাহলে সংসার ত্যাগ করলে কেন ?" স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে বলছেন, "রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকব !"....

স্বামীজীর কাছে উত্তর পেয়ে গেছি—সেই মূর্ত মহেশ্বরের কাছে। একটু তেজ চাই। একটা গোঁ। "যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও —দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর ; বলি প্রথমে

আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out.—বলে আমি সব করতে পারি। নেই নেই বললে, সাপের বিষ নেই হয়ে যায়। খবরদার No 'নেই নেই'; বল, 'হাঁ হাঁ', 'সোঽহং সোঽহম্।'

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ ॥...

ভয় কি? কূর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।" (আমরা তারকা চর্বণ করব, ত্রিভুবন বলপূর্বক উৎপাটন করব, আমাদের কি জান না! আমরা রামকৃষ্ণদাস।)

স্বামীজীর ধর্ম

ভগবান মানি না। বেশ মানতে হবে না। ধর্ম পুরোহিতদের ব্যবসা। বেশ, তাহলে অধার্মিক হয়ে যাও। তারপর ? মানুষ থাকবে তো ? না সব অমানুষ হয়ে যাবে। স্বামীজী এই আশঙ্কাই করেছিলেন। তিনি যখন আমাদের ফেলে চলে গেলেন, তখন আমাদের একটা জাগরণের কাল চলেছে। মহা, মহাপুরুষরা একাধিক ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনের আলো ফেলেছেন। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের বৃত্তে চলে আসছেন যুবকরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে। স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আদর্শবাদীরা। সে-ও আর এক সন্ন্যাস। বিদায়ের আগে স্বামীজী সচেতন করে দিয়ে গেলেন, জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়, পাবে এক মহাসত্য—আমাদের জাতির শক্তির বলেই একটি জাতি ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। জাতি মানে মানব-গোষ্ঠী। যে জাতির বেশির ভাগ মানুষই দেহবাদী, ইন্দ্রিয়পর, ভোগ ছাড়া যারা আর কিছু চায় না, কর্কশ, নিষ্ঠুর দানবভাবাপন্ন সেই জাতি ইতিহাসে অল্প সময়ের জন্য প্রভুত্ব করে চিরবিলীন হয়ে যায় মহাকালে। কিন্তু যে-জাতিতে সেই মানুষের সংখ্যা বেশি, যাঁরা বুঝতে শিখেছেন আনন্দ দেহে নেই, ইন্দ্রিয়-সুখে নেই, জৈবতায় নেই, যাঁরা দেহসীমা উত্তীর্ণ হয়ে ভূমার শক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যাঁদের চেতনায় বারে বারে উঁকি মেরে যায় চিন্তা, বস্তুজগতের উর্ধ্বে আরোহণ করতে না পারলে জীবন কেবল আসা আর যাওয়া, জীবন কেবল আহার, নিদ্রা আর মৈথুন ; হয়তো তাঁরা সিদ্ধপুরুষ বলতে যা বোঝায় তা হতে পারেননি, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীও হলেন না ; কিন্তু সচেতন এই মানব-গোষ্ঠীর চিন্তার আলোকে সমগ্র চেহারা খুলে গেল। শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, শিল্পে-সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, প্রগতি নতুন একটি ধারা খুঁজে পেল। স্বামীজীর এই কথায় কোথাও কিন্তু ভগবান নেই। পুরোহিত নেই। ধর্ম নেই। ভগবান ভরসা বলে বসে থাকার তামসিক ইঙ্গিত নেই। আছে উপলব্ধির কথা। ভোগের দুর্ভোগ থেকে সরে আসার কথা। মানুষের যদি বিচার-বুদ্ধি না থাকে তাহলে অবিচার বেড়ে যায়, তখন আর প্রগতি নয় অধোগতি। যে-জাতিতে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কমতে থাকে সে-জাতি ক্ষয়িষ্ণু। পতন তার আসন্ন। অনন্তের চেতনা না থাকলে বড় কিছু করা যায় না। সভ্যতার নামে একটা অসভ্য তালগোলের জন্ম হয়।

স্বামীজী নিজে ছিলেন বহুমাত্রিক এক ব্যক্তিত্ব, যে-কারণে কখনও তাঁকে 'নাস্তিক' বলেও মনে হয়। তাঁর কোনওরকম কুসংস্কার ছিল না। তিনি ছিলেন উদার মানবতাবাদী। জাতপাতের কোনও বিচার কোনও কালে ছিল না। শিবজ্ঞানে জীবসেবা—এই ছিল তাঁর সার কথা। স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা ছিল বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত। বেরিয়ে পড়। নিজেকে অতিক্রম করে এগিয়ে চল। ইন্দ্রিয়ের হাত না ধরে ধর অমিত অমৃতশক্তির হাত। সে-শক্তি বজ্রে নেই, বিদ্যুতে নেই, নেই সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, নেই সঙ্ঘ-জীবনে। সেই শক্তি আছে নিজের ভেতরে। নিজেকে ধরতে পারলেই ধরা যায় শক্তিকে। নিজেকে ধরা মানে, নিজেকে আদর্শ করে করে তোলা। ঈশ্বরোপম, দেবোপম।

এই কথা বলার সঙ্গেই স্বামীজী আমাদের নিয়ে গেছেন ঈশ্বরের উৎস সন্ধানে। ঈশ্বর আর এক অর্থে ধর্ম। ধর্মের উৎস অনুসন্ধানে। ইতিহাস আমাদের সামনে দুটি ধারা তুলে ধরেছে। একটি হলো আত্মার মতবাদ। প্রাথমিক স্তরে আত্মা মানে গীতার আত্মা ছিল না। এক থেকে বহু—বেদান্তের এই দর্শনও নয়। আত্মা মানে স্পিরিট। মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন, মানুষের ভেতরে আর একটা মানুষ বসে আছে। দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের মানুষটি বেরিয়ে আসে। প্রথমটি মৃত হলেও দ্বিতীয়টি জীবিত। মৃতদেহটি যতদিন সংরক্ষিত রাখা যাবে, দ্বিতীয় অদৃশ্য মানবটি ততদিনই জীবিত থাকবে। মিশরীয়রা এই বিশ্বাসেই দেহটিকে মমি করে বিশাল বিশাল পিরামিডের তলায় সমাহিত রাখতেন। সংরক্ষিত মৃতদেহের ক্ষতি হওয়া মানে দ্বিতীয় মানবটির আহত হওয়া। এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ব্যাবিলোনিওরাও। তাঁদের বিশ্বাসে সামান্য একটু ভিন্নতা ছিল। তাঁরা মনে করতেন, দেহমুক্ত এই দ্বিতীয় সত্তাটির মধ্যে কোনও প্রেম-ভালবাসার অস্তিত্ব থাকত না। জীবিতদের ভয় দেখিয়ে দাবি করত, আমাকে খাদ্য দাও, পানীয় দাও, আমাকে সর্বব্যাপারে সাহায্য কর। নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের প্রতিও তার আর কোনও মমতাবোধ থাকত না। এই বিশ্বাস থেকেই এল উপাসনা। পূর্বপুরুষের উপাসনা। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ছিল। এখনও আছে। হিন্দুরা এই দ্বিতীয়টিকে বলবেন প্রেত। প্রেত-শান্তির প্রথাও প্রচলিত আছে। প্রেতোদ্ধারে গয়ায় পিণ্ডদান। চৈনিকদের মধ্যে এখনও পূর্ব-পুরুষের উপাসনাই হলো ধর্ম।

ধর্মের দ্বিতীয় ধারাটি হলো প্রকৃতির উপাসনা। সন্ধ্যা নামে সূর্যাস্তে, নীলাকাশে ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ, ধেয়ে আসে দুর্জয়-ঝটিকা, প্রকৃতির কখনও সংহার মূর্তি, কখনও মধুর প্রকাশ ; মানুষের মনে হলো এর পেছনের রহস্যটা কী। কোন মহাশক্তির খেলা। কে নাড়ায় এই কলকাঠি। বিজ্ঞান তখনও আসেনি। ঋষির কল্পনা ছুঁতে চাইল অনন্তকে। প্রকৃতির এক এক রূপ থেকে জন্ম নিলো এক এক দেবতা এক এক দেবী। কেউ ভীষণ ভীষণা, কেউ মধুর মাধুরী। গ্রীকদের সমস্ত দেবদেবীই প্রকৃতির বিমূর্ত রূপ। হিন্দুর বেদ প্রকৃতির উপাসনা।

দুটি বিপরীত ধারাকে সমন্বয় করে স্বামীজী এনেছেন তৃতীয় একটি ধারা। আর স্বামীজী সেইটিকেই বলেছেন ধর্মের প্রকৃত অঙ্কুর। নিজের জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করে বিজ্ঞানে পৌঁছোবার সংগ্রামই হলো ধর্ম। কোথাও মানুষ জানতে চাইছে পূর্বপুরুষের আত্মার

অবস্থান, দেহাবসানের পর মানুষের পরম গতি কী, কোথায় পরলোক। কোথাও মানুষ বুঝতে চাইছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতির পেছনে কোন্ পরমাপ্রকৃতি, দিনরাত্রির খেলা খেলছেন মেঘ-রৌদ্রের খেলা। আনমনে কোন্ বিশ্বশক্তি মহাসিন্ধুকে নিয়ে খেলছেন। গ্রহ-তারকাকে ঘোরাচ্ছেন।

এরপর স্বামীজী বলছেন, স্বপ্নাবস্থাতেই মানুষ ধর্মের প্রথম সন্ধানটি পেয়েছিল। অমরত্বের ধারণাও এসেছিল স্বপ্ন থেকে। নিদ্রায় দেহের সাময়িক মৃত্যু। কোথায় কিভাবে পড়ে আছি কোনও জ্ঞানই নেই। সেই অবস্থায় মন চলে গেছে স্বপ্নলোকে। জাগ্রত অবস্থায় যার কোনও অস্তিত্ব ছিল না, নিদ্রিত অবস্থায় তা বাস্তব, আবার জাগরণে অন্তর্হিত। তখনই মানুষের মনে হলো মৃত্যুতেই মানুষের শেষ নয়। চিরলয়ের পরেও যাবার একটা জায়গা আছে। দেহ ফেলে মন যাবে সেই পরলোকে। স্বপ্নে তারই ইঙ্গিত। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো মনকে দেহাতীতলোকে পাঠাবার সাধনা। স্বপ্নের আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আসার আগেই মানুষের এই সাধনা শুরু হয়ে গেছে। তার এই সাধনার ফলেই মানুষ আবিষ্কার করেছে, মনকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় যা জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় উর্ধ্বে। সমাধি। যাঁরা পেরেছেন তাঁরা গেছেন। ফিরে এসেছেন অসাধারণ অনুভূতি নিয়ে। খুলে গেছে আধ্যাত্মিক লোকের সিংহদুয়ার।

কেউ কেউ বলতে পারেন স্বামীজী ঈশ্বর মানতেন না ; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য ঈশ্বরীভূত পুরুষকে মানতেন। কারণ, তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে জেনেছিলেন ইন্দ্রিয়ের খাঁচাকে চুরমার করে, বিষয়ের জগতকে পায়ে দলে মনকে উচ্চলোকে পাঠাতে পারলে কোনো ভাবময় অবস্থায় লীন হওয়া যায়। স্থূল আনন্দ দেহ দিয়ে ধরতে হয়। ক্ষণস্থায়ী। পরমানন্দ মন দিয়ে স্পর্শ করতে হয়। আর সেই স্পর্শে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। সত্য হয়ে ওঠে ব্রহ্ম। যেখানে কোনও কিছুই আপেক্ষিক নয়।

এইবার স্বামীজীর স্পষ্ট কথা—কেউ খেয়ে আনন্দ পায়। আমাদের বলার কোনও অধিকার নেই, খেয়ো না। সেইরকম তাদেরও কোনও অধিকার নেই বলার . কেন তোমরা আধ্যাত্মিক চিন্তায় আনন্দ পাও। মানুষ যখন নিচের তলায় থাকে সে যে-জাতিরই হোক, তার আনন্দ হলো ইন্দ্রিয়সুখে। সেই মানুষই যখন প্রকৃত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হয়, তখন তার আনন্দ উচ্চচিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে। আর আধ্যাত্মিকতা ! সে অনেক উচ্চস্তরে। আর সিদ্ধি। ঠাকুর বলতেন—কোটিকে গুটিক।

প্রতিধ্বনি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুরকমের বাতাসের কথা বারে বারে, নানা কথার ছলে ভক্তদের বলতেন। কু-বাতাস আর সু-বাতাস। প্রায়ই গাইতেন—'কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি।'

পৃথিবীর এই হলো নিয়ম, এই হলো ধরম। জীবনের ওপর দুটো প্রভাবই থাকবে। আদর্শ পৃথিবী মানুষের চিন্তায়, মানুষের কল্পনায়, মানুষের স্বপ্নে। বাস্তব অন্য জিনিস। এক জটিল জলস্রোত। ভোগের পৃথিবী, লোভের পৃথিবী, বঞ্চনার পৃথিবী, খুনীর পৃথিবী জীবনকে গ্রাস করে বসে আছে। মেটিরিয়ালিজম ধর্ম ভোলাতে চাইছে, অনবরতই কানের কাছে পশুশক্তির জয়গান গাইছে। মানুষকে বলছে—তুমি বুদ্ধিমান জন্তু। আত্মশক্তি, সেলফ-রিয়েলাইজেসানের কথা ভেবো না। ওসব আদ্দিকালের অচল লোক-ঠকানো কথা। ধর্ম ঈশ্বর এসব হলো ধনীর বিলাসিতা। গরিবের ইনটক্‌সিকেসান। মানুষকে ভুলিয়ে রাখার ছলাকলা। নয়া মতবাদ— Produce or Perish.

যন্ত্রে যন্ত্রের মতো জুড়ে যাও ! চাকা ঘোরাও। রাষ্ট্রের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দাও সম্পদে। ধনী হও, ভোগী হও। মানুষ হলে কিনা সে প্রশ্ন পরে। ঈশ্বর নয় ওয়েলথ, গড নয় ডেমন, ভজ গৌরাঙ্গ নয়, জপ কাঞ্চন। Get rich quick. বাড়ি, গাড়ি, পঞ্চ মকার আধুনিক মানুষের ভগবান।

Macbeth has murdered sleep. পশ্চিমের ধনী দেশের মানুষ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। সব পেয়েও শূন্য, নিঃসঙ্গ জীবন। দেশ আছে। দেশাত্মবোধ আছে। জাতীয় অহংকার আছে। বিশাল সম্পদ আছে। বাহুবল, অস্ত্রবল আছে। এক তুড়িতে অন্য দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা আছে। নেই পরিবার। কে কার ? পিল ছাড়া ঘুম আসে না। মন ভেঙে টুকরো টুকরো। শত বিভক্ত ব্যক্তিত্ব। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধিতে সব জেরবার।

স্বামীজী যখন বলেছিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না', তখন ভারত ছিলো পরাধীন। অতি দরিদ্র, শোষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভেদাভেদে শতচ্ছিন্ন, ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা অপহৃত। সেই ভারতে ওই উক্তির প্রয়োজন ছিল। ধার্মিকের আলস্য পরিহার করে ফকির থেকে উজির হবার প্রয়োজন ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভিখারির আবার ত্যাগ কি ?'

আগে সব পাও, তারপর মায়ামুক্ত বৈদান্তিকের উদাসীনতায় সব লাথি মেরে ফেলে দাও।

দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা স্বামীজীকে ঠিক ঠিক বুঝিনি। আজও আমাদের আত্মবিমুখতা, অধার্মিকতা, কদাচারিতাকে ওই একটি উক্তি দিয়ে সমর্থন করে চলেছি। স্বামীজীর অজস্র উক্তি থেকে একটিকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছি নিজেদের অপকর্মের আচ্ছাদনী হিসেবে। শয়তানের এই তো ধর্ম। অথচ স্বামীজী যা চেয়েছিলেন তা হলো :

"আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম—এ দেশের মতো এতো অধিক তামস প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতো জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্ম, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতোদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ (পাশ্চাত্ত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথার প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে কতো উদ্যম, কতো কর্মতৎপরতা, কতো উৎসাহ, কতো রজোগুণের বিকাশ! তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না—সর্বাঙ্গে প্যারালিসিস হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে। আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই—হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই। কি হবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়েচেড়ে ওদের ভিতর সাড়া আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কার্যে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডালব্রাহ্মণকে শুনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা —তোমরা অমিতবীর্য, অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা করো—জীবন সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত করো, তারপর পর জীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের বলো। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন —উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পারবে, তা বলে দে।"

গাঁয়ের চেহারা, জেলা শহরের চেহারা পাল্টে গেছে। এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর অর্থ এসেছে। জীবনের চটক অবশ্যই খুলেছে। অর্থনীতির দুটো দিক খুলে গেছে, কালো আর সাদা। রজোগুণের বদলে বেড়েছে তমোগুণ। মানুষ আর কিছু বুঝুক না বুঝুক রাজনীতিটা বেশ ভালোই বুঝেছে। আর সেই আগুনে বাতাস করছে নানা মতবাদ। আর সেই বাতাসটাই হলো কু-বাতাস। এ-যুগের একটিই মাত্র মন্ত্রদীক্ষা— ভায়োলেনস। একটিই মাত্র মন্ত্রদীক্ষা—করাপসান। জনে জনে শুধু বলা হচ্ছে— পশু হও। মারো, মরো, হিংসা বুঝে নাও।

They have sacrificed you to a symbol, and you carry them to power over yourself. [Wilhelm Reich]. মতবাদের হাড়িকাঠে মাথা, কথাব জাদু হলো খড়গ। সম্মোহিত হয়ে সাধারণ মানুষ যাঁদের মাথায় বসিয়েছে, তাঁরা কিন্তু পাকেপ্রকারে একটি কথাই বলেন—তুমি এবং তোমার জীবনের বাস্তবিকই কোনোও দাম নেই। তোমার

পরিবার, পরিজন, পুত্রকন্যা কিছুই না। তুমি এক মহামূর্খ, দাসমাত্র। তোমাকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়, যেমনভাবে খুশি ব্যবহার করা যায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভাঁওতা মাত্র, জাতীয় স্বাধীনতা হয় তো আছে।

This is why I am afraid of you, Little Man, deadly afraid. For on you depends the fate of humanity. [Reich]. ক্ষুদ্র মানুষ, সাধারণ মানুষ, বড়ো ভয় হয় তোমাদের জন্যে। তোমরাই যে তোমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা। তোমাদের জন্যে ভয় হয়। তোমরা কোনোও কিছু থেকে পালাও না পালাও, নিজেদের কাছ থেকে আগে পালাচ্ছো। তোমরা অসুস্থ, ভীষণ অসুস্থ। তোমাদের দোষ নেই অবশ্য। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার দায়িত্ব তোমার নিজের। যারা তোমাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তাদের তোমরা যে কোনও মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো। পারো না কেন, একটিই মাত্র কারণ, তোমরা দলিত হতে ভালোবাসো। দলনকারীকে তোমরা সমর্থন করো। No police force in the world would be powerful enough to suppress you. সামান্যতম আত্মসম্মানবোধ থাকলে কেউ তোমাদের দাবিয়ে রাখতে পারে না। সেই গভীর উপলব্ধি যদি থাকতো।—সাধারণ মানুষ ছাড়া, পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যেতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে না। Did your 'liberator' tell you that? No. He called you the 'proletarian' of the world, but he did not tell you that you, and only you are responsible for your life. [Reich]. একটি কথা, আজকের সার কথা, দূরকাল থেকে ভেসে আসা স্বামীজীর সেই নির্দেশ—শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে—'ভাই সব' ওঠো, জাগো কতোদিন আর ঘুমুবে ?' এই কণ্ঠস্বরকে সপ্তগ্রামে তুলতে হবে, ছাপিয়ে যেতে হবে তাদের যারা বলে—বন্ধুগণ, পশু হও, অধার্মিক ইতর হও।
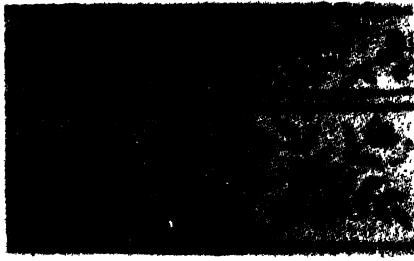
পদ্মলোচনের শাঁক

স্বামীজী একদিন শিষ্যকে বললেন, 'যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে তাই ভালো কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ববিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে ঋষিপ্রচলিত পথে চললে ওই আত্মজ্ঞান শিগ্‌গির ফুটে বেরোয়। আর যাকে শাস্ত্রকারগণ অন্যায় বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্ম-জন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না।'

এ যুগের মানুষের কাছে আবার আত্মতত্ত্ব কি ? দেহতত্ত্বই সারকথা। প্রথমে লুটবো তারপর ভোগ করব। আমি আর আমার ভোগ। এর বাইরে আর কিছু নেই। সমাজের চেহারাও ঠিক সেইরকম দাঁড়িয়েছে। সভ্যতা বাইরে মুখোশ মাত্র। ভেতরে পাশবিকতা। মানুষের অত্যাচারে মানুষই অতিষ্ঠ। অথচ ঋষিরা বলে গেছেন, সারা ভারতবর্ষ এক সাধনপীঠ। অসাধারণ লক্ষণসমূহ প্রস্ফুটিত হয়ে আছে দিকে দিকে। ভারত হলো বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ।

আমাদের অবহেলায়, আমাদের উদাসীনতায় আমরা সব হারাতে বসেছি। আত্মবিস্মৃতির শিকার হয়েছি। এখন মানুষের হাতে মানুষ শিকার হচ্ছে। বাঘ ভাল্লুকে আর কটা মানুষ মারে। মানুষ মরছে মানুষের হাতে। এ কালের মানুষ যেন ছাগল। মারো আর যে কোনও ছুতোয় কাটো। এখন এই আমাদের বীরত্ব।

অবাক হতে হয়, এই হলো বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের দেশের হাল। সভ্য মানুষের পাশবিকতা সম্পর্কে রুসোর বিশ্লেষণ ভারি সুন্দর। তিনি বলেছেন, বন্য মানুষের লড়াই ছিল খাদ্যের লড়াই। খাদ্যের অধিকার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলতো না। কারণ সে লড়াইয়ে ব্যক্তিগত বা জাতিগত অহংকারের প্রকাশ ছিল না, as pride does not enter into the fight it is ended with a few fisticuffs, the victor eats, the vanquished goes off to seek better luck elsewhere and all are pacified.

সভ্য মানুষ দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বেশি অসভ্য। রুসো বলছেন, 'যোদ্দা প্রয়োজন যেই মিটলো, অমনি শুরু হলো বাড়তি ধান্দা, তারপরেই এলো বিলাসিতা, তারপর এলো প্রাচুর্য', তারপরই সেই দুষ্ট চক্র, then Subject, then Slaves- he does not have a moment of respite. Cut every throat until he is master of the whole universe.

এই কারণেই মানুষের সভ্যসমাজে কি ধনী, কি দরিদ্র সবাই অসুখী। রুসো লিখছেন, Men are wicked. মানুষ স্বভাবে দুর্বৃত্ত। আমাদের এই বিষণ্ণতা আর নিত্য অভিজ্ঞতায় অনবরতই তার প্রমাণ মিলবে। তবু বলবো মানুষ কিন্তু প্রকৃতই সুন্দর। মানুষকে দুর্বৃত্ত করেছে কে? করেছে দ্রুত পরিবর্তন। সভ্যতা আর জ্ঞান যতো বাড়ছে, মানুষ ততই দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে উঠছে।

ঠাকুর বলছেন, 'জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দরমহলে যায়।'

ভক্তি কাকে বলে? এই মেড-ইজির যুগে ভক্তিকেও আমরা ইজি করে নিয়েছি। বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে টুক করে একটি নমস্কার। না সেলাম, না স্যালুট, না নমস্কার। শিক্ষিত, সভ্য মানুষ ঠাকুর-নমস্কার করছে, যদি কেউ দেখে ফেলেন। আবার কারুর কারুর ভক্তি মানে বিকট গলায়, মা মা চিৎকার। এদিকে গর্ভধারিণী মাতা ছেঁড়া ট্যান পরে ঘুরছেন। কারুর কাছে ভক্তি মানে শ্মশানের বটতলায় কল্কে সেবন।

স্বামীজী সার কথা বলে দিয়েছেন, 'মুখ্যা ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোনো প্রভেদ নেই। মুখ্যা ভক্তি মানে হচ্ছে—ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্বত্র সকলের ভিতরে ভগবানের প্রেমমূর্তি দেখতে পাস তো কার উপর আর হিংসাদ্বেষ করবি?

এই প্রেমই হলো ব্রহ্মবিকাশ। আমরা সবই শিখেছি। আকাশে উড়তে শিখেছি। চাঁদের মাটিতে পা ফেলেছি। এক বোমায় বিশাল একটা শহর ওড়াতে পারি। সমুদ্রের অতলে রোবট নামিয়ে হারাধন তুলে আনতে পারি। পারি না ভালবাসতে।

যে পরিবারে আমাদের বসবাস, সেই পরিবার যদি প্রেমহীন হয় তাহলে আমরা মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকের প্রয়োজন অনুভব করি। প্রেমহীন সংসারের শিশু নিষ্ঠুর হয়, স্বার্থপর হয়। বয়স্করা আত্মহননের প্রবণতা অনুভব করেন। উন্মাদ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

সমাজ হলো বৃহৎ পরিবার। প্রেমহীন সমাজের মানুষ যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটিই হচ্ছে। অ্যাগ্রেসিভ। চরম স্বার্থপর। চরম নিষ্ঠুর। 'Cut every throat until he is master of the whole universe'. আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় চেঙ্গিজ অথবা তৈমুর কিংবা আলেকজান্ডার নেই। আমরা একটু ছিঁচকে ধরনের। ঠাকুরের ভাষায় ম্যাদামারা। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবারের কষ্টার্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ করে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কা হচ্ছেন, তাঁদের লক্ষ্য বাঁধা মাস মাইনের একটা ভালো চাকরি। তারপর জীবনের সেই সহজ সরল ন্যাশন্যাল হাইওয়ে—বিবাহ, সুকন্যাসহ সযৌতুক। যৌতুকের ব্যাপারে কৌতুক চলবে না। একটু এদিক-ওদিক হলেই সহজ সমাধান বধূ-নির্যাতন। শেষ অস্ত্র কেরোসিন সিঞ্চন ও অগ্নিসংস্কার। বর্তমানের অতিপুণ্য কর্ম।

স্বামীজী বলছেন, 'মেয়েদের পূজা করেই সবজাত বড়ে হয়েছে। যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নাই সে দেশ, যে জাত কখনোও বড় হতে পারেনি। কস্মিনকালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এতো অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।'

আজ থেকে ৯০ বছর আগে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে বসে স্বামীজী এই উক্তি

রছিলেন। তার মানে আমাদের মানসিকতা তখনও যা ছিল, এখনও তাই আছে। টুও বদলায়নি। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দদাস লিখেছিলেন—

'বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
বৃথা ও ইংরেজী শিক্ষা,
বৃথা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা,
হৃদয়ে নাহিক মোট জ্ঞানের উদয়।

কি করে হবে ! কেউ তো কোনোও দিন আমাদের বলছেন না, ওহে মানুষ হও। রা বলেছিলেন, তাঁদের আমরা এককথায় বাতিল করে বসে আছি। আর সেইটাই নাকি টেলেকচুয়ালিজম্। ঠাকুর বলছেন, সংস্কার চাই, তা না হলে, ওই ভাগবত পাঠ হচ্ছে, করা মুখ বেঁকিয়ে উঠে গেল। বললে, কি বেড়োড় বেড়োড় করছে।

উইলহেলেম রাইখ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ধরনধারণ বড় ভালো বিশ্লেষণ করছেন। যাঁরা মাদের মুক্তি চান, মানবজাতির বিকাশ চান, তাঁদের আমরা শূলে চড়াই। যিশুকে লিয়ে দিলুম ক্রুশে।

You have no sense organ for the truly great man. His way of being, his ffering his longing his raging his fight for you are alien to you.

আমরাই আমাদের পরম শত্রু। মহামানবরা আসেন, ফিরে ফিরে চলে যান। আমরা তিমিরে সেই তিমিরে। শিক্ষা, সভ্যতার শাঁক ভোঁভোঁ খুব বাজছে। ঠাকুরের কথায়, শাঁক হলো পদ্মলোচনের শাঁক। ঠাকুর এখন হেঁকে বলছেন, মন্দিরে তোর নাহিক ধব ! পোদো,শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল তায়, চামচিকি এগারজনা, দিবানিশি দিচ্ছে না।

রামকৃষ্ণের অন্নদা

একদিন। রাত প্রায় দশটা, সাড়ে দশটা হবে। ফটফট করছে চাঁদের আলো। আ
আর বেলা মা কোনও এক সভায় গিয়েছিলাম। মাকে আদ্যাপীঠে পৌঁছে দিয়ে ফিরব
বিশাল গেট খুলে গেল। সামনেই শ্বেতশুভ্র আদ্যামায়ের মন্দির। আকাশের গায়ে চূড়া
নির্জন নিরালা। ভক্ত মানুষজন দিনের প্রার্থনা জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন। মন্দির বসে
পরমাত্মার ধ্যানে। এক সার দেবদারুর মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে পায়ে পায়ে পেছনে
নাটমন্দিরের দিকে। চাঁদ পাতার আলোছায়া বিছিয়ে রেখেছে। সে যেন এক ম
আয়োজন। বিশালের নীরব পূজা চলেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। স্তব্ধ বিস্ময়ে বহুক্ষ
দাঁড়িয়ে রইলাম। কী সুন্দর! বিশাল ছাড়া বিশালকে ধরতে পারে! মনে হল, কী কৃ
তাঁর। অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনেছেন। তা না হলে, আমি কেন আসব। আ
তো তাঁর বৃত্তের বাইরে। আমি এই পৃথিবীতে আসার পরে পরেই তিনি তাঁর ঘনীভূ
সাধন জীবনের পুণ্যফল পাথরের কবিতা রচনা করে, প্রতিষ্ঠিত করে পরমধামে প্রয়া
করেছেন। দেহ গেছে প্রভাব যায়নি। শক্তির ক্ষয় নেই। কর্মের লয় নেই। এ এম
প্রদীপ, যা প্রজ্বলিত হলে আর নেবে না। তিনি আমার কানে কানে বললেন,—

ঐ দেখ, জগৎ জুড়ে উড়ছে নিশান রামকৃষ্ণ জয়।
ও ভাই! রামকৃষ্ণ জয়! হের রামকৃষ্ণ জয়! শুন রামকৃষ্ণ জয়
এখন কি চিনলি না সবে, তোরা আর চিনবি রে কবে?
বিশ্বমাঝে উঠছে ভেসে আপন গৌরবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'প্রভু। আপনি কে?' আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। মন্দি
সোপানের একপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সন্ন্যাসীর শরীরে কোনও চাকচিক্য নেই। দেহে
গর্ব সংযত। যেন বলতে চাইছেন, দেহ নয় মন। মনই সব। বলতে চাইছেন অপ্রকাশে
প্রকাশ। ত্যাগী সন্ন্যাসী ক্ষীণদেহীই হয়। ভোগের বিপরীত হল যোগ। শোনো, ভা
করে শোনো, আমি কে?

'জগতের মাঝে আমি ছোট
আমি অজ্ঞ, আমি দীন;
আমিই সবার চরণের রেণু

অতি তুচ্ছ অতি ক্ষীণ।'

বুঝেছি, এমন যাঁর স্বীকারোক্তি তাঁর সত্যদর্শন হয়েছে। যে বাতাস ফিসফিস করে য়, সেই বাতাসই প্রাণবায়ু। যে অহংকার পরমপদে লীন, সেই অহংই আত্মরূপ। আমি জানি আপনি কে ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘনিষ্ঠ ভক্তমণ্ডলীকে বারে বারে প্রশ্ন করতেন, 'বল তা আমি কে ?' তিনি অবশ্যই জানতেন, তিনি কে ? শুধু জানতে চাইছেন, তোমরা আমাকে চিনতে পেরেছ কি ? না, সন্দেহের ঝাপসা পর্দা তোমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সত্যের একটা খেলা আছে, নিজের ছটায় নিজেকে আবৃত করে রাখেন। উপনিষদের ঋষির একান্ত প্রার্থনা ছিল,

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ ঈশ—১৫

অনুগ্রহ করেছেন আপনি। আমাকে ধরেছেন অযাচিত করুণায়। অসীম কৃপায় ধরাও দিয়েছেন—অবনীতে কেন এসেছেন আপনি ? 'ঠাকুর। তোমারই আশা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি অবনীতে।' কী সেই আশা ? ঠাকুরের কোন অপূর্ণ আশা পূর্ণ করতে তিনি এসেছিলেন ? 'তোমারই বাসনা মন্দিরে বসে সদা যেন হেরি আমি।' এক ঠাকুর আর এক ঠাকুরকে সদাসর্বদা, সব কাজে, সর্বাবস্থায় দর্শন কররেন। ঠাকুর অন্নদা দর্শন করবেন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। রামকৃষ্ণলগ্ন থাকতে চান, রামকৃষ্ণানুগত হতে চান তিনি।

'আর কোন সাধ জাগে না এ চিতে,
আর কোন আশা আসে না ছলিতে,
শুধু তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রার্থনা দিবাযামী।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণ তঁর কাছে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ? 'তোমারই আদেশে দেশ বিদেশে, তব বোঝা নিয়ে চলি গো হরষে।' প্রচার, ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রচার। রামকৃষ্ণের প্রচার মানে, তাঁর ভাবাদর্শের প্রচার। সেই আদর্শ কি ? গৃহী, তুমি সংসারে থাক পাঁকাল মাছের মতো। একটি হাত ছুঁয়ে থাক মায়ের চরণ, আর একটি হাতে সংসারের কর্তব্যকর্ম। কর্তব্য যখন তোমাকে মুক্তি দেবে, তখন দু'হাতে ধরো তাঁকে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই উপার্জন কর। সত্যের অহংকারটুকু রেখে বাকিটুকু বলি দাও। অবিদ্যার সংসার নয়, বিদ্যার সংসার রচনা কর। অন্নদা যেন রামকৃষ্ণের প্রতিধ্বনি। বল,

'চাহি না কাঞ্চন আর কামিনীর আলিঙ্গন
চাহি নাকো জ্ঞানী সেজে কিনিতে গৌরবে ধন।'

অন্নদা যেন রামকৃষ্ণেরই কণ্ঠস্বর, 'অবিষয়ের খুঁটি থেকে মুক্ত কর নিজেকে, দু'হাতে আঁকড়ে ধর বিশ্বাস খুঁটি।' 'দশ ইন্দ্রিয় রিপু ছয়টি বশে আপ্তকাম'। আর আপ্তকাম হলে কি হবে ? 'চিনতে পারবি কে সে মায়া, ছাড়বে মোহ নিজ কায়া। আপন হয়ে পুত্র জায়া মুক্তি দেবে জগতে নাম।' রামকৃষ্ণ বলছেন, 'মায়া দুই প্রকার—বিদ্যা এবং অবিদ্যা। তার মধ্যে বিদ্যা মায়া দুই প্রকার—বিবেক এবং বৈরাগ্য। এই বিদ্যা মায়া আশ্রয় করে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। আর অবিদ্যা মায়া ছয় প্রকার—কাম, ক্রোধ, লোভ,

মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য। অবিদ্যা মায়া, 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞানে মনুষ্যদিগকে বদ্ধ করে রাখে। কিন্তু বিদ্যা মায়ার প্রকাশে জীবের অবিদ্যা একেবারে নাশ হয়ে যায়।"

এই অবিদ্যা মায়া থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করছেন ঠাকুর অন্নদা,

'গুরুনাম প্রাণারাম প্রাণারাম
ভাবলে প্রেমের বইবে তুফান জপলে পাবি মোক্ষধাম।'

রামকৃষ্ণ বলছেন, 'বাউল যেমন দু'হাতে দু'রকম বাজনা বাজায় ও মুখে গান করে হে সংসারী জীব ! তোমরাও তেমনি হাতে সমস্ত কাজকর্ম কর কিন্তু মুখে সর্বদা ঈশ্বরের নামজপ করতে ভুলো না।' রামকৃষ্ণ আরও বলছেন, হাততালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম করো, তাহলে সব পাপতাপ চলে যাবে। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহগাছ থেকে সব অবিদ্যারূপ পাখী উড়ে পালায়।

অন্নদা বলছেন, দু'হাত তুলে নাচ, গুরু এক, তিনি রামকৃষ্ণ 'পাঞ্জাবেতে গুরু নানক, বাংলাতে রামকৃষ্ণনায়ক। গুরুরূপে এসেছেন জীবে, উদ্ধারিতে বঙ্গঘরে। জয়গুরু বলে রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারিলে। স্বপ্নে এসে শিয়রে বসে তত্ত্বকথা কয় জীবেরে।'

অন্নদা বলছেন, শোন, ধর্মের সঙ্গে কর্ম মেলাও। নিজেকে আগে সর্ব অর্থে প্রস্তুত কর। অবিদ্যামায়া ছেদন কর। বিদ্যামায়াকে আশ্রয় করে ভগবৎমুখী হও। সার বস্তুটি চিনে নাও ; 'আমি সার বুঝেছি গুরুনাম। ঐ নাম বিনে ভাই ! আর গতি নাই ! অন্তে মিলে মোক্ষধাম।' সেই গুরুনাম হল—'গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ আমার।' ওয়া গুরুজিকি ফতে বলে ঝাঁপিয়ে পড় কর্মে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে এক করে দাও।

'(তোরা সব) বুক বেঁধে লাগ কাজে ;
ধ'রে গুরুদত্ত অসি কর্মবীর সেজে
এসেছিস কাজের তরে,
কাজ কত্তে যা' আপন ঘরে,
বসে আছেন মা তোদের তরে
অশ্রুনীরে ভেসে।'

এই মা হলেন দেশমাতা। স্বামীজী লিখেছেন, 'বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে, মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, একথা বুঝিস—আমাদের দেশে মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশময়।'

'যাক, তোদের মধ্যে যাঁরা একটু মাথাওয়ালা আছেন তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে—Idea (ভাব) ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ। Independent (স্বাধীন) হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ... অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি ? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোরতন্ত্র বেদ, পুরাণ

তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি কাজ করে দেখাতে পারিস্, যদি এক বৎসরের মধ্যে দু-চার লাখ চেলা ভারতে জায়গায় জায়গায় করতে পারিস তবে বুঝি। তবেই তোদের উপর আমার ভরসা হবে, নইলে ইতি।'

অন্নদার কণ্ঠে স্বামীজীর প্রতিধ্বনি—

'কাজে ফাঁকি দিস নে তোরা,
কর্মক্ষেত্রে সবাই দাঁড়া,
তবে ত' বিশ্বের তরে প্রেমের ধারা
বইবে তোদের দেশে।
ওরে ভাই! বইবে তোদের দেশে।
সবাই মিলে প্রাণে প্রাণে
প্রেমের নিশান তোল সমানে
আলিঙ্গন দে ফুল্ল মনে
দাঁড়িয়ে সবার মাঝে।
এবার, ভুলে যারে জাতের বিচার,
ভায়ে ভায়ে মিশে
সবাই, সবার সনে মিশে॥'

সেই ঘণ্টা নাড়। জান তো, ঘণ্টা ডাইনে বামে নড়ে। ধর্ম আর কর্ম। আর ধ্বনি? সেই তো প্রেমের ধ্বনি। শ্রীচৈতন্যের প্রেম, বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের মেধা। এই তিনকে এক কর। 'প্রেমের আলো ছড়িয়ে দিয়ে, জ্ঞানাকাশে উদয় হও।' মোহ ঘোর থেকে বেরিয়ে এস। জ্ঞানছুরি দিয়ে মোহজাল ছিন্ন কর। আমি, আমার এই ত মোহ! তুঁহুঁ তুঁহু কর। যত দিন হাম্বা হাম্বা ততদিন মহাক্লেশ। জড়ের চিন্তায় জড় হয়ে যাবে। তেলাপোকা যথা কাচপোকা ভেবে। আলোর সাধনা কর। ভেতরের আলোকে বাইরে আন। দেখ,

'জগৎ জোড়া ভাবের মাঝে
দাঁড়িয়ে আছে আমার শ্যামা ;
যে দিক দেখি সে দিকেই যেন
জ্যোতির্ময়ী মা মনোরমা।'

জ্যোৎস্নালোকিত এই রাত। সামনে শ্বেত শুভ্র মর্মর মন্দির। অন্তঃপুরে মা আদ্যাশক্তি অধিষ্ঠিতা। একজন মহামানবের সাধনার বেদীপীঠ। মহতো মহীয়ান্। যতদিন যাচ্ছে বৃত্ত বড় হচ্ছে। তিনি যেন বলছেন—দাঁড়াও, রামকৃষ্ণ নামে বুক বেঁধে দাঁড়াও। যাবে ভবের ভাবনা ও ভয়, কেন মিছে ব্যাকুল হও? পোহাবে তোর মোহনিশা। ঘুচে যাবে পাপতৃষা, আর কি হবে! রিপুর দ্বন্দ্ব তোমার দূরে যাবে। ঘুচে যাবে সকল সন্দেহ। সৎ চিৎ আনন্দময়ে চিরনিমগ্ন হয়ে যাবে। অনন্ত আনন্দ পারাবারে তুমি মুক্তি পাবে।

আপনি কে প্রভু!

আমি রামকৃষ্ণদাস। শুনে রাখ—'না যেচে মজুরী তোমারই কাছে সেধে নিছি ভার মাথে, সাধ বড় প্রাণে জীবনে মরণে ঘুরি তব সাথে সাথে। আমি ঘুরে কর্ম নিয়ে মাথে॥' কর্মের পাথরে গাঁথা এই মন্দিরের বিগ্রহ মানবতা, যাঁর শক্তি সঙ্ঘশক্তি।

প্রশ্ন

কেউ তো প্রশ্ন করে না, সারাটা জীবন তুমি কি করে এলে ? আমরা আসি, আমরা চলে যাই। খাই দাই। খানিক হাসি, খানিক কাঁদি। হলহল করে অজস্র বাজে কথা বলি। নিজে ভুগি অন্যকে ভোগাই। সকলেই কর্মবীর ধর্মবীর হবেন এমন কোনও কথা নেই। তা হওয়াও যায় না। প্রারব্ধ বলে একটা কথা আছে। জন্মজন্মান্তরের সাধনায় মানুষ এক জন্মে এসে ফল পায়। জন্মান্তর আমাদের মানতেই হয়। একই মানুষ, একই রকম দেখতে, কেউ পুরুষ, কেউ মহাপুরুষ। কেন ? কেউ আসে ভাল সংস্কার নিয়ে, কেউ আসে কাপুরুষ হয়ে। কেন ? মহাজীবনের সমস্ত লক্ষণই বাল্যাবস্থা থেকে ফুটে ওঠে। তাই বা কি করে হয় ! সাত বছরের ছেলে পাকা তবলিয়া কি পাকা গাইয়ে, কি পাকা সেতারী। কেউ লেখাপড়ায় এত ভালো যে, যা শোনে তাই মনে রাখে। শ্রুতিধর। শৈশব থেকেই কেউ ঈশ্বরী কথা শুনতে ভালবাসে। উদার পরোপকারী আদর্শনিষ্ঠ। বিজ্ঞান বলবে, ওসব হল ব্রেনের ব্যাপার 'জিনসে'র কেরামতি। বিজ্ঞান পরকাল মানে না। ইহকালেই সব শেষ। কোনও এক পুরুষের প্রতিভা বংশগতির ধারায় ঘুরতে ঘুরতে এই পুরুষে এসে ভর করে। এর কোনও নিয়ম নেই। বলা যায় না কিছু। বিজ্ঞান যাকে 'জিন' বলছে, হিন্দুধর্ম সেটাকেই বলছে পূর্বজন্মের সংস্কার। মহাপুরুষ, মহামানব আকার আকৃতির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারেন জীবটি কি সংস্কার নিয়ে এসেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহেন্দ্রনাথের (শ্রীম) দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল, চোখ এসব দেখলে বুঝতে পারি'..... এই যে জীবের লক্ষণ, যা ঠাকুর শ্রীমর মধ্যে দেখলেন, এইটিই হল পূর্বজন্মের সংস্কার, সেই সঙ্গে পিতামাতার সৎ ও শুদ্ধ জীবনের দান। ঠাকুর শ্রীমকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন ? বিদ্যাশক্তি, না অবিদ্যাশক্তি।' ঠাকুর জানতে চাইছেন, জীবনপথে স্ত্রী স্বামীকে সাহায্য করবেন কি না। বংশে শুভ কর্মকারী, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন সন্তান আসার পথ খোলা আছে কি না ! আবার শ্রীম ঠাকুরের ঘরে নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শনের বিবরণটি লিখেছেন এইভাবে, 'একটি উনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ্য করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি

তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।' ঠাকুরের যিনি কৃপাধন্য হবেন তিনিও তো মহামানব, মহাসাধক। তিনিও তো আধার চিনবেন।

এই আর একটি শব্দ পাওয়া গেল, 'আধার', যে আধারে জীবাত্মার বসবাস। এই আধার অর্জন করতে হয় সাধনায়। পিতামাতার সাধনা। নিজের পূর্ব জন্মের সাধনা। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন।' ঠাকুর বলছেন নরেন্দ্রকে। তবে একটা কিন্তু আছে। 'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে ; মন্দলোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন, তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না।' পরে আরও একটু ব্যাখা করে ঠাকুর বলছেন, 'শাস্ত্রে আছে আপো নারায়ণঃ—জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল ঠাকুরসেবায় চলে ; আবার কোন জলে আঁচানো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা কেবল চলে, কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু অভক্ত দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।'

তাহলে অমৃতের পুত্র ভেবে তামসিকতায় ভেসে গেলে ঘৃণাই কুড়োতে হবে। স্বভাব অনুযায়ী নিজের ঘোঁটালেই সঙ্গীসাথী খুঁজতে হবে। যাঁরা চেনেন তাঁরা তফাতেই রাখবেন। যে জগৎ সুন্দরের সত্যের পুণ্যের, মানুষ হয়েও সেই জগৎ থেকে দূরেই থাকতে হবে। নারায়ণ হয়ে ও দুষ্ট নারায়ণ হয়ে নিজের স্বভাবের চক্রেই ঘুরতে হবে। ঠাকুর পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন—সব মানুষই কি সমান ? না সমান নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীব জন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে। বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে, আবার বিষফলও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে, সাধু আছে, অসাধুও আছে ; সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে।'

'জীব চার প্রকার ঃ—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।'

ঠাকুর এই চার প্রকার ব্যাখ্যা করছেন। 'নিত্যজীব : যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য। বদ্ধজীব : বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষুজীব যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ পারে না। মুক্তজীব : যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়—সাধুমহাত্মারা ; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।'

ঠাকুরের ছিল উপমা দেবার, জ্ঞানকে নীতিগল্প করে তোলার ঐশ্বরিক ক্ষমতা। অমন যুগাবতার কি আর আসবেন! একঘর ভক্ত বসে আছেন উন্মুখ হয়ে। আছেন শ্রীম, নরেন্দ্র। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন, 'যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দুচারটে মাছ এমন সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে ; এরা মুমুক্ষুজীবের

উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না। দু'চারটে ধপাঙ, ধপাঙ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না ; আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়হড় করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।'

বদ্ধজীবের মনে প্রশ্নই আসে না, দিন তো যায়, আমি কি করলুম ! ফেলে আসা বছরে, চিন্তায় কর্মে আমি কি করে এলুম। এই প্রশ্ন তো তাঁর করুণাতেই জাগে। যিনি জালে জড়ান, তিনিই তো মুক্তির পথ করে দেন। পথ খোঁজার আগে আসে প্রশ্ন, যেমন বজ্রের আগে বিদ্যুৎ। বদ্ধজীব সম্পর্কে ঠাকুরের পর্যবেক্ষণ অসাধারণ ; "বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্লে, আমার কি করে গেলে ?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সলতে জ্বললে, বদ্ধজীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে। বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তা হলে হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না তাই বেড়া বাঁধছি। হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।"

তিনি যাকে জন্মচক্রে ঘোরাবেন, তাকে একটা অহংকার দেন। বদ্ধজীবের অহংকার আমি যা করছি ঠিক করছি, বেশ করছি। যে যা করছে সব ভুল। আমার ঘড়িই ঠিক চলছে। এইভাবেই একদিন জীবনদীপ ফুস্।

ভক্তি ভগবানের সম্পত্তি নয়, ভক্তি ভক্তের সম্পত্তি। ভগবানের সম্পত্তি কৃপা। অবশ্য ভগবানের কাছ থেকে কৃপা না এলে কেউ ভক্ত হতে পারে না, কেউ ভক্তি লাভ করতে পারে না। কেমন করে এই কৃপা লাভ করবো ! যে কৃপায় আমি ভক্ত হব। আমার ভক্তি হবে। বিষয় বাসনা থেকে, তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার থেকে আমার মন উঠে যাবে। মনভ্রমরা গিয়ে বসবে তার চরণকমলে। সত্যযুগের পথ ছিল ধ্যান। ত্রেতায় যজ্ঞ। দ্বাপরে পরিচর্যা অর্থাৎ অর্চনা-মার্গ। কলির পথ ধ্যান-যজ্ঞ অর্চনা নয়, নামগান। দু'হাত তুলে হরিনাম সংকীর্তন। কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ। নাম নিতে নিতে নামী নামকারীকে গ্রাস করবে। তখন আসবে বিশ্বাস। বিশ্বাস থেকে আসবে ভক্তি। তখন নামমাত্রেই 'দু'নয়নে বহে অশ্রুধারা' ! অন্নদাঠাকুর বলছেন—"প্রেমপূর্ণ প্রাণ শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞান। অহৈতুকী ভক্তি ধন। ছাড় কামিনীর কায়েম ছলনা। প্রেম বলে যারে ভ্রম। পরিজন সঙ্গ ছাড় বৃথা রঙ্গ। এই [illegible] সাধন ক্রম।"

এই তো সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সাধন ছাড়া তো সিদ্ধি আসে না। সারাদিন হাহা করে ঘুরলুম। জীবিকার চরকায় তেল দিয়ে নানারকম দৈহিক ভোগের ব্যবস্থা করলুম। আবোল তাবোল পড়লুম, গুচ্ছের বকলুম, মধ্যযামের আগেই চিৎপাত

য্যায় ; কারণ বড়ই ক্লান্ত। এই দিনলিপির কোথায় আছে তাঁকে পাবার সামান্যতম ষ্টা। অথচ আমরা চাই। তাঁকে চাই, যাঁকে পেলে আর কোনও কিছু পাওয়ার বাসনা াকে না। সে কি অতই সহজ। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ লতেন, 'তাঁর দিকে এক পা এগোলে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন'। সেই একটা া তো এগোতে হবে ! বসে বসে গটরা করলে হবে না। গ্রাম্যকথায় সময় নষ্ট করলে, ময় তো আমার জন্যে বসে থাকবে না।

টুসকি মেরে পরমার্থ লাভ হয় না। হলে বিষয় আর বিষয়ী দুটোই লোপ পেত। ন্নদাঠাকুরের নির্দেশ—'বসিয়া নির্জন স্থানে নিমীলিত দু'নয়নে। এক মনে ভাব বিভু শ্বর্য মহান্। কিম্বা চিন্তা সে চরণ হয়ে ভক্তিযুক্তন। ভিন্ন জন যেন কভু না পায় সন্ধান'। াকুর রামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, মনে, বনে কোণে। প্রথম অবস্থায় একটু নির্জনে বসে ন স্থির করতে হয়। তা' না হলে অনেক দেখে শুনে মন চঞ্চল হয়। যেমন দুধে জলে কসঙ্গে রাখলে মিশে যায়, কিন্তু দুধকে মন্থন করে মাখন করতে পারলে জলের সঙ্গে মশে না, সে জলের ওপর ভাসে ; তেমনি যাদের মন স্থির হয়েছে তারা যেখানে সেখানে সে সর্বদা ভগবানকে চিন্তা করতে পারে।' ঠাকুর একদিন বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে ঠাৎ মণিকে নিভৃতে নিয়ে বলছেন—'ঈশ্বর চিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভাল।'

নিভৃতে নিরালায় গোপনে মনকে সাবধানে শেখাতে শেখাতে, পিতা যেভাবে চঞ্চল ালককে হাত ধরে ধরে পথ চলেন সেইভাবে চলতে হবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে। ন যখন বাঁদরের মতো ছটফট করবে তখন বিচার ; তখন স্মরণ করো আর এক াকুরকে, অন্নদাঠাকুর—'শুন মূঢ় মন ! বলি সুবচন। বিবেকের পথে চল। জলবিম্ব প্রায়। এ জীবন হায়। কতক্ষণ রবে বল'?

এ কোনও হতাশার কথা নয়। চিরন্তন, অভিজ্ঞতাসঞ্জাত প্রশ্ন। নিত্য অনিত্যের ন্ধান। যেসব বস্তু নিমেষে ছেড়ে চলে যেতে হয়, তার জন্যে সারাজীবন অনর্থক ছোটাছুটি, কোস্তাকুস্তি করার কি মানে হয়। ভাড়া বাড়ি আর নিজের বাড়ি। 'তোমার ওই দেয়ালটায় যে নোনা ধরে গেছে গো। কিছু করবে না ?' সে ভাই বাড়িওলা বুঝবে। আমি ভাড়াটে আজ আছি কাল নেই। নিজের বাড়ি হলে দেখা যাবে। দেয়ালে প্ল্যাস্টিক পেন্ট লাগাতুম। পরের বাড়িতে পয়সা খরচ করে অর্থনষ্ট।'

নিজের বাড়ি হল এই পঞ্চভূতের দেহমন্দির। মন হল বিগ্রহ। বিগ্রহের সেবা না করলে হয়ে দাঁড়াবে গ্রহ। মন আবার দেহবাড়ির মালিক, বাড়িঅলা। এই বড় আমি-র সঙ্গে ভাড়াটে ছোট আমি-র সুসম্পর্ক না হলেই নিত্য চুলোচুলি। দরজা-জানালা খুলে পড়ে যায়, ছাদের চাবড়া খুলে পড়ে, জল আসে না কলে, বাড়িঅলা নির্বিকার ; কারণ সম্পর্ক অতি তিক্ত। ওঁচা ভাড়াটের যা হয়।

নির্জনে মিনিট পাঁচেক দাঁড়াও। দুটো পা মাটিতে। ফুটখানেকের বেশি জায়গা নয়নি। শূন্যে দেহকাণ্ড পাঁচফুট কয়েক ইঞ্চি উঠেছে। পৃথিবীতে এই তো আমার স্থিতি। আমার একটা নাম আছে। সেইটাই হল এই বোতলের লেবেল। আমি ভিটামিন না ফিনাইল। ভিটামিন হলে খাবে, ফিনাইল হলে বাথরুম পরিষ্কার করবে। এই নামের

অগে পরে আরও একসার নাম পূর্বপুরুষ, উত্তরপুরুষ। এই হল আমার শৃঙ্খল। আমার প্রারব্ধ। আমার বন্ধন। এক নামের টানে মুতোঘাসের চাবড়ার মতো খানিকটা উঠে আসে এক সঙ্গে। এইটুকুই আমার পরিচয়। এই শৃঙ্খলই আমাকে ঘোরায়, জ্বালায়, পোড়ায়। মৃত্যুর পর সামান্য তিনটে লাইন—অমুকচন্দ্র তমুক, চল্লিশ বছর এই প্রতিষ্ঠানে গোলাম ছিলেন। এক স্ত্রী, দুই পুত্রকন্যা রেখে পরপারে চম্পট। এই তার সম্পদ। বড় আমি-র কাঁচকলা। বড় আমি হল ইলেকট্রিক লাইন। সেই লাইনে অজস্র টুনি। একটা ফিউজ হল তো বয়েই গেল। মেকানিক এসে বাল্বটা পালটে দিলে। অক্ষত আলোর মালা সারারাত জ্বলে। ভবে আসা খেলতে পাশা।

পথ দাও বলে

'যত বড় হও ছোট হয়ে রও। শান্তি লভিবে তাহে।'

বললেন শ্রীশ্রীঅন্নদা ঠাকুর। এই তো শাশ্বত বাণী। একই কথা বলেছিলেন মহাপ্রভু। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সাপের গল্প। 'আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়।' এ যুগ। কতটা কি করবো, ব্যবহারিক জগতের সামনে নিজেকে কি ভাবে তুলে ধরব, তা নিজেকেই ঠিক করতে হবে। এ যুগ হল অশ্রদ্ধার যুগ, অন্যকে মাড়িয়ে চলার যুগ। নীচ অহংকারের অভিব্যক্তি সর্বত্র। শিক্ষা আছে, নেই সৎশিক্ষা। ভীষণ প্রতিযোগিতা, ভীষণ ঠেলাঠেলি সর্বত্র।

তাহলে পথটা কি ? অহংকারে মটমট করবো না। অহংকার হল চিদাকাশের তামসিক মেঘ ! কিসের অহংকার ! তিন নিয়েই তো জীবের অহংকার, ধন, মান আর রূপ। তাহলে একটু বিচার করা যাক। টাকার অহংকার। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, 'টাকার অহংকার করতে নেই। যদি বল আমি ধনী, ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকী পোকা ওঠে সে মনে করে আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি ; কিন্তু যেই নক্ষত্র উঠল অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা মনে করে আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি ; কিন্তু পরে যখন চন্দ্র উঠল, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলে আমার আলোয় জগৎ হাসছে। দেখতে দেখতে অরুণোদয় হল, তখন চন্দ্র মলিন হয়ে গেল। খানিক পরে আর দেখা গেল না। ধনীরা যদি এগুলি ভাবে, তাহলে আর তাদের ধনের অহংকার থাকে না।' রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে। কুঁড়ি তারে কহে ঘুমঘোরে। তারা বলে, 'যে তোরে জাগায় ' মোর জাগা ঘোচে তার পায়।' মাত্রার তো শেষ নেই, যেমন শেষ নেই বিরাট এই বিশ্বের।

শঙ্কর বললেন, 'মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।' কাল সব হরণ করার ক্ষমতা রাখে—আজ যে আমীর কাল সে ফকির। তারপর রূপ 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।' সুদেহ, সুরূপের অহংকার একেবারেই সাজে না ; কারণ বিশ্বসুন্দরীও একদিন গলিত-পলিত বৃদ্ধা হবেন। আর মান। তার আগে দুটি নির্ভর-শব্দ আছে ধন আর জন। মান, ধন আর জননির্ভর। ও দুটি গেলে এটি আর থাকে না। তা হলে 'যত বড় হও ছোট হয়ে রও।' মনে লালন কর আত্মজ্ঞান,

সত্যজ্ঞান। 'আজ গড়ি খেলাঘর। কাল তারে ভুলি। ধূলিতে যে লীলা তারে। মুছে দেয় ধূলি ॥'

ঠাকুর অন্নদা বললেন, 'পরতরে সেজে এসেছ এদেশে। পর পানে ফিরে চাও।' নিজেকে নিয়ে মেতে থেকোনা। একে তো ক্ষুদ্র হয়েই এসেছো, নিজেকে আরও ক্ষুদ্র করে ফেলো না। তাহলে শান্তি পাবে না। সব পাওয়ার শেষ পাওয়া হল শান্তি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন "গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখে হাইকোর্টের জজ হয়ে মনে করে, 'আমি বেশ আছি'। ভগবানও তখন বলেন, তুমি 'বেশ থাক'। তারপর যখন সে পেনসন নিয়ে ঘরে বসে, তখন সে বুঝতে পারে—'এ জীবনে কল্লুম কি ?' ভগবানও তখন বলেন, 'তাই তো, তুমি কল্লে কি ?"

এই যে 'কি করলুম ?' জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নের ফাঁকা জবাবে মানুষকে ফিরে যেতে হয় মহা অতৃপ্তি নিয়ে। আর সেই অতৃপ্তি নিয়েই আবার ফিরে আসতে হয়। আবার নতুন করে ফাঁদতে হয় খেলাঘর। একটু ভাবনার প্রয়োজন আছে। জীবনের আবর্তে তোলপাড় হতে হতে, মাঝে মাঝে থমকে গিয়ে প্রশ্ন—"কী পাই, কী জমা করি। কী দেবে, কে দেবে। দিন মিছে কেটে যায়। এই ভেবে ! চলে তো যেতেই হবে। 'কী যে দিয়ে যাবো'। বিদায় নেবার আগে। এই কথা ভাবো ॥' [রবীন্দ্রনাথ]

'পরতরে প্রাণ কর সবে দান', বলছেন ঠাকুর অন্নদা। মানে অনুভব করো। একটু কাঁদো। কিছু না পারো একটু সহানুভূতি দাও। মানুষের একাকীত্ব ঘোচাও, নিজের একাকীত্ব ঘোচাও। 'স্বার্থ অন্ধকারে রহিও না পড়ে। উদার হৃদয় হও' ॥ পৃথিবীতে হৃদয়টাই সব। হৃদয় থামলো তো সবই গেল। হৃদয়ই মানুষের সেরা আস্তানা। বিশাল এক অদৃশ্য হৃদয়ে আমরা নিমজ্জিত। 'ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই। যে আলোকে ভাইকে দেখিতে পায় ভাই। ঈশ্বর প্রণামে তবে হাতজোড় হয়। যখন ভাইয়ের প্রেমে মিলাই হৃদয় ॥' [রবীন্দ্রনাথ]

তোমার আদেশে এসেছি প্রভু ! বিস্মৃতি দিও না। তুমি আমাকে তোমার সুরে বাজাও। আমরা একই নৌকার যাত্রী। 'চলেছি ভাই একই ঠাঁই।' ভাব মন ! 'তাঁর দেশে পাঠায়েছে তোরে ! সত্য পথে থেকে তাঁর কর্ম করিবারে ॥'

দস্তুরমতো পথ

"গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হতে শিষ্যে আসে, আবার তাঁর শিষ্যে যায় তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা—আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য, একি ছেলেখেলা নাকি?" স্বামীজী লিখছেন স্পষ্টভাষায়। স্বামীজী একটি ছেলে সম্পর্কে মঠের ভাইদের নির্দেশ দিচ্ছেন: "সেই যে বোম্বাই থেকে এক ছোকরা মাথা মুড়িয়ে তারকদের সঙ্গে রামেশ্বর যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য! না দেখা, না-শোনা—একি চ্যাংড়ামো নাকি? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোনও কাজ হয় না—ছেলেখেলা নাকি? সে ছোঁড়াটা যদি দস্তুরমতো পথে না চলে, দূর করে দেবে।" একটি কথা পাওয়া গেল, 'দস্তুরমতো পথ'। সেই পথটা কি? আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য, এই বললেই হয়ে যাবে! দেয়ালে তাঁর ছবি, একপাশে মা সারদা—অন্যপাশে স্বামীজী। মাঝে মাঝে মালা ঝোলাই। তাঁদের একটি দুটি উক্তি আমার মনে লেগে আছে। সেইগুলোই কপচাই। লাগসই জায়গায় দি। মুখে এমন একটা ভাব করে থাকি, যেন আমার পা দুটো শুধুমাত্র সংসারে আছে, মাথা ঠেকে আছে 'রামকৃষ্ণলোকে'। স্বামীজী যাকে 'দস্তুরমতো পথ' বলছেন সে-পথ আংশিক সমর্পণ নয়। সম্পূর্ণ সমর্পণ। ছোটখাট সংস্কার নয়, সম্পূর্ণ সংস্কার। জীবনটাকে একেবারে ঢেলে সাজান। চিন্তায়, ভাবনায়, জীবনচর্যায় বিশ্বাসে, নিষ্ঠায় সম্পূর্ণ রূপান্তর। বাইরের লোক-দেখান বিজ্ঞাপন নয়। জীবনটা কাপড়ের দোকানের শো উইন্ডো নয়। ভেতরের আগুনকে জ্বালাতে হবে। 'স্পিরিচুয়াল ফায়ার'।

স্বামীজীর সেই প্রবল ধমক—"আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়"। আর কি করতে হবে? "লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। ভাব ছড়া, গাঁয়ে-গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ। স্বাধীন হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ। অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি?"

আচারের চেয়ে বিচার বড়। স্বয়ং ঠাকুর সে-কথা বারে বারে বলেছেন। স্বামীজীর তেজ কোথা থেকে এসেছিল! ঠাকুরকে আমরা সদা ভাবাবিষ্ট, শান্ত, সমাহিত পুরুষ বলেই মনে করি। তাঁর চাবুকের মতো মহাসত্তার কথা অস্বীকার করতে চাই। ভুল। ঠাকুর কেন অবতার! অবতার আর মহাপুরুষে কি তফাৎ। মহাপুরুষ নিজের মুক্তি

খোঁজেন, অবতার আসেন জীবকে মুক্তির সন্ধান দিতে। তিনি প্রয়োজনে চাবকান, বাক্যের দ্বারা বিদ্ধ করেন। শিক্ষিত ভণ্ড মানুষের আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মুখোশ, তিনি পাকা সার্জেন যেভাবে ছুরি চালান, সেই ভাবে সামান্য আঁচড়েই খুলে ফেলে দিতেন। ঠাকুর বিশাল বক্তৃতা দিতেন না। মহাদণ্ডে বা দাপটে সকলকে হতচকিত করতেন না। তাঁর অস্ত্র ছিল গল্প, অস্ত্র ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাওয়া। অস্ত্র ছিল প্রকৃত মানুষের সঙ্গে ভণ্ড মানুষ, ভোগী মানুষ, নীচ মানুষের তফাৎটি ধরিয়ে দেওয়া। কিছু বলার প্রয়োজন নেই। দর্পণটি তুলে ধর. মাত্রই সে বুঝতে পারবে—শকুন আকাশের বহু উঁচুতে ঘুরপাক খায় নজর থাকে ভাগাড়ে। পদ্মলোচনের শাঁখ। ভোঁ ভোঁ বাজে ; কিন্তু মন্দিরে যে মাধব নেই। ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন, হৃদে পালিয়ে আয়, লোকটার পয়সা হয়েছে। এঁড়েদার ঘাটে বসে আছেন ভদ্রলোক, ঠাকুর নামছেন নৌকা থেকে। দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঠাকুর আছ কেমন ? তিন সন্ন্যাসী বসে আছেন। ঠাকুর দেখছেন। একজন আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে। ঠাকুরের মন্তব্য : বিবাহিত সন্ন্যাসী, তাই মেয়েদের দিকে অমন আড়ে আড়ে চাইছে। ঠাকুর এমন সূক্ষ্মভাবে মানুষকে মানুষের উদাহরণ দিয়েই ধরিয়ে দিতেন, স্বামীজী যা সোচ্চারে বলেছেন—'একি চ্যাংড়ামো নাকি !' ঠাকুর ছিলেন মৃদু, অন্তর্ভেদী। স্বামীজী সেই গুরুপরম্পরায় বিস্ফোরক ; কারণ ঠাকুর তাঁকে তৈরী করেছিলেন সেই ধারায়। যাতে তিনি আসল কথাটি বোমা ফাটানোর মতো বলতে পারেন—'রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন ; আষাড়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি ! আজ ঘণ্টা হলো, কাল তার ওপর ভেঁপু হলো, পরশু তার ওপর চামর হলো, আজ খাট হলো, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হলো...চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্ম চক্র ইত্যাদি।'

আঘাতের পর আঘাত হানছেন স্বামীজী : "একেই ইংরাজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐরকম বেল্‌কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দুবার ঘুরবে না চার বার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন-রাত ঘামতে চায়, তাহাদেরই নাম হতভাগ্য ; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো আর এরা ত্রিভুনবিজয়ী। কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।"

অতঃপর আবার কঠোরতর আঘাত : "যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফন্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানব দেহধারী হরেক মানুষের পুজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম ; ঘণ্টার ওপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুর ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির

; করছেন ; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।"
দস্তুরমতো পথ' ও নয়। দেহে মন্দির হও, মনের ইজারা দাও মাধবকে।

পথ ও পথিক

জীবনে একটা কিছু ধরতে না পারলে বড় ফাঁকা, নির্জন, নিঃসঙ্গ। এখন প্রশ্ন হলে কী ধরা ? কাকে ধরা ? শেখভের 'বোরিং স্টোরি'র সেই নায়ককে মনে পড়ছে মেডিসিনের বিখ্যাত অধ্যাপক। যৌবনে যখন ক্লাস নিতেন তখন ছাত্ররা উদগ্রীব হ অধ্যাপকের প্রতিটি কথা শুনত। ক্লাসে পিন পড়ার শব্দ শোনা যেত। বক্তৃতার এম আকর্ষণ। অধ্যাপকের সুন্দরী স্ত্রী। একমাত্র সুন্দরী কন্যা। যশ, খ্যাতি, অর্থ, বিত্ত অভাব নেই কোনোও কিছুর। ধীরে ধীরে বয়েস বাড়ল। সংসার সরে গেল দূরে অধ্যাপনায় জড়তা এল। ছাত্রদের ওপর আর সেই আকর্ষণী ক্ষমতা নেই। অধ্যাপকে জীবনের শেষ হাহাকার, 'আমি কী নিয়ে বাঁচব ! কী ধরে বাঁচব ! ধরার মতো এক মজবুত বিশ্বাসও তৈরি করতে পারিনি।'

ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। ধর্মকর্ম ! সাবেকী ব্যাপার। নিউক্লিয়ার যুগে অচল। ি আছে, ধার্মিক হবারও প্রয়োজন নেই। যাহা চায় প্রাণ, তাই না হয় করা গেল। তারপ সকলেই আমরা চলছি। চলার অভ্যাসেই চলা। আমাদের কৃতকর্মের ফসল তুল তুলতে সময়ও আসছে পিছু পিছু। গড়ে পড়ছে। গৌরব, অগৌরব সবই তোলা থাক উত্তরকালের জন্যে। আমাদের হয়তো কোনোও প্রশ্ন নেই ! প্রয়োজন নেই জানার—যা কোথায় ? একবারও ভাবব না, After follows before অথবা which is tod tomorrow will be yesterday; কিন্তু মানব-ধারায় যারা আমাদের পেছনে আসছে ত যখন দেখবে অনুসরণের ফল হলো, ওয়াইলডারনেসে মুক্তি, তখন মৃত্যুর পর চিত্রপটের গলায়, ফুলের বদলে জুতোর মালা ঝুলবে। অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধা

ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাক, বেঁচে থাকায় মনে হয় সকলেরই বিশ্বাস আছে। তা না হ মরতে এত ভয় পাই কেন ? বাঁচতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পরিবারের, প্রয়ো সমাজের, প্রয়োজন সামাজিক শৃঙ্খলার। এ সবই হলো জীবনের বাইরের ব্যাপা এইবার পেট যেমন আহার চায়, দেহ যেমন পুষ্টি চায়, জিভ যেমন স্বাদ চায়, চে যেমন সুন্দর দৃশ্য দেখতে চায়, কান যেমন সুর খোঁজে, দেহ যেমন খোঁজে, মন তে জানতে চায়। মনও আহার খোঁজে। শিক্ষা চাই, সংস্কৃতি চাই। ভোগের জন্যে অ বলেই সভ্যতার জন্ম। ঈশ্বর মন্দিরে নেই। তিনি আছেন আমাদের মনে। তাই সুন্দ

. আমাদের এত আকর্ষণ! স্বত-উৎসারিত বাঃ উক্তি।
সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কার সবই মানুষের তৈরি। কিছু বাঁচার প্রয়োজনে, অন্তরের তাগিদে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কাজলের ঘরে এলে গায়ে একটু ন লাগবেই। পৃথিবীতে এলে, সে যখন যে সময়েই আসি না কেন, বেঁচে থাকার টা অভিজ্ঞতা হবেই। আর সেই অভিজ্ঞতা একটা জীবনদর্শন তৈরি করবে। কিছু স্তু ব্যক্তিগত, পরিবেশ-নির্ভর, কিছু ইউনিভারসাল। যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার ামর অভিজ্ঞতা উদ্ভূত। যেমন আদি মানব, হাজার হাজার বছর আগে, সেই ম্লান ার পৃথিবীতে বসে লিখতেন, যা লিখলেন তার ইংরেজী :

Sky and earth are everlasting.
Men must die
Old age is a thing of evil
Change and die !

হাজার হাজার বছর পরে এই একই কথা, অন্য ভাষায়, অন্যভাবে লিখলেন কবীর, তি চাক্‌কি—'আকাশ আর মাটি, এই যাঁতার মাঝখানে নিয়ত পেষাই হচ্ছে মানবরূপী দানা। আর এই পেষাইয়ের ফলেই নির্গত হচ্ছে জীবনরস। 'যেতে হবে'—এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। যত দার্শনিকতা সবই এই 'যেতে হবে'র চিন্তা থেকে। আদি ব লিখলেন :

The odour of death,
I discern the odour of death
In the front of my body.

আসামাত্রই মায়ার জালে জড়িয়ে পড়া। জীবনের প্রেমে হওয়া। জীবন যেমনই হোক, ক ভালবেসে নাকানি চোবানি খাওয়া। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মৃত্যু ছায়া ফেলে নের মধ্য পর্বে। প্রথম দিকে নেশা। প্রথম দিকে ঘোর। মৃত্যুই মানুষকে দার্শনিক তোলে। জীবনের অসংলগ্নতা, স্বার্থপরতা, নীচতা ধুয়ে বের করে দেয়। জোহার কারণে বলছেন, ধার্মিক কে? Who are the pious?

Those who consider each day
As their last on earth.

জীবনের প্রতিটি দিনকে ভাবো আজই আমার শেষ দিন। কাল আমি থাকতেও পারি ও পারি। আধুনিক মানুষ ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে বড় বিব্রত বোধ করেন। বিজ্ঞানী রা। ধর্ম না কি কুসংস্কার। বেশ তাই হোক। পরমেশ্বরকে না মানি, মৃত্যুকে তো তেই হয়। অহরহ চারপাশে ঘটছে। এই ছিল এই নেই। এত বড় সত্যকে তো কার করা যায় না। অরণ্যচারী মানুষ, বিজ্ঞান যাদের জীবনের আলো ফেলেনি, রা মৃত্যুকে বললে, the great River Man Death। বললে,

I feel no fear
When the Great River Man

Death speaks of.

কতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। নিউজিল্যা
প্রাচীন একটি মাওরি কবিতায় কবি লিখছেন,

The tide of life glides swiftly past
And mingles all in one great
Eddying foam.

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জুন অবাক হয়ে দেখছেন :
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥

কবি নবীনচন্দ্রের অনুবাদ :

যথা নদীদের বহু অম্বুবেগ
সিন্ধু-অভিমুখী, প্রবেশ সাগরে,
তথা এই নরলোক বীরগণ
পশিছে জ্বলন্ত বদন নিকরে ॥

পতঙ্গের মতো জীবন মৃত্যুর আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥
যেমতি প্রদীপ্ত অনলে পতঙ্গ
পশে দ্রুতবেগে মরিবার তরে,
পশিছে নাশার্থ তথা প্রাণিগণ
দ্রুতবেগে তব বদন-বিবরে ॥

সভ্যতার উন্মেষকালের কবি লিখলেন :

Water does not refuse to dissolve
Even a large Crystal of Salt.

জীবনের দানা যত বড়ই হোক মৃত্যু-সাগরে লীন তাকে হতেই হবে। আর এই মৃ
হলো মানুষের শুভ কর্মপ্রেরণা। Each day the last day. যার আর পর নেই। যা ক
আজই সারো। সব গোছগাছ কর। ভেতর সাফা করে ফেল। অহং ছেঁটে ফে
Inaction থেকে action-এ এসো। অর্জুনের মতো গাণ্ডীব তুলে নাও হাতে।

আমি বৃদ্ধ-কালে লোক-সংহারক,
লোক সংহারেতে প্রবৃত্ত এখন।
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো

লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
অতএব উঠ! লভ তুমি যশ!
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।

ভোগী, যোগী, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, ত্যাগী আত্মসাৎকারী সকলেই ছুটছেন মৃত্যুর খোঁচায়। ওরে ছাদটা ঢালাই করে ফেল, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর, মামলার-দিনটা ফেলুন। সেরে ফেল, সেরে ফেল।

Not twice this day
Inch time foot gem
This day will not come again
Each minute is worth a priceless gem.

যে দিন গেল, সে দিন আর ফিরবে না। সময়ের ইঞ্চি, ফুট, রত্ন বিশেষ। দিন যায় আর আসে না। প্রতিটি মিনিট এক একটি মূল্যবান রত্ন। এ সবই তো মানুষের ভাবনা। মানুষেরই লেখনী-নিঃসৃত ভাব, ভাবনারাজি। কে ভাবছে? ভাবাচ্ছেই বা কে? ধ্বংসের শক্তি তো কম নয়, তাহলে গড়ে উঠছে কী করে!

দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী নতুন হলো কার হাতে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই সুন্দর গল্প—সাধু গিয়েছিলেন ভিক্ষা চাইতে। জমিদারের পেয়াদা পিটিয়ে অজ্ঞান করে পথে ফেলে দিলে। খবর পেয়ে অন্যান্য সাধুরা ছুটে এলেন। মুখে জলটল দেবার পর চেতনা এল। তখন সাধুরা জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমায় মেরেছে! প্রহৃত সন্ন্যাসীর উত্তর—যিনি এখন আমাকে জল দিচ্ছেন, সেবা করছেন, তিনিই আমাকে একটু আগে প্রহার করেছেন।

সেই ইজরায়েলী সন্ন্যাসীর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা স্মরণে আসছে। পর্যটনের পথে সেই রাব্বি দেখলেন, এক বৃদ্ধ পথের পাশে একটি ক্যারব গাছের চারা রোপণ করছেন। সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন, 'কত বছর পরে ফল দেবে?'

বৃদ্ধ বললেন, 'সত্তর বছর পরে।'

'সত্তর বছর? এত মেহনত করে গাছ পুঁতছেন, ফল খাবার জন্যে সত্তর বছর বাঁচবেন আপনি?' বৃদ্ধ বললেন, 'পৃথিবীতে আমি যখন প্রবেশ করলুম, কই পৃথিবীকে আমি শূন্য দেখিনি তো। আমার পিতা আমার জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। ফুল, ফল, বৃক্ষ। আমিও তাই করে রেখে যাচ্ছি। যারা আসছে আমার পেছনে তারা এর ফল ভোগ করবে।'

ঈশ্বরকে মানার প্রয়োজন নেই। ধর্ম বাতিল। নীতি—খাও, দাও আর ফূর্তি কর। কিন্তু কোথায়? এই পৃথিবীতে নিশ্চয়। তাহলে বাসোপযোগী পৃথিবীর প্রয়োজন আছে। তাহলে অথর্ববেদের ঋষি কী খারাপ বলেছিলেন! অন্যায় কী বলেছিলেন?

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ
শান্তি রোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ
সর্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।

তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়াম্যহঃ যদিহ
ঘোরং যদিহ ক্রুর যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং
সর্বমেব শমস্তু নঃ ॥

পৃথিবী শান্তি, অন্তরিক্ষ শান্তি, দ্যুলোক শান্তি, জলসমূহ শান্তি, ওষধিসমূহ শান্তি, বনস্পতিগণ শান্তি, বিশ্বদেবগণ শান্তি, সমস্ত দেবতারা শান্তি, শান্তি, শান্তি। সেই সব শান্তি দ্বারা যা এখানে ঘোর, যা এখানে ক্রুর, যা এখানে পাপ তা আমরা শান্ত করি ; তা শান্ত হোক, তা কল্যাণময় হোক, সমস্তই আমাদের শুভ হোক।

কে চায় অশান্তি, অরাজকতা, নীতিহীনতা ! কে চায় পরিবার, সমাজ, দেশ খুলে খুলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যাক ? প্রতি মুহূর্তের আতঙ্ক কে চায় ! আমরা ভালবাসার পৃথিবীতে বাঁচতে চাই। যতই আমরা স্বার্থপর হই না কেন, পরিবারের বাইরে, সমাজ থেকে দূরে আমরা বাঁচতে পারব না। তা যদি পারা যেত তাহলে আমরা সকলেই সন্ন্যাসী হয়ে যেতুম। সেই অরণ্যের কাল থেকেই যূথবদ্ধ হবার চেতনা আমাদের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। সভ্যতার উন্মেষকালে আমাদের অরণ্যচারী পূর্বপুরুষগণ মানুষের শ্রেষ্ঠ আচরণবিধির যে নির্দেশ রেখে গেছেন, তা আমরা ফেলে দিতে পারি। তবে দুঃখের সঙ্গে ফেলতে হবে। এই জেনে ফেলতে হবে, আমরা পথ ভুলেছি। কী ছিল সেই নির্দেশ

১। সব সময় ভালো হওয়াই ভালো।

২। প্রেম ছাড়া জীবনে আর কী আছে ?

৩। প্রাণ-সংহারে কী লাভ ?

৪। অন্যের সাহায্যে আসার চেষ্টা কর।

রাব্বি জেরেমিয়া এই একই কথা বলেছিলেন দীর্ঘকাল পরে, আজ থেকে দীর্ঘকাল আগে :

সম্প্রদায়ের বিপদকালে কখনও বল না, 'আমি বাড়ি চললুম, খাই দাই, আমার আত্মা, তুমি শান্তিতে থাকো।' মানুষের ধর্ম হলো অন্যের বিপদে সামিল হওয়া, যেমন মোজেস হতেন। বিপদে যে অংশ নিতে জানে, সে নিজের শান্তি সহজে খুঁজে পায়। সে-ই প্রকৃত মানব।

৫। নিজের স্ত্রীকে গালাগাল দিও না। দুর্ব্যবহার করো না। নারী জাতি বড় পবিত্র। স্বামীজী কী বলেছিলেন ! চণ্ডী কী বলছেন, স্ত্রীয়াঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।

৬। সৎ কাজের প্রতিদান অন্যের ভালবাসা।

৭। শিশুদের প্রতি অন্যায় আচরণ করো না।

৮। জুয়া খেলো না।

৯। অসহায় বৃদ্ধের সাহায্যে এগিয়ে এস।

১০। গৃহে অতিথির আগমন হলে সাধ্যানুযায়ী সৎকার করো। যে খাদ্য তাকে দিলে না, সেই খাদ্য গ্রহণে তোমার মৃত্যু হতে পারে।

১১। নিজের কাজের ফিরিস্তি দেবার সময় সাবধান। যা করনি তা করেছ বলে

বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করো না। অসত্যভাষণ তোমার মৃত্যুকে কাছে এগিয়ে আনতে পারে। সত্যই হলো ধর্ম। সত্যই জীবন। যা করেছ তার চেয়ে কম বলাই ভালো। প্রবীণরা বলেন, সেই আচরণই প্রমাণ করবে, তুমি জ্ঞানী।

১২। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখো। তাহলে প্রেমের দুনিয়ায় বসবাস করতে পারবে।

১৩। বিবাহবন্ধনে একজনের সঙ্গেই আবদ্ধ হবে।

১৪। স্বামীকে মেজাজ দেখিও না। ভালো ব্যবহারের প্রতিদান ভালো ব্যবহার।

১৫। ভালবাসি, ভালবাসি, মুখে বললেই সন্তানদের ভালবাসা হলো না। আচরণে প্রকাশ কর।

১৬। লোকদেখানো ভালবাসায় ভালবাসা নেই। অন্তরে তা প্রকাশ কর।

১৭। জীবনের পথে চলতে চলতে সহযাত্রীদের সুখী করার চেষ্টা করো। কোনো মহিলাকে নির্জনে একা পেয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না। কোনোও ক্ষতি করো না।

১৮। তোমার [মহিলা] উপস্থিতিতে পরিবারের কেউ অন্যের কাছে কিছু চাইলে, মনে করবে তোমার কাছেই চাইছেন। কিছু করার থাকলে বলার আগেই করে ফেল। বলার অপেক্ষায় থেক না।

অরণ্যের যুগ থেকে চড়া সভ্যতায় এসে আমরা সব শিখলুম, ভুলে গেলুম একটি জিনিস, একটি বিদ্যা চলে গেল আয়ত্তের বাইরে, সেটি হলো বেঁচে থাকার সুস্থ কৌশল। বাঁচাটাই আমরা ভুলে গেলুম। সোস্যালিজম, ইজমের ছড়াছড়ি, অথচ সুখী মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমছে। সংসার ভাঙছে, সমাজ ভাঙছে। সুইট হোম নামেই। ভেতরে ধিকি ধিকি আগুন। বিবাহ-বিচ্ছেদ, শিশু অপরাধ-প্রবণতা, আত্মহত্যা, হত্যা, উন্মাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অধিকাংশ মানুষই অস্বাভাবিক। নিষ্ঠুর, আত্মকেন্দ্রিক, লোভী। নড়বড়ে রাষ্ট্রযন্ত্র। একদিকে প্রবল ভোগের দুনিয়া, আর একদিকে সীমাহীন দুর্ভোগ। মাঝে মিথ্যা আশ্বাসের সমুদ্র। সেতু নেই। কথা আছে, কাজ নেই। ব্যস্ত দিন, ভয়াবহ রাত। ধ্বংসের ইঙ্গিত।

মহাভারতকার বলে গেছেন ॥

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্ ভূতং স্থাবরজঙ্গমম।
পুনঃ সংক্ষিপ্যতে সর্বং জগৎপ্রাপ্তে যুগক্ষয়ে॥

প্রলয়কালে স্থাবর জঙ্গম সবই আবার লয় পাবে। যেমন ঋতু। আসার আগে জানান দেয়। সেই রকম যুগারম্ভও টের পাওয়া যায়। যুগশেষেরও লক্ষণ ফোটে।

যথর্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যের তথা ভাবাযুগাদিষু॥

আমরাও হয়তো যুগ-সন্ধিতে এসে পড়েছি। লক্ষণসমূহ বড় স্পষ্ট। সমস্ত বস্তু তার স্বধর্ম হারিয়ে ফেলেছে। বিভ্রান্তি বিস্মৃতি আমাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। সুখের চাবিকাঠি হারিয়ে ফেলেছি। সবই আছে, নেই সুখ। দেহকে সুখে জরজর করে রাখলেও মন যদি সুখী না হয় তাহলে সুখ মায়ামৃগ হয়েই থাকে। ধম্মপদে গৌতম বুদ্ধ বলছেন,

আজ আমরা যা, তা হয়েছে পূর্বের চিন্তা থেকে। What we are today comes from our thoughts of yesterday. আজকের চিন্তা তোর করবে আগামীকালের জীবন। মনই তৈরি করে জীবন। Our life is the creation of our mind.

আজকের মন দেখলে আগামী কালের জীবনের চেহারা কী দাঁড়াবে বোঝা যায়। আশঙ্কা হয়। এক 'জেন' শিক্ষক বলেছিলেন, 'আমার বুকের কাছটা আগুনের মতো জ্বলছে ; কিন্তু আমার চোখ দুটো শীতল, পোড়া ছাইয়ের মতো।' আধুনিক মানুষের জন্যে তিনি কিছু নির্দেশ রেখে গেছেন। আমরা পালন করে দেখতে পারি। হৃদয়ের জ্বালা জুড়োয় কী না ! মৃত চোখে জীবনের জ্যোতি ফিরে আসে কী না।

॥ নির্দেশ ॥

প্রাতে একটি ধূপ জ্বেলে সামান্য ধ্যান।

বিশ্রাম প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে।

নির্দিষ্ট সময়ে বারে বারে অল্প অল্প খাদ্য গ্রহণ।

গুরু আহার বর্জনীয়।

নিজের তৈরি নির্জনতায় বসবাস। মনে, বনে, কোণে। সঙ্গেও নিঃসঙ্গ। যা বলছি তার দিকে লক্ষ্য রাখা। যা বলছি তা পালন করা।

সুযোগ হাতছাড়া না করা। অথচ কিছু করার আগে দুবার চিন্তা করা। অতীতের জন্য অনুশোচনা নয়। ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা।

বীরের মতো নির্ভীক অথচ শিশুর মতো প্রেমিক হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।

বিশ্রামের সময় এমন নিদ্রা, মনে হবে এই আমার শেষ নিদ্রা।

শয্যা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ। আর ফিরেও তাকাবে না, ছিন্ন পাদুকার মতো পরিত্যাগ।

একাল আমাদের সবই শেখাবে। ধন-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, শেখাবে না জীবন-বিজ্ঞান। সদ্‌গুরুর আশ্রয় ছাড়া এ শিক্ষা আসবে কোথা থেকে :

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।
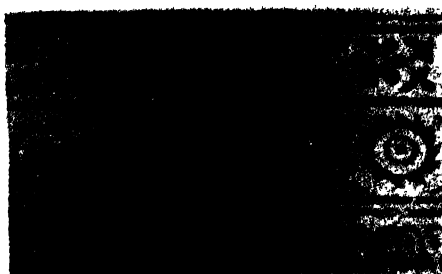
'মন মত্তকরী'

সবাই বসে আছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তখন সাধন-জগতের এক উচ্চ মণ্ডলে অবস্থান। তিনি সমাধিস্থ। বসে আছেন রাখাল, পরবর্তী কালের স্বামী ব্রহ্মানন্দ। রাখাল হঠাৎ বললেন : "মন-মত্তকরী।"

অবশ্যই। কোন সন্দেহ নেই। ভিতরে নড়ছে-চড়ছে আর দেহ তার খিদমত খাটছে। রামপ্রসাদ দুঃখ করছেন : "মন-গরিবের কি দোষ আছে।" ঠাকুর রামপ্রসাদকে বড় ভালবাসতেন। প্রায়ই উল্লেখ করতেন তাঁর জীবনদর্শনের।

রামপ্রসাদ লিখছেন :

মন তুমি কি রঙ্গে আছে।
(ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ)
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুখে নাচ॥
রঙের বেলা রাঙে কড়ি,
সোনার দরে তা কিনেছ।
ও মন, দুঃখের বেলা রতন মানিক,
মাটির দরে তা বেচেছ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা,
সেই রূপে মন মজায়েছে।
যখন সে রূপে বিরূপ হবে,
সে রূপের কিরূপ ভেবেছ॥

"তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ।" দুঃখে রোদন সুখে নাচাটা তবু সহ্য হয়। ঠিক আছে, ঐটাই যুগ যুগ ধরে জীবের স্বভাব-ধর্ম ; কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এই ফেরা ঘোরা ? এ যে মহাযন্ত্রণা। মন-মাছি ভন ভন, ফন ফন করে উড়ছে। ঠাকুর আমাদের মনের স্বরূপ আমাদের কাছেই উদঘাটন করে দিচ্ছেন : মন কেমন ? (১) মনটি যেন মাটি-মাখানো লোহার ছুঁচ, (২) সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে। (৩) বজ্জাৎ 'আমি'। সেটা কে ? যে 'আমি' বলে, 'আমায়' জানে না।

আমার এত টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরি করে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লও, তারপর চোরকে খুব মারে; তাতেও ছাড়ে না, পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিসে দেও ও ম্যাদ (মেয়াদ) খাটায়, 'বজ্জাৎ আমি' বলে জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে। এত বড় আস্পর্ধা! (৪) মন যেন সাধারণ মাছি, সন্দেশেও বসে আর পচা ঘায়েও বসে, বিষ্ঠাতেও বসে। (৫) মন কাম-কাঞ্চনে। (৬) কত রকমের 'আমি' কাঁচা আমি, বজ্জাত আমি, পাকা আমি। 'পাকা আমি' কেমন—(ক) বালকের আমি, (খ) ঈশ্বরের দাস আমি, (গ) বিদ্যার আমি। (৭) আমি—সে কেমন? (ক) অবিদ্যার আমি, (খ) কাঁচা আমি। তার স্বরূপ? একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সাচ্চদানন্দ সাগরের জলে ঐ লাঠি। জলকে দু-ভাগ করেছে। আর 'ঈশ্বরের দাস আমি', 'বালকের আমি', 'বিদ্যার আমি' জলের ওপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে—শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দুভাগ জল। বস্তুতঃ এক জল দেখা যাচ্ছে। (৮) মন নিয়ে কথা। মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ হবে। মনেতেই জ্ঞান, মনেতেই অজ্ঞান। অমুক লোক খারাপ হয়ে গেছে অর্থাৎ অমুক লোকের মনে খারাপ রঙ ধরেছে। (৯) মন নিজের কাছে নাহি। নিজের কাছে মন থাকলে তবে তা ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছে; কাম-কাঞ্চনে বন্ধক। তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার।

মনস্তাত্ত্বিক ঠাকুর আমাদের মন চুরমার করে দিয়ে গেছেন। ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন বিচার। হুঁশ 'ইনজেক্ট' করে দিয়েছেন। বেতালা পা পড়লেই ভিতরটা হায় হায় করে ওঠে। একালের মিছিল স্লোগান দেয়—চলছে না, চলবে না। সেইরকম মন মনকে দেখে বলে ওঠে—হচ্ছে না, হবে না। ওভাবে হবে না। বদ্ধ ঘরে চড়াই পাখির মতো ফরফর করে মন উড়ছে। ধরে বসানো যাচ্ছে না। কোথায় বসানো? ত্যাগের পিঁড়িতে। বাইরে ত্যাগ নয়, ভিতরে ত্যাগ। চাই না, সত্যিই কিছু চাইনা। বিষয়ের জন্যে, ভোগের জন্যে, ক্ষমতার জন্যে, যশ-খ্যাতির জন্যে অন্তরে দগ্ধ হই না। রবারের থলেতে দামাল তুলোর মতো, এদিকে চেপে ধরলে ওদিকে ঠেলে ওঠে না!

সম্রাটের মতো মন বসে আছে মনের আসনে। তৈলধারার মতো গড়িয়ে চলেছে ইষ্টপদের দিকে। অচল, অটল। মন নিয়ে মহা লাঠালাঠি। অবোধ, নির্বোধ বালকের মতো, চেনে বাঁধা বাঁদরের মতো তিড়িং বিড়িং। এমন মন তো কোন সত্যের ধারণা করতে পারবে না।

রামপ্রসাদ বলছেন :

> বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে
> স্বভাব হবে পরিপাটি।
> কর মনকে ধোলাই, আপন বালাই
> মনের ময়লা ফেল কাটি।
> কালীদহের কূলে চল,
> সে জলে ধোপ হবে ভাল।
> পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল,

চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি ॥

চৈতন্যের ভাঁটি, চৈতন্যের আগুন জ্বেলে সব পাপ পুড়িয়ে ফেল, আর চল, নিজেকে নিয়ে বসাই কালীদহের কূলে।

তুলসীদাস বলছেন :

যো পরবিত্ত হবে সদা,
সো কহু দান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার করে সদা,
সো কহু তীর্থ গয়া ন গয়া ॥
যো পর আশ করে সদা,
সো বহু দিন জিয়া ন জিয়া।
যো মুহুমে পরচুকলি ওগারত,
সো মুহুমে হরিনাম লিয়া ন লিয়া ॥

নিরন্তর যে পরস্বহারী সে দান করল কি না করল, দুই সমান। নিরন্তর পরদারগামী, তার তীর্থে যাওয়া আর না যাওয়া। পরপ্রত্যাশীর মরা বাঁচায় কিছু যায় আসে না। আর পরনিন্দাকারীর হরিনাম করাও যা না করাও তাই। সবই ভস্মে ঘি ঢালা।

নলখাগড়ার বন, ঘোলা জল, সরীসৃপের বিচরণ, ব্যাঙাচির লাফ, তারই মধ্য দিয়ে যেতে হবে সাবধানে। একটু একটু করে সরিয়ে সরিয়ে, প্রখর দৃষ্টি, সজাগ মন। ছুঁচে সুতো পরাবার সময়ের তীক্ষ্ণ মন। একমুখী মন। কাম-কাঞ্চনে বন্ধক মন নিয়ে কি করা দরকার? ঠাকুরের নির্দেশ :

"সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার। মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন-ভজন হবে। সর্বদাই গুরুর সঙ্গ, গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জনে রাত-দিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসঙ্গ। মন একলা থাকলে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়। এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গাজলের ভিতর যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখ তাহলে শুকবে না। কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল। আবার আলাদা করে রাখ, যেমন কালো লোহা, তেমনি কালো। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়। আমি কর্তা, আমি করছি, তবে সংসাচর চলছে; আমার গৃহ পরিজন—এসকল অজ্ঞান! আমি তাঁর দাস, তাঁর ভক্ত, তাঁর সন্তান—এ খুব ভাল। একেবারে 'আমি' যায় না। এই বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছ, আবার কাটা ছাগল যেমন একটু ভ্যা ভ্যা করে হাত পা নাড়ে, সেইরকম কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। তাঁকে দর্শন করবার পর, তিনি যে 'আমি' রেখে দেন, তাকে বলে 'পাকা আমি'। যেমন তরবারি পরশমণি ছুঁয়েছে, সোনা হয়ে গিয়েছে।" আবার সর্তক করছেন ঠাকুর এইভাবে : "হাতির বাহিরের দাঁত আছে আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাহিরের দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি ভিতরে ভোগ করলে ভক্তির হানি হয়।" ঠাকুর বলছেন : "শকুনি উপরে ওঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। হাওয়াই হুস করে প্রথমে আকাশে উঠে যায় কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায়।" বাইরে থেকে মন দেখা যায় না। বসে আছে অন্দরমহলে। সেখানে হাসছে, সেখানে

কাঁদছে, বসে বসে কালনেমির লঙ্কা-ভাগ করছে। ভাঙছে-চুরছে। কতকাল আগে মজার একটি কবিতা লিখেছেন ই. এ. রবিনসন :

RICHARD CORY

[উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা গেল না]

"Whenever Richard Cory
went downtown,
We people on the pavement looked at him :
He was a gentleman from
sole to crown,
Clean favoured,
and imperially slim.

And he was always quitely arrayed,
And he was always
human when talked;
But still he fluttered pulses
when he said
"Good Morning" and
he glittered when he walked.

And he was rich—yes,
richer than a king
And admirably schooled
in every grace :
In fine, we thought that
he was everything
To make us wish that
we were in his place.

So on we worked and
waited for the light,
And went without the meat,
and cursed the bread;
And Richard Cory,
one calm summer night

Went home and put a
bullet through his head."

এই 'Isolation'-এর কথাই ঠাকুর বলছেন তাঁর অনবদ্য অসাধারণ ভাঁড়ের উপমায়। চিত্ত ... ক জল শুকিয়ে যায়। কত কি ? তবু 'প্রাণ কেন কাঁদে রে।' রিচার্ড কোরির ... অবশেষে একটি বুলেট কপালে। ঠাকুর আমার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ্। বলছেন, শোন, ঐ নরেন (স্বামীজী) গাইছে :

সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম
শ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ,
সে পান্থ-নিবাসীজনে ॥

'দি বুক অফ ফাইভ রিংস'-এ আছে—'হেইহো কোকোরো মোচি নো কোতো'। 'হেইহো' জাপানী সাধনধারা, বুদ্ধ প্রভাবিত। মনই যেখানে মানুষের তরবার। ঠাকুর যে-তরবারে পরশমণি ছোঁয়াতে বলেছেন, সেই মনের সাধনা 'হেইহো'। পরিষ্কার নির্দেশ : "Keep your mind on the centre and do not waver. Calm your mind, and do not cease the firmness for even a second. Always maintain a fluid and flexible, free and open mind. Even when the body is at rest, do not relax your concentration."

তাহলে, চলে আসি আবার প্রথমে। রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলছেন : "মন-মত্তকরী !"

ঠাকুর বলছেন : 'ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়! জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান ? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।"

আর ঐ সিংহ। ঐ তো প্রহরী, "পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে।" ঠাকুর বলছেন : "সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে।"

সাবধান

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন এদের থেকে খুব সাবধান, যেমন 'প্রথম বড় মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলেই অনিষ্ট করতে পারে। তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে সায় দিয়ে যেতে হয়।' খাঁটি কথা। আর একজন সন্তও এই কথা বলে গেছেন, 'বইঠকে বইঠকে, হ্যাঁ জি, হ্যাঁ জি, করতে রহিয়ো।' প্রতিবাদ করেছ কি অকারণ ঝামেলায় জড়িয়ে মরেছ। তা বড় মানুষ মানেই কর্মস্থলের বড়কর্তা। তিনি হলেন গিয়ে অন্নদাতা। তাঁর কৃপাতেই আমাদের লপচপানি। বউয়ের টাঙ্গাইল শাড়ি, ছেলের ইংলিশ এডুকেশন, খানায় মুরগীর ঠ্যাং, চোখে গগলস, পরনে চোস্ত পাজামা পাঞ্জাবি। তাঁর ঘরে যখন সভা বসে তখন মনের নোটিস বোর্ডের দিকে একবার তাকাতেই হয়—সাবধান বড় মানুষ, প্রভূত ক্ষমতা রে ভাই। এক টুসকিতে তোমার হাঁড়ি শিকেতে তুলে দিতে পারেন, পায়ের তলা থেকে সরিয়ে দিতে পারেন তোমার বিচরণ ভূমি। তিনি যা বলেন তাই সত্য। হ্যাঁ জি, হ্যাঁ জি। কে না জানে, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। তিনি সন্তুষ্ট হলে জগতের কল্যাণ। আমার জগৎ তো আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নয়। বড় জগৎ নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার জগৎ আমার পরিবারটুকু। সেই পরিবারের কল্যাণে মাসের শেষে এক গোছা কারেনসি নোট চাই। বড়কর্তার তালে তাল দিতে পারলে কেয়াবাত। ফ্যামিলিতে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলবে। মেয়ের বিয়েতে জোড়া সানাই বাজবে। জীবিকাই তো আমাদের ডিফেন্স-ড্যান্স। তালে লয়ে নাচতে হবে। বড়কর্তা গোঁ ধরবেন, আর আমরা নেচে যাবো মিস্টার ঘোষ, মিস্টার বোস, মিস্টার মিত্তির। কেউ বুঝতেই পারে না, এক এক সময় আমরা কেমন অক্লেশে বাঁদরের ভূমিকায় নেমে আসি। তিনি খেলান আর আমরা খেলি। তিনি মনে করেন—বাঃ এই বাঁদরটা বেশ ভালো নাচে, দাও ওটাকে প্রোমোশান দিয়ে। সেই বাঁদরটা অমনি ম্যানেজার হয়ে গেল। গোছায় গোছা যোগ হল। মানে নোটের গোছায়। পরিবারের সুখ বাড়ল। আর একজন বিদ্যের জাহাজ। সে ওই বড় মানুষটির প্রতিবাদ করেছিল, 'আজ্ঞে না, আপনি যা বলছেন, তা আমি মানতেই রাজি নই। আপনি জানেন না।' বড়কর্তার মুখ একটু লালচে হয়েই কালো হয়ে গেল। তিনি একবার হাঁ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। সেই বিশ্বরূপ দর্শন হল প্রভুর মুখগহ্বরে। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কর্মচারি

আর তাদের পরিবারবর্গ। তিনি চিউইংগামের মতো চিবোতে লাগলেন। চোয়ালের হাড় বারকয়েক উঁচু নিচু হল। বোঝা গেল কি হতে চলেছে সেই অবোধ প্রতিবাদকারীর। ধীরে ধীরে তাকে 'অফ' করে দেওয়া হবে। চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে টুল দেওয়া হবে। তখন [illegible] ছেড়ে তার বারান্দায় অবস্থান। মডার্ন ম্যানেজমেন্টের ভাষায় একে বলে, '[illegible]র সার্ভিস।' হয় ছাড়পত্র দিয়ে মালপত্র নিয়ে মানে মানে বিদেয় হও, নয় তো [illegible]সে বসে অপমান হজন করো। প্রভু, আমরা কলম ব্যবহার করি কলম হিসেবে। আপনার কলম হল 'বেয়নেট'। এক খোঁচায় বিদ্যের জাহাজের ভরাডুবি। বিদ্যের জাহাজ যদি সংসার অর্ণব পাড়ি দিতে না পারে, তখন জাহাজের কি প্রয়োজন। তাই প্রভু, আর কিছু চাইনা, তোমার কৃপায় রাঙঝাল একটু দাও, ফুটোফাটা বন্ধ করে অন্তত একটু ভেসে থাকি। থেকে থেকে ভোঁ মারি। বেঁচে থাকার ভোঁ।

সংসারে আমাদের স্ত্রীরাও খুব বড় মানুষ। সেখানেও হ্যাঁ জি, হ্যাঁ জি, চালাতে না পারলে অস্তিত্ব বিপন্ন। তুমি যন্ত্রী দেবী, আমি যন্ত্র। স্ত্রী যদি বলে, 'তোমার মতো গর্দভ, দুনিয়ায় দুটো নেই।' 'ঠিক বলেছো ম্যাডাম'। পরেরটা উহ্য, 'তা না হলে তোমার কাছে ধরা দি।' ফ্রয়েডকে প্রশ্ন করা হল, 'আপনি তো মানব-মনস্তত্ত্বের একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত, আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর কোনওদিন মনোমালিন্য হয়েছিল?'

ফ্রয়েড বললেন, 'জীবনে একদিন। শোবার ঘরের মাথার কাছে একটা জানালা খোলা নিয়ে! স্ত্রী বলেন খুলবো, আমি বলি খুলো না, মাথায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে। মাঝরাতে হাতাহাতি হয় আর কি। শেষে বাঁচিয়ে দিলে একটা টুপি।'

টুপি?'

'হ্যাঁ যে টুপি মানুষ অন্যকে পরায় সে টুপি নয়, সত্যিকারের একটা উলের টুপি। টুপিটা মাথায় পরে সুখের নিদ্রা।'

'তা আপনার সুখী দাম্পত্য জীবনের রহস্যটা কি?'

অতি সহজ, হ্যাঁ জি, হ্যাঁ জি, করতে রহিয়ো।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরবর্তী সাবধান বাণী—'কুকুর। কুকুর হইতে সাবধান। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতোতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে তোর চোদ্দ পুরুষ, তোর হেনতেন, বলে গালাগালি দেবে। তাকে বলতে হয় কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুশি হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।'

সাবধান: কাদের থেকে সাবধান—বড়মানুষ, কুকুর, ষাঁড় আর মাতাল। সব এক গোত্রর।
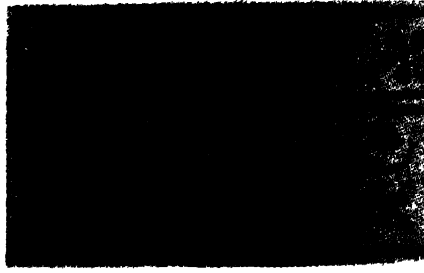
শয়নে স্বপনে-জাগরণে

গৃহী কি সন্ন্যাসীর মতো সংসারে থাকতে পারে। গৃহী অথচ সন্ন্যাসী। নিশ্চয় পারে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তো সেই কারণেই এসেছিলেন। এসেছিলেন গৃহীকে পথ দেখাতে মানুষ বিশেষত কলকাতার মানুষ সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত এক করুণা ছিল। শ্রীশ্রী সারদাদেবীকে, যাওয়ার আগে, আমাদের ছেড়ে মহাপ্রয়াণে যাওয়ার আগে, একটি অনুরোধ করেছিলেন, 'দ্যাখো, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতে কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।'

সংসারের কাম-ক্রোধাদি অন্ধকারে লোক না পোক। মতুয়ার বুদ্ধি নিয়ে মশগুল হ আছে। সকলেই ভাবছে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। মূলো খেয়ে মূলোর ঢেঁকুর তুলছে ভাবছে বেশ আছি। এই তো বেশ। সংসারার্ণব ঘোরে লাট খাচ্ছে, শত শত জীব হাসছে, কাঁদছে। দুঃখ, শোক, জরা, ব্যাধি। আত্মার অবমাননা। অষ্টপাশে ব অহংকারের পুঁটলি। নিত্য ভুলে অনিত্য নিয়ে মাতামাতি। যখন বোঝা গেল, তখ অনেক দেরি হয়ে গেছে। ডাক এসে গেছে। বাঁশ পেকে গেছে। কাঁচা বাঁশই নোয়ানে যায়। পাকা বাঁশ ভেঙে যায় পটাশ করে। মাটির হাঁড়ি পুড়ে পাকা হয়ে গেলে, নতু আর কোনও আদল দেওয়া যায় না।

ঠাকুরের দৃষ্টি ছিল সবদিকে। সংসারী মানুষকে তিনি কড়া নজরে রেখেছিলেন, ছে অহংকারের কত রকমের প্রকাশ। মায়া জীবকে নিয়ে কেমন বাঁদর নাচ নাচাচ্ছেন। সে দর্শনের পরেই অভিযোগ, মাগছেলের জন্যে লোকে একঘটি কাঁদে। অথচ দারা পুত্র পরিবার, কেহ নয়, কে তোমার। প্রেয়সী। কে তোমার প্রেয়সী বাপু। মরে দেখো ভূতের যদি জ্ঞানচক্ষু থাকে, তাহলে সে দেখতে পাবে, সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গ হবে বলে। বড় ছেলে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসবে, বাবার ভূত ঘাড় না মটকায় সেই মাগছেলের জন্যে ঘটিঘটি অশ্রু বিসর্জন। দ্বিতীয় কান্নার বস্তু হল টাকা। টাকা জন্যে লোক কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। যেন টাকাই জীবন। টাকায় মরণ-বাঁচন। পৃথিবীতে এলে কেন? না, টাকা কামাতে? ঠাকুরের প্রশ্ন, 'টাকায় কি হয় বাপু' নিজেই উত্ত দিচ্ছেন, জ্ঞানচক্ষু খুলে দিচ্ছেন, 'টাকায় কি হয়? ভাত হয় ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবা জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পা

।—এর নাম বিচার, বুঝেছ?'

বিষ্ঠাকে ঘৃণা করে মানুষ বললে, 'তুই নীচ অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য, দুর্গন্ধ, আবর্জনা।'

বিষ্ঠা বললে, 'প্রভু। তুমি যে আমার চেয়েও নীচ, নীচতম। তোমার সংস্পর্শেই আমার এই অবস্থা। আমি তো দুর্মূল্য, স্বাদু, খাদ্যবস্তু ছিলুম। তোমার সংসর্গেই আমার দুর্গতি।' টাকায় আর বিষ্ঠায় তফাৎ কোথায়? যে টাকা ঈশ্বর সেবায় ব্যয়িত হয় নিজের ভোগেই লাগে, সে অর্থ বর্জ্য-পদার্থের মতই ঘৃণ্য। সঙ্গ দোষে ব্রাত্য।

ঠাকুর বলছেন, 'বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। বস্তুবিচার। এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে। বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র—এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?'

তুলসীদাস আরও কড়া ভাষায় সাবধান করছেন

দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে, ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥

দিনে যে মোহিনী, রাতে সে-ই বাঘিনী। মুহুর্মুহু রক্ত শোষণ করে। আর জগতের লোক কি করছে, উন্মত্ত হয়ে গৃহে গৃহে সেই বাঘিনীকে প্রতিপালন করছে। মহিলারা হয় তো দুঃখ পাবেন। ভাববেন তাঁদের বুঝি ছোট করা হল। তা নয়, এ হল সাধনের কথা। সাধনজগতের কথা। নারীরাও জানেন তাঁদের কি সাংঘাতিক মোহিনী শক্তি। সংসারে যাঁরা মজে থাকতে চান, তাঁরা থাকুন না। কে বারণ করছে। ঠাকুরের সান্নিধ্যে এমন মানুষও এসেছিলেন, যিনি বন্ধুকে বলছেন, তুমি তাহলে এই ব্যাড়োর ব্যাড়োর শোনো, আমার একটু কাজ আছে, ইমপর্টান্ট বিজনেস, আমি যাই। এমন 'মানুষ' দেখলেই ঠাকুর চিনতে পারতেন, আর বলতেন, যাও, যাও, রাসমণির বিল্ডিং-টিল্ডিং দ্যাখো, বাগান দেখ। আর যাকে দেখে মনে হত অন্বেষণ জেগেছে, তাকে কাছে ডেকে বসাতেন। ঠাকুর তুলসীদাসের মতোই জানতেন

ওছে নরকি পেটমে, রহে ন কোটি বাৎ।
আধ সের পাত্র মে, কৈসে সমাৎ॥

যে, ভাঁড়ে আধ সের মাত্র ধরে, সে-ভাঁড়ে কদাচিৎ একসের ঢালা উচিত নয়, সেইরকম সামান্য অর্থাৎ বিষয়ী মানুষের উদরে ভাবভারপূর্ণ বাক্য কখনই স্থান পায় না। অপাত্রে দান পণ্ডশ্রম। সব মহাপুরুষেরই এক বাণী ; কারণ সত্য এক, ঈশ্বর এক। জেন বুদ্ধধর্মের মহাপুরুষদেরও একই শিক্ষা, আর একটু বিস্তারিত। গল্পাকারে। যেমন,

এক অহংকারী জেনারেল এসেছেন মঠাধ্যক্ষের কাছে। কোমর থেকে খাপসুদ্ধ তরোয়াল খুলে তাঁর টেবিলের উপর ঠকাস করে রেখে চালিয়াতের মতো বললেন, শুনলুম, মানুষকে খুব জ্ঞানট্যান দিচ্ছেন। সেই জ্ঞানে সব জীবনধারা বদলে যাচ্ছে, মানুষ শান্তি পাচ্ছে। তা দেখি, সেই জ্ঞান ও অজ্ঞান। আমাকে একটু ছাড়ুন তো।'

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই চ্যাটাং-চ্যাটাং কথায় সামান্যতম উষ্ণ হলেন না।

তিনি বললেন, 'আপনি আমার অতিথি, দূর থেকে আসছেন, আগে এক কাপ চা

খান'। এই বলে, তিনি ভর্তি এক কাপ চা আনলেন। হাতে একটা কেটলি। ভর্তি কাপ জেনারেলের সামনে রেখে, সেই কাপেই কেটলি থেকে হুড়মুড় করে ঢালতে লাগলেন কাপ উপচে টেবিলে, টেবিল থেকে গড়িয়ে মেঝেতে।

জেনারেল তাঁর কাণ্ড দেখে বললেন, 'করছেন কি ? আপনি পাগল ? ভর্তি কাপে চা ধরে ?' সন্ন্যাসী হেসে বললেন, 'আমি ওই কথাই বলতে চাইছি তো। কাম ক্রোধ খালি কাপ হয়ে আসুন, তবেই তো আমি জ্ঞানের চা ঢালতে পারব। ইউ আর ফু অহংকারে টরটম্বুর।"

তুলসীদাসজী বলছেন :

যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহি, যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম।
দোনো এক নাহি মিলে, রবি রজনী এক ঠাম॥

যেখানে কাম সেখানে রাম নেই, যেখানে রাম সেখানে কাম নেই। রাম আর কা এক জায়গায় থাকতে পারে না, যেমন দিন আর রাত। আলো থাকলে অন্ধকার থাকে না, অন্ধকার থাকলে আলো ?

এত কথা হল এই কারণে, সংসার, মায়া। যাঁরা মজে থাকতে চান থাকুন। তুলসীদা এক কথায় ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন :

শাকট সুকট কুকুরা, তিনকে মত এক।
কোটি ভাঁতি সমাঝও, তো ন ছোড়ে টেক্॥

পাষণ্ড, শূকর, কুক্কুট এই তিনের মত এক। কোটি কোটি সদুপদেশ, নম্র প্রিয়বাক যতই বর্ষণ করো, কিছুতেই নিজের জেদ ছাড়বে না।

কিন্তু, যাঁরা তাঁকে চান, ঠাকুরকে চান, তাঁদের প্রথম প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধির। ঠাকু স্পষ্ট, 'চিত্তশুদ্ধি না হলে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়ল পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বুক টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বক টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়।'

দেহশুদ্ধি আর চিত্তশুদ্ধি দুটি বড় কথা। দেহশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মচর্যের, আ চিত্তশুদ্ধির জন্যে নির্মল চিন্তার প্রয়োজন। ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা কে জ্ঞানের আলো, তোমার নিজের ওপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।'

কি সন্ন্যাসী কি গৃহী, পথ তো সেই এক, 'রয়াল রোড'। দেহ আর মনে বিশু হও। আর কী ? মনে বনে কোণে, কারোকে দেখাবার প্রয়োজন নেই, হাঁকডাক করা প্রয়োজন নেই, তুমি আছ, 'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম।' আর কী ? আবার তুলসীজীকে স্মরণ করি,

এক ঘড়ি আধি ঘড়ি, আধি হুমে আধ্।
তুলসী সঙ্গত সন্তকি, হরে কোটি অপরাধ॥

এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা এমন কি আধেরও আধ ঘন্টা যদি সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহলে সেই সাধুসঙ্গ কোটি অপরাধ হরণ করে। ঠাকুর বলছেন, 'দেখ। ঈশ্বরকে দেখা যায় অবাঙমানসোগোচর বেদে বলেছে, এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। বৈষ্ণবচর

্নত, তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। তাই সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ এই ব প্রয়োজন। তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। তবে তাঁর দর্শন হয়। ঘোলাজলে নির্মলি ফেললে রিষ্কার হয়, তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আরশিতে ও মুখ দেখা যায় না।'

স্বামীজী বলছেন, 'তীর্থে বা মন্দিরে গেলে তিলকধারণ করিলে অথবা বস্ত্রবিশেষ [illegible]র্ম হয় না। তুমি গায়ে চিত্রবিচিত্র করিয়া চিতাবাঘটি সাজিয়া বসিয়া থাকিতে [illegible] কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে পলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা। হৃদয় যদি রাঙিয়া যায়, তবে আর বাহিরের রঙের াবশ্যক নাই। ধর্ম অনুভব করিলে তবেই কাজ হইবে।' স্বামীজী বলছেন—'যদি দেহমন দ্ধ না হয় তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা।' মীরাবাঈ বলছেন :

তুলসী পিঁদনে হরি মেলেতো, মেয় পেঁদে কুঁদা আউর ঝাড়।
পাত্থর পূজনে হরি মেলেতো ময় পূজে পাহাড়।

তুলসীর মালা গলায় ধারণ করলেই সাক্ষাৎ হরিদর্শন। তাহলে আমি তুলসীগাছের কটা মোটা গুঁড়ি গলায় ঝুলিয়ে বসে থাকি। আর পাথর কেন, গোটা একটা পাহাড় পুজো করি' শিলার বদলে পবত।

ঠাকুর বলছেন। ওহে! ঘাবড়াও মাত! গৃহীও পাবে, অবশ্যই পাবে। যদি ইচ্ছে াকে। প্রবল ইচ্ছা। 'তিন টান' এক করতে হবে। 'মনই সব জানবে। জ্ঞানই বলো ার অজ্ঞানই বলো, সবই মনের অবস্থা। মানুষ মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত, মনেই সাধু বং মনেই অসাধু। মনেই পাপী ও মনেই পুণ্যবান। সংসারী জীব মনেতে সর্বদা গবানকে স্মরণ-মনন করতে পারলে তাদের আর অন্য কোনও সাধনের দরকার হয় া।'

মনই সব। ঠাকুর বলছেন, মন আর মুখ এক কর। তিনি মন দেখেন। তুলসীর কি সুন্দর দর্শন! একেবারে ঠাকুর।

রাম ঝরোখে বয়েঠ কর, সবকো মুজরা লে।
অ্যায়সা থাকে চাকরি, অ্যায়সা উকো দে।

ভগবান শ্রীরাম জগৎরূপ গৃহের উচ্চ বাতায়নে বসে আছেন। দেখছেন, জগতের লাক কে কি করছে! অহর্নিশ দেখছেন। আর কি করছেন? যার যেমন কাজ তাকে সইরকম পুরস্কার দিচ্ছেন।

ঠাকুর বলছেন, সংসারে আছো! থাকো। প্রারব্ধ তোমার ক্ষয় করো। মনে রেখ, নিষ্কামকর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা

কেন চোখের জলে

ঠাকুর বলছেন : "বেদদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন না করলে তপস্যা না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ষড়দর্শনে দর্শন মেলে না, মেলে না আগম-নিগম তন্ত্রসারেও তবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। একজ একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় রেখেছে মনে নেই, তখন সে প্রদীপ নিয়ে খুঁজতে লাগল। দুতিনজন মিলে খুঁজে চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছিল পাঁচ সে সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাবে। সেইটুকু পড়ে নিয়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে। তখন আর চিঠির কী দরকার।"

ঠাকুর বলছেন : "পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। গুরুমুখে ব সাধুমুখে শুনলে ধারণা বেশি হয়, আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। হনুমান বলেছিল, 'ভাই, আমি তিথি-নক্ষত্র অতসব জানি না, আমি কেবল রাম-চিন্তা করি। শোনার চেয়ে দেখা আরও ভাল। দেখলে সব সন্দেহ চলে যায়।" তাহলে তাঁর দিকে এগোবার প্রধান বাধা হলো সন্দেহ। তিনি আছেন, না তিনি নেই। প্রবল সংশয়। তিন সংশয়। তিনি আছেন ; তাহলে আমি যা চাই, তা পাই না কেন ? আমার সব আশা পূর্ণ হয় না কেন ?

ঠাকুর হাসলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি দেনদার আর পাওনাদারের তুমি চাইবে আর তিনি দিয়ে দেবেন। ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন : "তা বটে ; সময় না হলে কিছু হয় না। যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হতো, একদিন সরাখানি ভেঙে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বলল : 'নাচ কোঁদ বৌমা, আমার হাতের আটকেল আছে'।"

তিনি দেবেন, তাঁর ব্যবস্থা মতো, মাপ মতো, মর্জি মতো ! মানুষ যেমন প্রার্থীকে, ভিখারিকে, স্তাবককে, তোষামদকে ঘৃণা করে, তিনিও সেইরকম ঘ্যানঘেনেকে সহ্য করতে পারেন না। উপেক্ষা করেন। মা জানেন অবোধ শিশুটির কখন কি প্রয়োজন। ছেলে সকালে উঠে কি খাবে, কোন জামা পরবে। কখন তাকে স্নান করাতে হবে, ঘুম পাড়াতে হবে। শিশুর মতো নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে তার কোলে। বিশ্বাস, অবিশ্বাসে

প্রশ্ন নেই। যদি সেই প্রশ্ন মনে উঁকি মারে তাহলে বুঝতে হবে তুমি ছিটকে গেছ। ঠাকুর প্রশ্ন করছেন, তাহলে, 'কি হবে ?'

কি করব তা তো জানি না। দুঃখে, সুখে, সংশয়ে, বিশ্বাসে, দোল খাচ্ছি। আপনিই বলুন ঠাকুর।

"তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের ওপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনো মন্দ করবে না।"

কিন্তু সাধনার প্রয়োজন আছে। সে-সাধনা হলো ধীরে ধীরে তাঁর দিকে সরে যাবার প্রয়াস। নিজের হাতটি তাঁকে ধরিয়ে দেবার সাধনা। এখন তুমি কোন পথ নেবে ? বানরের না বেড়ালের ? সে আবার কি ? ঠাকুর বলছেন, শোন তাহলে—"এক রকম সাধকের বানরের ছা-র স্বভাব, আরেক রকম সাধকের বিড়ালের ছা-র স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো-সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। তেমনি কোন কোন সাধক মনে করে, এত তপস্যা করতে হবে এত ধ্যান করতে হবে, এত জপ করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে যায়। বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যা করে। মা কখনো বিছানার ওপর, কখনো ছাদের ওপর, কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে। মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে নিয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। তেমনি কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে, কোন সাধন করতে পারে না, এত জপ করব, এত ধ্যান করব ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।"

চাওয়া নয় কান্না। তাঁর ঐশ্বর্য নয়, খোদ তাঁকেই চাওয়া। যমরাজ নচিকেতাকে খুব লোভ দেখাচ্ছেন—রাজ্য নাও, বাহন নাও এমন ভোগ নাও, যা কেউ কখনো ভোগ করেনি, দীর্ঘতম জীবন নাও। তুমি সব নাও ; কেবল আত্মতত্ত্ব জানতে চেয়ো না। আত্মদর্শনের বাসনা ত্যাগ কর। কারণ আত্মা সম্পর্কে দেবতাদেরও সংশয় আছে। নচিকেতা বললে, দেবতাদেরও সংশয় ? আপনার মুখেই শুনলুম তবু জেনে রাখুন, আত্মজ্ঞান ছাড়া আমার কাছে সবই তুচ্ছ।

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোহয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥

(কঠ উপনিষদ্ ১/১/২৯)

আত্মতত্ত্ব ছাড়া নচিকেতা আর কিছুই চায় না।

বড়বাবুকে যখন পেয়েছি তখন বড়বাবুকেই চাই। নচিকেতার গোঁ। কী চাই তোমার ? বড়বাবু কৃপা করবেন। নায়েবকে বলবেন, দাও, দু দশটাকা দিয়ে দাও। তখন খপ্ করে তাঁকে চেপে ধরে বলব প্রভু ! আর তো চাহি না কিছু, তোমাকেই চাই।'

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে,
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে ॥
ধূলাতে বসিয়া দ্বারে, ভিখারি হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে ;
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই,
সেও মনে ভালো লাগে ॥

ঠাকুর আপনি বলেছেন : 'জীব প্রথমে অজ্ঞান হয়ে থাকে। ঈশ্বরবোধ নেই, নানা জিনিস বোধ, অনেক জিনিস বোধ। যখন জ্ঞান হয় তখন তার বোধ হয় যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। যেমন পায়ে কাঁটা ফুটেছে, আরেকটি কাঁটা যোগাড় করে এনে ঐ কাঁটাটি তোলা। অর্থাৎ জ্ঞান-কাঁটা দ্বারা অজ্ঞান-কাঁটা তুলে ফেলা। অর্থাৎ বিজ্ঞান হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেওয়া—অজ্ঞান-কাঁটা এবং জ্ঞান-কাঁটা। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে নিশিদিন কথা, আলাপ হচ্ছে—শুধু দর্শন নয়। যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে ; যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।'

যদি কিছু নাও হয় এই জন্মে, অজ্ঞান থেকে যেন জ্ঞানে যেতে পারি। বিশ্বাস। সর্বোত্তম হলো বিশ্বাস। আপনি বলছেন : ইনিই আমার ইষ্ট'। এইটি ষোল আনা বিশ্বাস হলে—তাঁকে লাভ হয়, দর্শন হয়। আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল।

আমি যেন সেই 'আগেকার লোক' হতে পারি। হলধারীর পিতার মতো। ওইটাই আমার অ্যাম্বিশান। স্নানের পর জলে দাঁড়িয়ে তিনি মন্ত্র পড়তেন, রক্তবর্ণং চতুর্মুখম্—চোখ জলে ভেসে যেত।

মা তুমি আর কিছু না দাও, চোখের জল দাও। তাঁর কথায় যেন বুক ভেসে যায়

মনের মতো পাগল পেলাম না

পাগল বলতে আমরা কি বুঝি ? পাগল তো খুব শ্রদ্ধেয় কিছু চরিত্র নয়, কিন্তু না—ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন যে যাঁরা তাঁর দিকে এগোন তাঁর একটু পাগলাটেই হল, তাঁদের কোনোকিছুর আকঢাক থাকে না তার কারণ তাঁরা কিছু নিজের করে জড়িয়ে ধরতে চান না, জড়িয়ে ধরতে পারেন না। তার কারণ, এই নশ্বর সংসারের সমস্ত জিনিস এতই তুচ্ছ যে এই নিয়ে নাড়াচাড়া করা মানে মনে হয় যেন একটা বাচ্চা মেয়ে, অবোধ মেয়ে পুতুল খেলা খেলছে। তা এই বোধটি জাগিয়ে দেবার জন্যে সমস্ত সাধকই তিনটে জিনিসের ওপর খুব জোর দিয়েছেন। বেশী জোর দিয়েছেন বাউল সন্ন্যাসীরা।

বাউল মানে কে ? যাঁরা জীবনের সঙ্গে খুব গভীরভাবে জড়িয়ে আছেন। যেমন আমরা আজকে তো এত সাহিত্য করি সংস্কৃতি করি, গান গাই। কিন্তু লালন কে হতে পেরেছে ? যদি কেউ প্রকৃত কিছু রচনা করে থাকেন, তাহলে লালন ফকিরের মতো ফকির। তার কারণ হচ্ছে যে তিনি আমাদের জন-জীবনের আর্তি আর বেদনার কথা এত সহজ করে বলতে পেরেছেন যা আমরা কেউ কোনদিন পারব না। তার কারণ আমরা যখনই কথা বলি তখনই একটা অহংকারের ভাব আসে। আমি বক্তা, আপনারা শ্রোতা, আমি লেখক, আপনারা পাঠক। তা এই অহংকার বস্তুটাই কিন্তু আমাদের সত্যবস্তু থেকে সরিয়ে রাখে। সেই জন্য সমস্ত সাধকের একটি কথা—আগে অহংকারের পর্দাটিকে সরাও, অহংকারকে না সরানোর ফলে সৎকামী মানুষ তাদের দেখতে পাবে না এবং তাদের যদি আমি দেখতে না পাই তাহলে আমি নিজেকেও দেখতে পাবো না। তার কারণ হচ্ছে মানুষই মানুষের দর্পণ, সেই কারণে সমস্ত বাউল তিনটি জিনিসের পর জোর দিয়েছেন। একটি জিনিস তাঁরা বলেছেন যে, সবসময় মনে রাখবে যে তোমার এই নশ্বর ইন্দ্রিয়ের খাঁচাটি একদিন ভেঙে যাবে, আর ভেঙে গেল কি হবে ? না এর ভেতর যে প্রাণপাখিটি বসে এই জনমভোর কিচির মিচির করে গেল এটি উড়ে চলে যাবে। তো সেটি উড়ে চলে গিয়ে কোথায় যাবে ? সে তো জানিনা—পাখি এমনি করেই আসে আর এমনি করেই উড়ে যায় তা এই যে পাখি—অচিন পাখি—এ কমনে আসে কমনে যায় এ আমরা জানি না। তা এর আশ্রয়ই হচ্ছে, এই নরদেহ, এই খাঁচা এবং এই খাঁচাটি কিসের তৈরী ? না, রিপু আর ইন্দ্রিয়। তা এই যে ইন্দ্রিয় আর রিপু এটা কি করছে ? এটা করছে কি

পাখি বসে আছে ঠিকই, সে করছে কি, চালনা করছে অষ্টপাশে, বন্ধন করে ফেলেছে, লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য। এটা আমার ওটা তোমার, ওটা আমার এইটা আমার এই করে সে সারাটা জীবন শুধু কচর মচর করে যাচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের কিচির মিচির। তার ফলে সেই প্রাণপাখি যে সেই বিশ্বস্রষ্টার গুণগাণ করছে তার কথাটি কিন্তু সে শুনতে পাচ্ছে না। সেই কারণে ঠাকুর বলছেন, মনে রেখো মৃত্যু-স্মরণ হও। তুমি আজ আছো কাল নেই, তাই মৃত্যু স্মরণ হলে কি হবে? না মৃত্যু একটা মস্ত বড় ভয়, যে কথা সম বাউল সঙ্গীতে আছে, 'শমন'—মানুষের শমন কি? মানুষের শমন হচ্ছে মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয় কি? না, নিজে থাকার ভয়। আর নিজে থাকা বস্তুটা কি? না, ভোগ। আমি আছি মানে কি? আমি আছি মানে আমি ভোগে আছি। আমি তো যোগে নেই। আমি ভোগে আছি, আমি ভালো খাবো, আমি ভালো পরবো, ভালো কথা শোনাবো, ভালো গাড়ি চাপবো, ইত্যাকার যাবতীয় আছে সব আমি আমার কাছে টেনে নেবো, টেনে নিয়ে ভোগ করব। আর ভয় কোথায়? হে মৃত্যু, তুমি আমাকে সরিয়ে নিও না এই ভোগের জগৎ থেকে, তাহলে আমার অনেক আশা অপূর্ণ থেকে যাবে। দেহ দিয়ে আমি বহু কিছু ভোগ করতে চাই। আবার শমনের কাছে এই ভয়, যে আমি আছি, সব আছে কিন্তু আমার লিভার নেই। পিলে বড় হয়ে গেছে। তাহলেও চলবে না, যেমন আমি একজন বড়লোককে জানতাম তিনি পাঁচজনকে ডেকে এনে খুব খাওয়াতেন আর নিজে বার্লি খেতেন। তা আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই অবস্থা হল কেন? বললেন ভাই রে আমার লিভার গেছে, পিলে গেছে, গলব্লাডার গেছে সব গেছে খোলটা আছে। তোমরা খাও আমি দেখি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমি বললাম আপনার এই বেঁচে থাকার কি অর্থ? বললেন এই তোমরা খাও আমি দেখি। তা ঐ ভয়, ঐ ভয় যে সময় আমার ওপরে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। যে যন্ত্র নিয়ে আমি জন্মেছিলাম ছেলেবেলায়, একেবারে যেন প্যাকেট খোলা হ'ল, যেমন বলে না, সীল খুলে ট্রানজিস্টার রেডিও বেরোল সব পার্টস নতুন ঝকঝক করছে। তারপরে চানাচুর খেলুম আলুকাবলি খেলুম ফুচকা খেলুম ধীরে ধীরে আমার যন্ত্রপাতি সমস্ত বিকল হতে লাগল, সার্জেন যেটুকু পারলেন কেটে ছেঁটে সেলাই জোড়াই করে দিলেন কিন্তু বললেন, দেখো বাপু তুমি পুরোনো হোচ্ছ তোমার যন্ত্রপাতিও পুরনো হচ্ছে নতুন তো হবে না বাপু। তখন একটা সমঝোতায় আসতে হয়। কিছু কিছু মানুষ আছেন সকালবেলা প্রবলবেগে ভ্রমণ করছেন, কেউ হাফ প্যান্ট পরে দৌড়চ্ছেন, কেউ ডন বৈঠক মারছেন, কেউ বারবেল ভাঁজছেন। কি ব্যাপার মশাই, এরকম করছেন কেন? জনসেবা করবেন বুঝি মানবহিতের জন্য? বললেন না মানবহিত নয়, আমি একটু বেশি বাঁচতে চাই। আবার যে যত বড়লোক সে বেশি বাঁচতে চায় কারণ তার ভোগ বেশি। সমস্ত মানুষেরই একটা ভয়—মৃত্যু আসছে। আর এই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সের পর থেকে মৃত্যুভয়টা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। আবার মৃত্যুভয়ের সঙ্গে একালে যোগ হয়েছে মৃত্যুরও বাছবিচার। কেউ কেউ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, হে ভগবান থ্রম্বোসিস-এ নাও যেন এক ধাক্কায় চলে যাই, ক্যান্সার দিও না তাহলে তিন মাস বিছানায় পড়ে চ্যাঁ চ্যাঁ করতে হবে। মৃত্যুরও দেখা যাচ্ছে নানারকম

আছে। তাই বাউলরা বলেন ঐ যে শমন, তিলেক দাঁড়া ওরে শমন বদন ভরে মাকে ডাকি। আর শমন থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি! না মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হতে হবে। মৃত্যু থেকে কে আমাকে রক্ষা করবেন ? না, মা কালী, তারা, শক্তি। আমি তাঁকে ধরি, আমি তাঁর হাত ধরে আছি। আচ্ছা এইবার যদি মৃত্যু আসে যন্ত্রণা আসে তাহলে আমার কি হবে ? আমার কিছুই হবে না। ঠাকুর বলতেন যে, বাঁদরের ছানা সে তার মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সেইজন্যে তার ভয় যদি হাত খুলে যায়। তাই আমার হাতটি তুমি ধরো তাহলে তো আমার ভয় নেই কারণ তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছি আর তো আমার কিছু করার নেই। তিনি আমাকে আলের পথে, খালের পথে যেখানে দিয়েই নিয়ে যান আমি জানি তিনি আমার হাত ধরে আছেন। তিনি তো আমাকে ফেলবেন না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন—হবি তো বেরালের ছানাই হ, কারণ বেড়ালের মা করে কি ? তাকে নড়া ধরে কখনও খাটে শোয়াচ্ছে কখনও প্যাকিং বাক্সে রাখছে, কখনও রকে ফেলছে। যেখানে মা নিয়ে যাচ্ছে সেইখানেই পড়ে মিউ মিউ করছে। সেই কারণেই বলছেন যে তুমি তোমার হাতটি তাঁকে ধরিয়ে দাও। আবার সমস্ত বাউলের কথা হচ্ছে যে সেই প্রাণপুরুষকে সেই মহাপুরুষকে সেই তোমার স্রষ্টার কাছে তুমি নিজেকে নিবেদন কর তারপরে দেখো না কি হয়। একজন মহাপুরুষের কাছে গিয়ে আমি আমার কোষ্ঠীর ছক ফেলে বললাম, স্বভাবতই গৃহী মানুষ, ভীষণ ভয়। তার কারণ হচ্ছে, আপনি জানবেন যে আমাদের সবচেয়ে বড় ভয়, হারানোর ভয়। কি হারানোর ভয় ? না, বেশ একটা বাড়ি আছে, একটা জীবিকা, আছে মাস গেলে একটা মাইনে আছে। এগুলো যদি চলে যায় তাহলে কি হবে! আমেরিকায় একজন ধনকুবের কোটিপতি, তিনি সাততলা থেকে লাফিয়ে পড়লেন। পকেট থেকে একটা চিরকুট বেরোল। কি ব্যাপার। না আমার সকাল বেলা মনে হ'ল যদি গরিব হয়ে যাই তাই আত্মহত্যা করলাম। গরিব হয়ে যাবার ভয়ে আত্মহত্যা করলেন। ঐজন্য বাউলরা বলছেন যে সব ছাড়ো তবে সব পাবে, সব ছাড়ো। কি ছাড়ো ? এই ঐহিক, জাগতিক যা কিছু আছে সব ছেড়ে দাও। একটা কথা বলি সময় খুব কম আর জানেন তো, কথার একটা নেশা আছে। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বং। কাল আমাদের ওপর দিয়ে ক্রীড়া করে যাচ্ছে, ক্ষণকালের ওপর দিয়ে মহাকাল চলে যাচ্ছে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, এই মহাবিশ্বে মহাজীবন থেকে একটি একটি করে পাতা খসে পড়ে যাচ্ছে, আবার তিনি প্রশ্ন করছেন আমরা জন্মেছি কি শুধু মরার জন্য, আমি কি আমার জীবনকে মৃত্যুর পায়ে উৎসর্গ করে দিয়ে যাবো ? না, তাঁর শেষ উত্তর আছে আমাদের ভারতের আধ্যাত্মিকতায়। আজকে একটা কথা খুব বড়ো করে শোনা যাচ্ছে, কে মৌলবাদী আর কে অমৌলবাদী। যাঁরা ইনটেলেকচ্যুয়াল তাঁরা এখন এই রকম কথা বলেন, আপনি তো মৌলবাদী আপনি নিশ্চয়ই সতীদাহ সমর্থন করেন। মৌলবাদ জিনিসটা কি ? মৌলবাদ মানে মন্দির মসজিদ নয়। মৌলবাদ হচ্ছে আমি মৌলিক কোন সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছি এবং সেই সত্তাটিকে স্বরূপে রাখা। আমার তো একটা উৎস আছে। অ্যায়সা তো আর এই পৃথিবীতে আসিনি। তা ঠাকুরকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন আচ্ছা আপনি বলতে পারেন সব মানুষেরই তো

জন্মটা বড় বিচ্ছিরি। একজন মানব আর একজন মানবীর মিলন। সেটা তো একটু কামার্ত মিলনই হয়ে থাকে এবং মানুষের জন্ম তো তাইতেই। সেই মিলনে মহাপুরুষ আসেন কি করে? ঠাকুর বললেন দূর পাগল এটা বুঝলি না, যে বীজ ভালো, সে বীজ আঁস্তাকুড়েই পড়ুক ছাই গাদাতেই পড়ুক, গোবরেই পড়ুক, ভালো মাটিতেই পড়ুক ভালো বীজ থেকে ভালো গাছ হবে। বীজকে তো মাটিতে পড়তেই হবে তা না হলে গাছ হবে কোথেকে। এমনি তো আর হবে না। এ কারণেই নিহিত মৌলবাদ-অমৌলবাদের প্রশ্ন। হিন্দু ধর্ম কি? হিন্দু ধর্ম হচ্ছে তিনটি জিনিসকে স্মরণে রাখা। আমি এসেছি, আমি চলে যাবো। আমি কোথা থেকে এসেছি কোথায় চলে যাবো। এই প্রশ্ন। আমি কোথা থেকে এসেছি কোথায় চলে যাবো এইটাই হচ্ছে মস্তবড় দর্শনের উদ্ভবভূমি। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মানুষ, সে হিন্দুই হোক মুসলমান হোক, যেই হোক তার কাছে এই প্রশ্ন যে আমি কেন এসেছি কি করতে এসেছি, কোথায় চলে যাবো? এই প্রশ্নের থেকেই ধর্মের উদ্ভব অর্থাৎ আমি এসেছি কোন জায়গা থেকে। আমি মাঝে মাঝে বসে বসে ভাবি যে অদ্ভুত কোনো একটা এ্যাক্সিডেন্ট থেকেই মানুষ আর এই জীবজগৎ তৈরী হয়ে থাকে তাহলে আপনারা ভেবে দেখুন, একটা গরু, একটা ছাগল, একটা বেড়াল, একটা বাঘ, একটা কুকুর, চারটে পা, সারাগায়ে লোম, কারোর লোম আছে, কারোর লোম নেই। আচ্ছা মানুষ কেন এমন বিচিত্র হল? আমি বসে বসে ভাবি মানুষের কোথাও চুল নেই কিন্তু মাথাতে কি দরকার ছিল, মাথার তালুতে, এমন সুন্দর এক খামচা চুল করে দেবার? আবার ঠোঁটের ওপর একটু সরু গোঁফ হয়ে গেল। কেন বাঘের মতো হ'ল না? সারা গায়ে লোম বনমানুষের মতো, আমাদের সৃষ্টির একটা প্যাটার্ন আছে। হিসেব আছে। উদ্দেশ্য আছে। পরিকল্পনা আছে।

Chance Combination of Atom, Hydrogen and Carbon নয়। আজকালের যারা অমৌলবাদী যাঁরা নাস্তিক তাঁরা তো বলছেন ভগবান-টগবান কিছু নেই, সৃষ্টি হয়েছিল এইভাবে হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন কার্বন এই তিনটে ঘুরে ঘুরে বেড়াছিল, প্রচণ্ড উত্তাপে তিনটি কাছাকাছি এল ধুপ করে। একটা বাঘ হল, বনমানুষ হল, হায়না হ'ল, মানুষ হ'ল। একথা কিন্তু এখনকার বড় বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করছেন না, বলছেন, না হে বাপু এত সহজ! মানুষের মাথায় একটা মস্তিষ্ক আছে, মানুষের একটা ভাবনা আছে, মানুষ বিচার করে প্রশ্ন তোলে, সেই প্রশ্ন হচ্ছে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন, আমি কেন এসেছি, কোথায় যাচ্ছি কতদিন থাকছি এবং মৃত্যু আমার পেছন পেছন তাড়া করেছে, কোনটা আমার কোন্‌টা তোমার বা কোন্‌টা ক্ষণকালের কোন্‌টা সর্বকালের কোন্‌টা অমর, কোনটা নশ্বর এই মৌলিক প্রশ্ন যে করে সেই হচ্ছে মৌলবাদী। আর আমাদের যাঁরা পাগল বলেন তাঁরা কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধানের খুব কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছেন যার ফলেই তাঁরা বলছেন পাগল। কেন পাগল? না তিনি জেনে গেছেন। আর জেনে গেলে কি হচ্ছে? জেনে গেলে তাঁর কাছে এই ইহসংসারের সমস্ত ভোগ্যবস্তু সমস্ত মানুষের আচার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, এরা কি করছে? ইয়ে কেয়া কর্ রহা হ্যায়—এই প্রশ্ন। তাঁরা সেই জন্যে সমস্ত কিছু ছেড়ে একটু কিরকম ফ্যালফ্যালে হয়ে যান, একটু অন্যরকম

হয়ে যান। ঠাকুর তো বলতেন যাঁরা যোগী তাঁদের চোখ দেখলেই বোঝা যায় যেন পাখী ডিমে তা দিতে বসেছে, চোখ দুটো ফ্যালফ্যাল করছে। তাঁরা কোনো কিছুতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরা, 'আপনি নাচে, আপনি গায় আপনি দেয় মা করতালি।' কিসের জন্য করতালি দেয়? হ্য ঈশ্বর তুমি আমায় পাঠিয়েছ, কেন পাঠিয়েছ দ্বৈত-আস্বাদনে, তুমি আর আমি, আমি যদি মানবদেহ ধারণ না করতাম তাহলে তুমি ঈশ্বর কোথায় থাকতে? তোমার কথা কে গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে সভায়-মঞ্চে বলে বেড়াত? তা তুমি তোমার কথা শুনবে বলে আমাকে সৃষ্টি করে এখানে বসিয়েছ। এই প্রশ্নের থেকেই উদ্ভব হয়েছে ধর্ম আর এর সমাধান আছে মৌলবাদে অর্থাৎ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর যারা দিতে পারে তারাই মৌলবাদী। মন্দিরে নেই মসজিদে নেই, ন বহুধাশ্রুতেন, ন মেধয়া কোনো শাস্ত্রে নেই। এই প্রশ্নের উত্তর আছে। শুধুমাত্র নিজে চুপটি করে বোসো। আর গুরুর প্রয়োজন তার কারণ হচ্ছে গুরুই আপনাদের দেবেন জ্ঞান-সহায়, তিনি মহান্ধকার দূর করবেন, তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন, কি করিস সারাটা দিন, কিসে কাটালি। যেমন বাবা বলেন, সারাটা দিন মাঠে খেলে এলি। একটু পড়লি না? গুরু আরও বড় কথা বলবেন তা সেইজন্য আমি আমি এইটা হ'ল অজ্ঞান তুমি তুমি সেইটা হ'ল জ্ঞান। আমি আর তুমি তুমি আর আমি। হ্যাঁ এটাই হল বিজ্ঞান। সেইজন্য মূল বিজ্ঞানের কথাই হ'ল যে আমি তুমি সমস্ত এক, সেই উদ্ভবভূমি এক। এক থেকে এই বহু হয়েছে। এই কথাই বলছেন তাঁরা। আমাদের সহজ করে বলছেন বাউলরা এবং তাঁদের সমস্ত কথার মধ্যেই আছে যে এই রিপুর বন্ধন থেকে বেরিয়ে এস, শমন স্মরণ হও। শমন হ'ল মৃত্যু যে কোনোদিন ছোঁ মেরে ঈগল পাখির মতো তুলে নিয়ে যাবে, যেটুকু সময় আছে আনন্দে রহো, আনন্দে গান করো, আনন্দে তাঁর কথা শোনো, আনন্দই কিন্তু সবচেয়ে বড় বস্তু, আমরা যা কিছু করি রসগোল্লা খাই আনন্দ পাবার জন্য, আমরা ভোগ করি আনন্দ পাবার জন্য, ভালো বিছানায় শুই আনন্দ পাবার জন্য, বেড়াতে যাই আনন্দ পাবার জন্য, সমস্ত আনন্দের কিন্তু একটা নিরানন্দ আছে। কিছুকাল পরে মনে হয় এতে হচ্ছে না সেই পরম আনন্দ। ভবার একটি গান আছে সেই পরমানন্দ সাগরে ডুবতে শেখ। ডুবতেই যদি না শিখলি তবে তোর কি হল। ডুবতে শেখ, কোথায় ডুবতে শেখ? আনন্দসাগরে। বলেছেন আমাদের পাগল। বড় সুন্দর কথা একটি চেতবানীর মতো। বারে বারে আর আসা হবে না, মানুষ জনম তো আর পাবে না, ভেবেছে মনে এই ভুবনে, তুমি যাহা করে গেলে কেউ জানে না। দেখবেন আমরা যা যা করছি মনে হচ্ছে ও বেটা তো দেখেনি ও যখন দেখেনি তখন আমি বেশ আছি। সব কিছু করে যাচ্ছি। ওরে গোপাল বাবা না দেখুন কেউ না দেখুন, একজন তো ঠিক দেখছেন। তুমি যাহা করে গেলে আসিয়া হেথা, চিত্রগুপ্ত লিখি ভরিল খাতা। বিচার করিবেন সেই বিধাতা, ফাঁকিঝুঁকি তাঁর কাছে কিছু চলে না। সেইজন্যে ঠাকুর বলতেন, মনে মুখে এক কর। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বলতেন যে, ঐ সব তিলক ফিলক কেটে জয়রাম জয়রাম করলে কিছু হবে না। মন আর মুখ এক কর। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে পবিত্র হে—, দেহে পবিত্র, চিন্তায় পবিত্র, মনে পবিত্র। একজন মস্তবড় সাধককে প্রশ্ন করা হয়েছিল

ধ্যান জপ করলে মশাই কি হয়? তা তিনি বললেন 'শুনবে, ধ্যান জপ করলে কি হয়—ধ্যানজপ করলে তোমার মধ্যে একটা ভীষণ বিশ্বাস আসে, যে আমি তিন কোটিবার জীবনে জপ করেছি তুই ব্যাটা আমার কি করবি? এই যে একটা বিশ্বাস, এই যে একটা জেদ এই জেদই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। যুদ্ধ করতে গেলে সৈনিক সেও বলে তার বিশ্বাস ওয়া গুরুজিকী ফতে। তবেই সে যুদ্ধ করতে পারে। একটা ভারী জিনিস তুলতে গেলে দেখবেন জয়গুরু বলে আমরা তুলি। কোথা থেকে একটা শক্তি এসে যায়। তা এই শক্তি এই দেহের মাসলে নেই, এই শক্তি পেশীতে নেই, এই শক্তি ভিটামিন-এ নেই, এই শক্তি আছে একমাত্র মনের অন্তর শক্তিতে।' এই অন্তর শক্তি জাগে শুধু ধ্যান আর জপে আর তাঁর চিন্তায় তাঁর সঙ্গে আমি যুক্ত আছি। আমার কে কি করবে, কেউ তো কিছু করতে পারবে না। সেইজন্য বাউলের গানেই আছে যে, শ্যামা নামের গণ্ডি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আয় তুই। একি ছেলের হাতের মোয়া যে তুই কেড়ে নিবি আমার হাত থেকে। এ যে মোক্ষফল, একি ছেলের হাতের মোয়া।

তাই বলি :

আমি মনের মত, পাগল পেলাম না।
আমি তাইতো পাগল হলেম না—তাইতো পাগল হলেম না
আমি নকল পাগল সকল দেখে,—আসল পাগল দেখি না
শিব যে ছিল পাগলেরই সার, সুধাতে যে গরল যে আহার
দালানকোঠা ফেলে দিয়ে, শ্মশানে বৈঠকখানা
আমি মনের মতো পাগল পেলাম না
কলিতে এক পাগল ছিল, পাগল শ্রীচৈতন্য
আর একটুখানি ছেলে ভবে করলে কি কাণ্ড
জয় রাধে বলে ঐ কালো জলে ডুবল আর উঠল না।

উট হবে না হাঁস হবে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভক্তদের বললেন, "দ্যাখো পাঁজিতে বিশ আড়া জলের থা লেখা আছে কিন্তু নিঙড়োলে এক ফোঁটাও বেরোবে না।" তার মানেটা কী ? ধর্মকথা জস্র শুনে যাও, পড়ে যাও কপচে যাও, কিছুই হবে না, আত্মিক উন্নতির জন্যে চাই, ভ্যাস। ধর্ম অভ্যাসের জিনিস। ফলিত যোগ। করতে হবে। ঠাকুর বলছেন, "তাঁর ন্যে কাঁদতে হবে বাপু। ভেতরে অনুভব করতে হবে ভীষণ এক অভাব।" সংসারের বই করছি, কিন্তু মনটা পড়ে আছে সেই দিকে। যেন বাবুর বাড়ির দাসী। বলছে বটে, ামার হাবু, আমার গোপাল ; কিন্তু মনেপ্রাণে জানে, এরা আমার কেউ নয়। আসল রা, তারা পড়ে আছে দেশের বাড়িতে। 'ভেবে দেখ মন'।

সংসারের কৌটোতে জীব হলো শুকনো ছোলা। যার কোনও স্বাদ নেই। চিবোতে ান বেরিয়ে যায়। ভক্তির জলে অহরহ তাকে চুবিয়ে রাখলে তবেই সেই ছোলা ফুলবে, বুজ টাপুর-টুপুর হবে, নরম হবে, স্বাদ আসবে, ঘ্রাণ আসবে। জীবনকে প্রেমের জলে লে রাখতে হবে। ভগবৎ প্রেম। এই প্রেম তো সহজে আসার নয়। সংসারী জীবের াসক্তি হলো কামিনী আর কাঞ্চনে। ঠাকুর বলছেন, "মাগ-ছেলের জন্যে ঘটিঘটি চোখের ল ফেলতে পার আর তাঁর জন্যে এক ফোঁটা ফেলতে পারো না।"

প্রশ্ন হলো, কেন আমরা তাঁর জন্যে আকুল হব ! কি লাভ ! আরও কত কি তো ড়ানো রয়েছে চারপাশে—জীবন, যৌবন, ধন, মান। তিনি আমাকে কি-ই বা দিতে ারেন ! না গাড়ি, না বাড়ি, না দেহসুখ। ঠাকুর এই সংশয়ের উত্তরে বলছেন, "মানুষ াপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালরূপ বিচার করলে খতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোনো জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ত্যাদি—এর কোনটা 'আমি' ? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই রোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার কল্লে 'আমি বলে কিছুই পাইনে ! শেষে া থাকে, তাই আত্ম-চৈতন্য।" এই চৈতন্যটুকুর জন্যে তাঁকে চাওয়া।

কালনেমি রাবণকে বড় সুন্দরভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন এই জগতের কার্য-কারণ। াবণ লক্ষ্মণকে শক্তিপ্রহারে অচৈতন্য করে ফেলেছেন। হনুমান চলেছেন বিশল্যকরণী ানতে ক্ষীরসাগরে। রাবণ কালনেমিকে বলছেন—তুমি মায়াবলে মুনির বেশ ধারণ করে

মহাকপি হনুমানকে যেভাবে হোক আটকে রাখো যাতে রাতটা কেটে যায়, তাহলে লক্ষ্মণের জীবনাবসান হবে। কালনেমি তখন রাবণকে বললেন—ঈশ (মানে দণ্ডদাতা) রাবণ, আপনি যা বলবেন, তা আমাকে করতেই হবে আর মারীচের মতো আমাকেও মরতে হবে। আমি মরি ক্ষতি নেই ; কিন্তু আপনিও যে সবংশে নির্বংশ হবেন। এখনও সময় আছে, আপনি সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিন, আর বিভীষণকে রাজ্য বুঝিয়ে দিয়ে মুনিদের আশ্রয় রমণীয় কোনো বনে গিয়ে বানপ্রস্থী হোন। প্রাতে পবি জলে স্নান করে সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করে নির্জনে সুখাসনে উপবেশন করুন ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে তুলে এনে অন্তরাত্মাভিমুখী করুন। বিচার করুন। বোঝার চেষ্ট করুন আত্মা প্রকৃতি থেকে পৃথক। দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, আব্রহ্মস্তম্ব এই বিশাল চরাচর জগৎ হলো প্রকৃতি। ব্রহ্মবিদ একেই বলেছেন মায়া। এই প্রকৃতিই জগদ্রূপ বৃক্ষ ও তার সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের হেতু। প্রজা সৃষ্টির কারণ। প্রজাদের আবার তিন স্বরূপ।

কালনেমি কি সুন্দর বোঝাচ্ছেন, ইন্দ্রিয়পর, ভোগী রাবণকে। বলছেন, এই তিন স্বরূপের এক রূপ হলো লোহিত, মানে যারা রাজসিক। দ্বিতীয় গোষ্ঠী হলো শ্বেত, মানে সাত্ত্বিক, তৃতীয় হলো কৃষ্ণ, মানে তামসিক।

এই প্রকৃতিই সৃষ্টি করছেন, কাম ক্রোধের আকর পুত্রগণকে আর হিংসা ও তৃষ্ণাদি কন্যাগণকে। সতত, সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় আত্মাকে নিজ গুণসমূহের দ্বারা বিমোহিত করে রেখেছেন এই প্রকৃতি।

আত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই প্রকৃতির, এই মায়ার নিয়ন্ত্রণে জাগতিক খেলায় মেতে আছেন। আত্মা শুধু নির্বিকার। কিন্তু প্রকৃতির সংসর্গে, মায়াগুণে বিমোহিত। নিজের শুধু সত্তা বিস্মৃত। তাই বাইরের বিষয় নিয়ে মেতে থাকাটাই জীবের ধর্ম। মায়ার জালকে কেটে বেরিয়ে আসুন মহারাজ, সদ্গুরুর সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করুন, জ্ঞানগর্ভ উপদেশে সম্বিৎপ্রাপ্ত হন, বিষয়দৃষ্টি হতে নিবৃত্ত হন। তাহলেই দেখবেন, জীবাত্মার মুক্তি। শুদ্ধ বুদ্ধ অবস্থা খুঁজে পাবেন আপনি।

কালনেমির এই উপদেশই ঠাকুর আরও সহজ করে বললেন—"দুইরকম 'আমি' আছে—একটা পাকা 'আমি' আর একটা 'কাঁচা'। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে—এগুলো কাঁচা 'আমি' আর পাকা 'আমি' হচ্ছে—আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত জ্ঞান স্বরূপ।"

ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত বাস্তব-বোধ সম্পন্ন। অবতারবরিষ্ঠায়। তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসীম। জীবনরসিক মহা-সাহিত্যিকও হার মেনে যাবেন তাঁর কাছে। তিনি জানাতেন, 'আমি' সহজে ঘুচবে না। বলছেন, "শরীর থাকতে আমার আমিত্ব একেবারে যায় না, একটু না, একটু থাকেই, যেমন নারিকেল গাছের বালদো খসে যায় ; কিন্তু দাগ থাকে। কিন্তু এই সামান্য 'আমিত্ব' মুক্ত পুরুষকে আবদ্ধ করতে পারে না।"

অনেক ছোকরা ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন জগৎ যদি মায়া, ভেলকি, এ মায়া যায় না কেন ? ঠাকুর বললেন, "সংস্কার-দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়। সংস্কারের কত ক্ষমতা শোন—একজন রাজার

লে পূর্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে, তখন বয়সীদের বলছে, ওসব খেলা থাক—আমি উপুড় হয়ে শুই, আর তোরা আমার পিঠে হুস করে কাপড় কাচ।....

ঠাকুর জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাহলে কি হবে ? এক জন্মে নাও হতে পারে। রে ফিরে আসা কর্মগতিতে ভেসে যাওয়া। কবে কোন্ এক জন্মে তিনি হাত ধরে পা করবেন, তা জানা তো নেই জীবের। যতদিন না কৃপা করছেন ততদিন বিষয় য় জর্জরিত, আত্মভোলা এক উন্মাদ। কেবল দাও, দাও। আরও চাই, আরও আরও। ড়, বাড়ি, নারী, ক্ষমতা, খ্যাতি। ঠাকুর মানুষের যে লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন, তারই টি—

মুখহলসা ভেতরবুঁদে, কানতুলসে
দীঘল ঘোমটা নারী।
আর পানাপুকুরের ঠাণ্ডা জল
বড়ই মন্দকারী।

হাউ হাউ করে সারাদিন অজস্র বকে মরছে এমন মানুষ। জানে না, অনেক কথার নেক দোষ। আবার ভেতরবুঁদে সেও এক ধরন। সব সময় ভেতরে ভেতরে গুমরে ছে। বুক ফাটে তো মুখ খোলে না। ঈর্ষায়, পরশ্রীকাতরতায় জ্বলে পুড়ে মরছে। খানি একটা কালো হোমদা মুখ নিয়ে ঘুরছে ফিরছে। সকলেরই সব হয়ে গেল, আমার হ হলো না রে। দীঘল ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচ। এরা সব কেমন মন্দকারী, পানাপুকুরের ঠাণ্ডা জলের মতো। কানে তুলসী, ফোঁটা তিলকচর্চিত মহাভক্তের ভেক। র বলছেন, "সাবধান। ধর্মের ভেক ভারি সাংঘাতিক।" ঠাকুর বলছেন, "ভক্ত কিংবা নীর ভাব বাইরে থেকে বোঝা বড় কঠিন হয়ে থাকে। যেমন দু'রকম দাঁত দেখা । বাইরের দাঁত কেবল দেখাবার তার দ্বারা খাওয়া চলে না, আর একরকম দাঁত ের ভেতরে আছে, তার দ্বারা খেয়ে থাকে।" ঠাকুর বলছেন, "ধ্যান করবে মনে, ে আর কোণে।" এক জটাজুটধারী ব্রহ্মচারী দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন ঠাকুরকে দর্শন তে। ঠাকুরের সামনে বসে আর কোনও কথা নেই কেবল 'শিবোহম্' 'শিবোহম্' করতে গলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বললেন, "কেবল 'শিবোহম্', বোহম্' করলে কি হবে ? যখন সেই সচ্চিদানন্দ শিবকে হৃদয়ে ধ্যান করে তন্ময় হয়ে য বোধে বোধ হয়, সেই অবস্থায় বলা চলে। তাছাড়া শুধু মুখে 'শিবোহম্' বললে হবে ? যতক্ষণ তা না হয়, ততক্ষণ সেব্য-সেবক ভাবে থাকাই ভাল।" ঠাকুরের দেশে ব্রহ্মচারীর চৈতন্য হলো। তিনি বুঝতে পারলেন নিজের ভুল। যাবার সময় ওয়ালের গায়ে লিখে রেখে গেলেন, "স্বামী বাক্যে আজ হতে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী সেব্য-ক-ভাব প্রাপ্ত হলো।"

মূল প্রশ্নটা হলো, আমরা গৃহী, সংসারের অনিত্য বস্তুকেই আমাদের নিত্য মনে হয়। ঈশ্বরকে চিন্তা করে আমাদের কি লাভ ! আমরা শুধু চাই, ভোগ চাই, ক্ষমতা চাই, নন্দ-ফূর্তি চাই। ঈশ্বর কি সেইসব দেবেন ? ঠাকুর বলছেন, শোনো তাহলে, কেন

ঈশ্বরমুখী হবে— "পাথর হাজার বৎসর জলে পড়ে থাকলেও তার ভেতর জল কখন ঢোকে না : কিন্তু মাটিতে জল লাগলে তখনি গলে যায়। যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত, তা হাজার হাজার আপদ-বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না ; কিন্তু অবিশ্বাসী মানু মন সামান্য কারণে টলে যায়।" যাঁরা তর্ক করতে চান, নানারকম সংশয় তু নিজেদেরটাকেই ঠিক বলে বোঝাতে চান, ঠাকুর বলতেন—"মতুয়ার বুদ্ধি। সকলেই ব আমার ঘড়িই ঠিক চলছে, কিন্তু সব ঘড়িই ভুল। তার্কিক তোমার তর্ক নিয়েই যদি এককথায় বুঝতে পারো তো আমার কাছে এসো। আর খুব তর্ক-যুক্তি ক বুঝতে চাও তো কেশবের কাছে যাও।" ঠাকুর বলতেন—"গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি-গাঁ বিবেকবৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা, অহংকারের গাঁট বেড়ে মাত্র।"

এক রাজা ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন—যে পাঠক ভাগবত পাঠ করে তাঁর মনে বৈর আনতে পারবে তাঁকে তিনি সমস্ত রাজ্য-পাট দান করে বনে চলে যাবেন। রাজত্বে ভাগ পাঠকের অভাব ছিল না। বড় বড় সব ভাষ্যকার। রাজা এই ঘোষণার সঙ্গে আর এ ভীষণ শর্ত জুড়ে দিলেন—বৈরাগ্য জাগাতে না পারলে ভাবগত-পাঠককে সারা জীবনে মতো কারাগারে ভরে দেওয়া হবে। রাজত্বের লোভে পাঠকরা সব ছুটে এলেন, রাজার মনে বৈরাগ্য জাগাতে ব্যর্থ হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। অবশেষে সেই রাজ্যে শ্রেষ্ঠ পাঠক, বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন। তাঁর স্ত্রী স্বামীকে সাবধান ক বললেন—কেন যাচ্ছ ? কেউ যা পারল না, তুমি কিভাবে তা পারবে ?' ব্রাহ্ম বললেন—'আমি এত বছর ধরে ভাগবত পাঠ করছি. পাঠক হিসেবে আমার এত খ্যাতি আমি না পারলে আর কে পারবে ব্রাহ্মণী ! আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

ব্রাহ্মণ রাজসভায় গিয়ে পাঠ শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পাঠ শোনার পর রাজামশা বললেন, 'খুব হয়েছে, আপনার পাঠ শুনে বৈরাগ্য তো এলোই না, উল্টে বিষয়তৃষ্ণ আরও বেড়ে গেল।' ব্রাহ্মণ চলে গেলেন কারাগারে। সেই ব্রাহ্মণের একমাত্র ছে গৃহত্যাগ করে অতি বাল্যে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলো। সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়ম আছে বারো বছর পরে জন্মস্থানে ইচ্ছে করলে একবার আসা চলে। যুবক সন্ন্যাসী সেই অনুসা এসেছেন। সামনেই মা। তিনি জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে চিনতে পারলেন না নিজের পু বলে। ছেলে দেখছে, মায়ের মাথায় সিঁদুর রয়েছে, কিন্তু বাবাকে দেখতে পাচ্ছে না সে তখন জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার স্বামী কোথায় মা ?' মা তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন সন্ন্যাসী সব শুনে রাজদরবারে এসে বললেন—আমি আপনাকে ভাগবত শোনাবো অল্পবয়সী সেই সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে রাজামশাই বললেন, আপনি আমার শর্ত জানে তো ?' সন্ন্যাসী বললেন, 'অবশ্যই জানি।' শুরু হলো পাঠ। প্রথম দিনে পাঠ আর ব্যাখ শুনে রাজামশাইয়ের ভেতরটা আনচান করে উঠল। দ্বিতীয় দিনের পাঠ শেষে রাজ বললেন, 'আর প্রয়োজন নেই, আমি শর্ত অনুসারে সমস্ত রাজ্য আপনাকে দিলাম সন্ন্যাসী বললেন, 'রাজ্য নিয়ে আমি কি করব মহারাজ, বরং আপনি যাঁদের কারাগা রেখেছেন তাঁদের এইবার মুক্ত করে দিন।' রাজ আদেশে সবাই মুক্ত হয়ে দরবারে এলেন

তাঁদের মধ্যে সন্ন্যাসীর পিতাও রয়েছেন। তিনি যখন শুনলেন, ওই যুবক সন্ন্যাসীর পাঠে রাজার বৈরাগ্যোদয় হয়েছে, তাঁর অহংকারে লাগলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এই অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে ? সন্ন্যাসী, তুমি কি আমার চেয়েও ভালো পাঠক ?' সন্ন্যাসী বললেন, 'আপনারা দু'জনে আমার সঙ্গে বাগানে চলুন।' বাগানে নিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী রাজামশাইকে একটা গাছে বাঁধলেন আর কিছু দূরে অপর একটা গাছে পিতাকে বেঁধে বললেন, 'এইবার পর পরস্পরকে মুক্ত করুন।' পিতা বললেন, 'তা কি করে হয়, আমি বাঁধা পড়েছি, রাজামশাইয়ের বন্ধন মোচন করবো কি ভাবে ?' সন্ন্যাসী হেসে বললেন, 'এইটাই আমার উত্তর। আমার পাঠ আহা-মরি কিছু নয়, কিন্তু আমি সংসারের বন্ধনমুক্ত। আমি মুক্ত বলেই আপনাদের রাজার বন্ধন খুলতে পেরেছি।' তুলসীদাস ঠিক সেই কারণেই বলছেন—

অষ্টপ্রহরে একটি প্রহর কিংবা অর্ধ তার,
সাধুর সঙ্গ করিও তুলসী দূরে যাবে দুখভার।

ঠাকুর বলছেন, "জীবাত্মা-পরমাত্মার মধ্যে এক মায়া-আবরণ আছে। এই মায়া-আবরণ না সরে গেলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় না। যেমন অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা এবং পশ্চাতে লক্ষ্মণ। এস্থলে রাম পরমাত্মা ও লক্ষ্মণ জীবাত্মাস্বরূপ, মধ্যে জানকী মায়া-আবরণ হয়ে রয়েছেন। যতক্ষণ মা জানকী থাকেন, ততক্ষণ লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান না। জানকী একটু সরে পাশ কাটালে তখন লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান।

শ্রীবশিষ্ঠ রামকে বলছেন—'স্নেহভাজন রাম! এই বিশ্ববিমোহিনী মায়া কি বিচিত্র! এই মায়ায় মোহিত হয়ে জীব সর্ব-ব্যাপ্ত আত্মাকেও জানতে পারে না।'

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিত্তন্নাস্তি কিমপি ধ্রুবম্।
যথা গন্ধর্বনগরং যথা বারি মরুস্থলে॥

জগৎ আর কিছুই নয়, একটা অপূর্ব মরীচিকা। আকাশের গায়ে গন্ধর্বনগর। কী অপূর্ব তার শোভা। ধূ ধূ মরুভূমিতে মিথ্যা নীল সরোবর। দ্রষ্টা, তুমি যেই চোখ তাকাবে দেখবে কিছুই নেই। সব বাইরের। ভেতরে কিছু নেই।

স্বজ্ঞানদর্পণে স্ফারে সমস্ত বস্তুজাতয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ।

সরোবরের তীরে গাছ। নিজেরই বিশাল জ্ঞানদর্পণে সেই গাছ, সেই জগতের প্রতিফলন। প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ। এই হলো মায়া। নির্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে মায়ার স্পন্দনই হলো সৃষ্টি। ঠাকুর একটি গান প্রায়ই গাইতেন—

ভবে আসা খেলতে পাশা কত আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙা দশা প্রথমে পঞ্জড়ি পেলাম॥
পো বার আঠার ষোল যুগে যুগে এলাম ভালো।
শেষে কচে বারো পড়ে মাগো, পঞ্জাছক্কায় বন্দী হলাম॥

তুলসী বলছেন—'জীব নাহি জানে কেবা ঈশ্বর, কাহারে বা বলে মায়া। মুক্তি বাঁধন এই সংসারে সকলি শিবের ছায়া।' ঠাকুর সুন্দর একটি গল্প বলতেন—"একজন চাষীর

বেশি বয়সে এক ছেলে হয়েছিলো। ছেলেটিকে খুব যত্ন করে। ছেলেটি ক্রমে বড় হলো। একদিন চাষী ক্ষেতে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে ছেলেটির ভারি অসুখ। ছেলে যায়। বাড়িতে এসে দেখে ছেলে মারা গেছে। পরিবার খুব কাঁদছে, কিন্তু চাষার চোখে একটুও জল নেই। প্রতিবেশীদের কাছে তাই পরিবার আরও দুঃখ করতে লাগলো যে এমন ছেলেটা গেল, এর চোখে একটু জল পর্যন্ত নেই। অনেকক্ষণ পরে চাষা পরিবারকে সম্বোধন করে বললো, 'কেন কাঁদছি না জানো ? আমি কাল স্ব দেখেছিলুম যে রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপনে দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর। ক্রমে বড় হলো, বিদ্যাধর্ম উপার্জন করলে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল ; এখন ভাবছি যে, তোমার ওই এক ছেলের জন্যে কাঁদবো, কি আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদবো।" কি অপূর্ব কথা বলেছেন, 'মানসোল্লাস-বর্তিকা'—

অবিচারিতসিদ্ধেয়ং মায়া বেশ্যা বিলাসিনী।
পুরুষং বঞ্চয়ত্যেব মিথ্যাভূতৈঃ স্ববিভ্রমৈঃ ॥

যুক্তিহীন প্রকাশরূপিণী, বিচিত্র বিলাসকারিণী, বেশ্যাতুল্যা মায়া মিথ্যাভূত নানা বিভ্রম সহায়ে পুরুষকে বঞ্চনা করে চলেছে, এর আর শেষ নেই। এই খেলার। এই মিথ্যা আমারই বিষয়-ভোগ-বাসনায় আরও জাঁকিয়ে বসে। আচার্য শ্রীশঙ্কর এই চক্রটির সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন- বাসনা যেই বাড়লো, মানুষ অমনি মেতে উঠলো ভোগপ্রদ সকাম কর্মে। এই কর্মে বাসনা আরও বেড়ে গেল। জীব আগাপাশতলা জড়িয়ে গেল সংসারবন্ধনে। এর আর নিবৃত্তি নেই।

ঠাকুর বিষয়টিকে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। বোঝাপড়া যার যার নিজের সঙ্গে প্রথমে বিচার। কি বিচার ? আমাকে ভূত ধরেছে—"যাকে ভূতে পায় সে যদি জানতে পারে যে তাকে ভূতে পেয়েছে, তাহলে ভূত পালিয়ে যায়। মায়াচ্ছন্ন জীব যদি একবার ঠিক জানতে পারে যে, তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে তাহলে মায়া তার নিকট থেকে তখনই পালায়।

"সংসারে দু'রকম স্বভাবের লোক দেখতে পাওয়া যায়—কতকগুলো কুলোর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট আর কতকগুলি চালনির ন্যায়। কুলো যেমন ভূষি প্রভৃতি অসার বস্তু সব পরিত্যাগ করে সার বস্তু যে শস্য সেইগুলি আপনার ভেতরে রাখে, সেইরকম কতকগুলি লোক সংসারের অসার বস্তু পরিত্যাগ করে সার বস্তু ভগবানকে গ্রহণ করে। চালুনি যেমন সার বস্তুসকল পরিত্যাগ করে অসার বস্তুগুলি নিজের ভেতর রাখে সেইরূপ সংসারে কতকগুলি লোক সারবস্তু ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে অসার বস্তু কামকাঞ্চনাদি গ্রহণ করে।"

এখন উট হবে না, হাঁস হবে, নিজেই বিচার করো। পথ গেছে এইভাবে—প্রথমে বৈরাগ্য, তারপর বিশ্বাস, তারপর ভালবাসা, তারপর বিরহ—তুমি কোথায় ! শেষে অশ্রু বিসর্জন। আর কোনোও কিছুর প্রয়োজন নেই। সব আচার-বিচার ব্যর্থ যদি বৈরাগ্যোদয় না হয়। ঠাকুরের কথা আর মীরাবাঈয়ের কথা এক—

তুলসীর মালা গলায় পরিলে যদি পাওয়া যায় হরি,
আমি তবে ভাই ডালপালাগাছ উখাড়ি গলায় পরি।
পাথর পূজিলে যদি সহজে পাওয়া যায় হর-হরি
আমি তবে ভাই সোজা চলে যাই,
পাহাড়ের পুজো করি ॥ (অনুবাদ : রামপ্রদাস সেন)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আছেন, আমরাও আছি। তিনি সর্বকালের সর্বমানবের পথপ্রদষ্টা। আমার পথ, তোমার চলা। তিনি জানেন সব ঘুড়ি কাটে না--

বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে,
হেসে দাও মা হাতচাপড়ি ॥

তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়োদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়, তাই লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি। তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন, যা এখন সংসার করগে যা। মনের কি দোষ। তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয়-বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।

মন-গরিবের কি দোষ আছে,
শ্যামা-মা যেমন করান তেমনি করে ॥

একটি হাত রাখো সংসারে, আর এক হাত তাঁর পাদপদ্মে। সময় হলে দু'হাতে ধরো তাঁকে। হুঁস রাখো, মান যুক্ত হুঁস, তবেই তুমি মানুষ।

হনুমান

মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চায়। জীবজগতের অন্য প্রাণী তা চায় না। তারা বাঁচে, সংগ্রাম করে, কালে মরে যায়। কারণ তাদের স্থিতি অস্থিতি আছে ; কিন্তু কোনো প্রশ্ন নেই। আমরা সবাই কালের অধীন—

'কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥'

কাল খেলা করছেন। মহাকাল। খেলা করছেন আমাদের জীবন নিয়ে। আমরা আছি বলেই কালের গতি। নশ্বর আছে বলেই অবিনশ্বরের অনুভূতি। আসলে কাল হল স্থির। তার নিজস্ব কোনো গতি নেই। আজ-কাল-পরশু আপেক্ষিক শব্দ। কালের আজ, কালের পরশু নেই। আমার আছে। 'আজ' আমার ; কারণ আমার অবস্থিতি সময়ের অনুভূতিতে বাঁধা। দৃশ্য জগৎ সেই অনুভূতির স্রষ্টা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত আবার সূর্যোদয়, মানুষ ভাবে, চলে গেল একটা দিন। আমার জীবনের একটা দিন। ভাবনার কারণ আমি অমর নই। আমার জীবন, দিনের সংখ্যায় বাঁধা। সেই সংখ্যা আমার জানা নেই। ব্যাঙ্কে আমার কিছু পুঁজি আছে ; কিন্তু পাশবই আমার হাতে নেই। হিসেব আছে আমার ব্যাঙ্কারের কাছে। আমি রোজ চেক কাটছি, কবে বাউন্স করবে আমি জানি না। জানি, আমি একটা ঘড়ি। টিকটিক করে চলছি। কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। কবে দম ফুরোবে আমি জানি না। আমার চলাটাই কাজ। তাই চলছি। বা আমার নিয়তি হল, থামা চলবে না। থামতে দেবে না আমাকে। দম ফুরোবে তবেই আমি থামবো আর তার নামই হল আমার মৃত্যু। মোমবাতির সঙ্গে তুলনীয় আমি। আমি জ্বলবো, আমি গলবো। গলতে গলতে নিঃশেষ হয়ে যাবো একদিন। জ্বলাটাই আমার ধর্ম, গলাটাই আমার নিয়তি।

মৃত্যুই যদি আমার ভবিষ্যৎ, তাহলে ভবিষ্যৎ নিয়ে এত উদ্বেগ কেন ? কেন আমার এত মৃত্যুভয় ! কারণ, আমি মানুষ। আমি চিন্তাশীল। আমার মৃত্যুভয় চাপা পড়ে যায় আমার অস্তিত্ব রক্ষার ভয়ে। এই মরণশীল সংসারে আমি মূর্খের মতো বাঁচতে চাই অনন্তকাল। আর এই ইচ্ছাই তৈরি করে আমার অহংকার। 'আমি'-র অহংকার। বড় আমির পাশে ছোট আমি। জীবের আমি। তামসিক আমি। আর এই আমি আবার মায়ার বশীভূত।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই। ঠাকুর বলুন, আমার আমি কবে তুমি হবে

কুর বলছেন, শোনো শোনো। অত সহজ নয় যে এক ঝাড়ফুঁকে তোমার আমি চলে বে ? যে জানতে পারে তাকে ভূতে ধরেছে, তার ভূত ছেড়ে যায়। সে তো জানতেই রবে না। 'আমি' সেইরকম এক ভূত। 'কলি'তে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। সোঽহং বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার আমিই ব্রহ্ম বলা ঠিক যাঁরা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের আমি কোন মতে যাচ্ছে না। তাদের মি দাস, আমি ভক্ত এ অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

ঠাকুর বলছেন জ্ঞান অস্ত্র দিয়েও 'আমি'কে কাটা যায়। কি রকম ? "জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারী সেই ইট, চুন, সুরকিতে সিঁড়িও তৈয়ারী। নেতি নেতি করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হচ্ছে তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ। ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি; নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। আমি যায় না। তখন দেখে, তিনি আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।"

তাহলে আমি কি করব ঠাকুর ?

তুমি কি করবে ? তাই না ! 'আমি' কি করবে ? তাই তো ? শোনো, 'জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিপথও সত্য—সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ আমি রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।'

কিছু অস্ত্র তোমার হাতে তুলে দি :

এক নম্বর—সেব্য-সেবক ভাব। সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' তো যাবার নয়। তবে থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। হনুমান হও। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হনুমান তুমি আমায় কিভাবে দেখ ?' হনুমান বললে, "সে ভারি মজা। রাম ! যখন 'আমি বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ তুমি প্রভু আমি দাস। আর রাম ! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।" তাহলে তুমি হনুমান হও।

দু নম্বর—মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি—কলকাতায় কর্ম করতে আসা।

তিন নম্বর—হাম্বা হাম্বা কোরো না। করো তুঁহু তুহুঁ। গরুকে স্মরণে রাখো। গরু হাম্বা হাম্বা করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদবৃষ্টি গায়ের ওপর দিয়ে যায়। আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয় তখন খুব পেটে। তবুও নিস্তার নেই। শেষে নাড়ীভুড়ি থেকে তাঁত তৈয়ারী হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। 'তখন আর 'আমি' বলে না; তখন বলে তুঁহু তুঁহু। তখন নিস্তার।

তুমিও বলো, হে ঈশ্বর, আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে, তুমি মা। আগেই বলো। শমন এসে ধরার আগেই বলো।

নি, সা

নি। নি-যুক্ত কিছু শব্দ স্মরণে আনা যাক। নিজের স্বার্থে। যেমন, নিষ্কাম, নিষ্ক্রোধ
নির্বৈরী, নিরাসক্ত, নির্লোভী। নি-এর খেলা। আমরা যারা ঠাকুরের সন্তান তাদের এ
নি-র সাধনা করতে হবে। গানের উপমা, সা-তে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। নেমে আসে
হয় নি-তে। তারার সা হল সাধনের শেষ স্থিতি। তার আগে 'নি' ছুঁয়ে আসতে হবে
নিষ্কাম, নিষ্ক্রোধ, নির্বৈর, নিরাসক্ত, নির্লোভ, নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, নির্বিরোধ আব
নিরলস। যত রকমের 'নি' আছে, সব সাধন করে তবেই 'সা' স্পর্শ করতে হবে। 'সা
তে আরোহণের অধিকার অর্জন করতে হবে।

নিষ্কাম শব্দটি একই সঙ্গে অনেক কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে আছে। আচ্ছা গীতার দিে
তাকাই—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে॥

বিষয়ের চিন্তা। ধন, জন, অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ভোগসুখ। চলেছে, চলেে
অনন্ত সে মালা। আমার চাই। এক পাই, তো আর একটা চাই। লোভাগ্নি, ঘৃতাহুতি
আসক্তির নাম কামনা। কামনা হল তৃষ্ণা। আনকোয়েঞ্চিং থার্স্ট। কামনা প্রতিহত হলে
ক্রোধ। আমার চাই। যেই আমি পেলুম না, কেন পাবো না ? ক্রোধে অগ্নিশর্মা। এইব
ক্রোধ, সে আরও সাংঘাতিক,

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

রেগে গেলে মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানলোপ—জ্ঞান লুপ্ত হয়। বিবেকনাশ হয়
বিবেক কি ? যা আমাকে শেখানো হয়েছে, শাস্ত্র, আচার্য, সংস্কার, আমাকে
শিখিয়েছেন। আমার সেই চেক ভালভ্' সাময়িক অকেজো হয়ে গেল। আর শ
সংস্কারের স্মৃতিবিলোপ ঘটল। এই স্মৃতিবিভ্রমের ফলে আমার বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল
কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ কি শোভন, কি অশোভন, সব আমার গুলিয়ে গেল। য
বিচার গেল তার আর রইলটা কী ? আমি তখন পুরুষার্থের অযোগ্য। আমি তখন সু
প্রকৃতিস্থ নই, অপ্রকৃতিস্থ উন্মাদ। ছোট্ট একটি উদ্ধৃতি হোরেসের—Ira furor brevis e

ইংরেজি, Anger is a brief madness.

কি রকম হল ? অনেক সাপ। একটা খোঁচা খেলেই সবকটা কিলবিল করে উঠল। চেন-রিঅ্যাকসান। নিউক্লিয়ার ফিসান-এর মতো। সেটা কি ? একটা লম্বা কাগজ। একটা মাথা আগুনে ঠেকালুম। কাগজ পুড়তে পুড়তে ডগা থেকে আগা পর্যন্ত ছাই হয়ে গেল। কালো পোড়া ছাই। আমার আসক্তি, আমার প্রবৃত্তি, আমার লোভ আমার অনন্ত চাওয়া। সব চাওয়াই পাওয়া হয় না। তখনই ক্রোধ। ক্রোধাগ্নি আমার পুরো সত্তাটাকেই পুড়িয়ে দিলে। তাহলে আমি কি করবো ?

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছিতি ॥

খুবই কঠিন নির্দেশ। সারা জীবনের সাধনা, মানে 'সা'। 'নি' রপ্ত না হলে 'সা' আসবে কেন ? প্রিয় বস্তুতে আমার স্বাভাবিক আসক্তি, অপ্রিয় বস্তুতে আমার স্বাভাবিক বিদ্বেষ। তা আমি কী করব। সংযতচিত্ত হবো। নিজেকে বাঁধবো যুক্তি দিয়ে। বিচার দিয়ে। ঠাকুর বলছেন, বিচার করবে। সদসৎ বিচার। আসক্তি আর বিরাগ দুটোকেই আমি দূর করে ফেলে দেবো। রাগ-অনুরাগ-বিরাগ সব কিছুর বাইরে যাবার চেষ্টা করব। ঠাকুর বলছেন, তুমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নও। তুমি গৃহী। কিছু প্রয়োজন তোমার থাকবেই। ইন্দ্রিয় স্ববশীভূত হলেও, কিছু তোমার চাই দেহধারণের জন্যে। সেইটুকুই তুমি অর্জনের চেষ্টা করবে। অনাসক্তভাবে গ্রহণ করবে। কিরকম অনাসক্তি ? না, বিষয় যেন কয়েক কণা ঘাস। পড়ে আছে। নিতান্তই প্রয়োজন তাই তুলে নিচ্ছি। ঠাকুর বলছেন, প্রয়োজনের বেশি এক তিলও নয়। ঠাকুর আমার মনে একেবারে দেগে দিয়ে গেছেন—'ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মতো। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না। সাত সমুদ্র নদী ভরপুর ! সে অন্য জল খাবে না ! কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনী-কাঞ্চন কাছে রাখবে না, পাছে আসক্তি হয়।" 'নি' না হলে 'সা' হয় না।

পুরুষ সাবধান

পুরুষদের বিশ্বাস করতেন না বলেই ঠাকুর নারীর সঙ্গে সম্পর্কে অতটা কঠোর হতে বলেছিলেন। পুরুষই ভোগবাসনায় নারীকে টেনে নামিয়ে আনে জগন্মাতার আসন থেকে ভোগের সংসারে। দ্বিতীয় দর্শনের দিনে শ্রীম-র সঙ্গে তাঁর কথোপকথন অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে ঠাকুরের মনোভাব।

ঠাকুর ॥ দেখ, তোমার লক্ষণ ভালো ছিল। আমি কপাল, চোখ এসব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?

মাস্টার ॥ আজ্ঞে ভালো, কিন্তু অজ্ঞান।

ঠাকুর অমনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আর তুমি জ্ঞানী?

মাথা হেঁট করে মাস্টার মহাশয় ভাবতে লাগলেন, জ্ঞান কাকে বলে আর অজ্ঞান কাকে বলে আমার জানা হয়নি। এতকাল জেনে এসেছি, লেখাপড়া শিখলে, বই পড়তে পারলে জ্ঞান হয়। না, তা নয়। মহাপুরুষের সংশ্রয়ে এসে সেই ভুল আজ ভেঙে চুরমার। ঈশ্বরকে জানবার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই কিছু নয়। ভাবনা যখন চলছে তখন আবার পড়ল ঠাকুরের প্রশ্নের চাবুক—"তুমি কি জ্ঞানী?"

মাস্টার মহাশয়ের অহংকার কুঁকড়ে গেল। কে জ্ঞানী?

যে-পথ সাধনের পথ, যে-পথের শেষে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, সেই পথের পথিক হতে হলে দু-নৌকোয় পা রাখা চলবে না। গাছেরও খাব তলারও কুড়ব, সে আবার কি? ইয়ারকি না কি? মুখে বলি হরি কাজে অন্য করি! 'নিক্তি'র সাধনা। 'নিক্তি'ই হলো আদর্শ। ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে বলছেন, "নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে, নিচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নিচের কাঁটাটি মন—ওপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নিচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। বস্তু বিচার করবে। মেয়েমানুষের শরীরে কী আছে—রক্ত, মাংস, চর্বি, নাড়ীভুড়ি, কৃমি, মুত বিষ্ঠা এইসব। সেই শরীরের উপর ভালবাসা কেন?

এর মানে এই নয়, যে বিয়ে করে সংসার-টংসার হয়ে যাবার পর বউকে ধরে পেটাও, কে আমার বৈরাগ্য এসেছে গো, আমি সংসারে নেই, তোমরা এবার চরে খাও। আমার ঠাকুর অত সোজা ছিল না। ফাঁকি-বাজি, ওপরচালাকি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রারব্ধ তোমাকে ক্ষয় করতেই হবে।

প্রতাপচন্দ্র হাজরার ভাই এসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কিছু দিন ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীমকে বলছেন, "প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম নেই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগ-ছেলে সব শ্বশুর বাড়িতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আমি বকলুম, দেখ দেখি ছেলে-পিলে হয়েছে ; তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মানুষ করবে ? লজ্জা করে না যে, মাগ-ছেলেদের আরেকজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বকলুম আর কাজকম্ম খুঁজে নিতে বললুম।"

এই হলেন ঠাকুর ! সংসারী, সংসারের কর্তব্য পালন করবে না, তা হবে না। সেখানে ধর্মের দোহাই পাড়লে চলবে না। সেখানে কামিনী ত্যাগ কাঞ্চন ত্যাগের বাহানা হলো আলস্য। অলসদের ঠাকুর সুন্দর একটি বিশেষণ দিয়েছিলেন, 'কুমড়োকাটা বটঠাকুর'। বললেন, "এক একজন পুরুষ থাকে—মেয়েছেলে নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাইরের ঘরে বসে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক খায়, নিষ্কর্মা বসে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনো গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বটঠাকুরকে ডেকে আন—কুমড়োটা দু-খানা করে দেবেন। তখন সে কুমড়োটা দু-খানা করে দেয়। এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে 'কুমড়োকাটা-বটঠাকুর'।

এরপরেই ঠাকুর বলছেন, "ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ কর।" অলস হয়ে গাল-গল্প, কি তাসপাশা খেলে জীবন কাটিও না। কর্ম আর ধর্মকে মেলাও। দুপাল্লায় দুটি চাপাও, তবেই নিক্তির নিচের কাঁটা আর ওপরের কাঁটা টায়টায় মিলবে। বলছেন, "আর যখন একলা থাকবে তখন ভক্তিশাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত—এই সমস্ত পড়বে।"

ঠাকুর, 'টাকা মাটি' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন কাঞ্চন। সংসারী মানুষের ক্ষেত্রে সেটা হবে বাড়াবাড়ি। ঠাকুর বলতে পারেন, "রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না।" তিনি পারেন বুক ঠুকে এমন কথা বলতে ; কারণ তিনি ছিলেন অবতার। মায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণে কোনোও ফাঁকি ছিল না। 'টোটাল সারেন্ডার'। সংসারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। শ্রীম-র মনে সংশয় ছিল। একদিকে হিন্দি দোঁহা—'যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম, যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম।' রাম আর কাম কি একসঙ্গে হয় ?'

ঠাকুর বললেন, কর্ম সকলেই করে—তাঁর নাম গুণগান করা ; এত কর্ম ; সোহংবাদীদের 'আমি সেই' এই চিন্তাও কর্ম ; নিশ্বাস ফেলা এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার যো নেই। তাই কর্ম করবে—কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।"

শ্রীম সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, "আজ্ঞে, যাতে অর্থ বেশি হয় এ চেষ্টা কি করতে

পারি ?"

ঠাকুর বললেন, "বিদ্যার সংসারের জন্যে পারা যায়। বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যা ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নেই।" ঠাকুর শ্রীমকে বললেন না যে তুমি আমার মতো 'টাকা মাটি' বলে পরিবার পরিজনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাও। শ্রীম জিজ্ঞেস করলেন, "আজ্ঞে, পরিবারদের উপর কর্তব্য কতদিন ?"

ঠাকুর বললেন, "তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার নেবার দরকার নেই, পাখির ছানা খুঁটে খেতে শেখার পর আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোক্কর মারে।" স্ত্রীর মধ্যে ঠাকুর যেসব ভাবের সমাবেশ দেখেছিলেন, তা হলো শান্তভাব, নিষ্ঠা। "সে জানে আমার পতি কন্দর্প। দাস্য—স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে, যশোদারও ছিল। সখ্যভাব—অর্থাৎ বন্ধুভাব। এস, এস, কাছে এসে বস। বাৎসল্য—স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। মধুর—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুরভাব।" অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ভাবের আকার নারী। এই ভাবে এই আশ্রয় করেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। নারীর এইভাব সহজাত। মুখ একটু ঘোরাতে পারলেই ঈশ্বর। তাহলে কে আগে পাবে। পুরুষ না নারী।

ঠাকুর বলছেন, "কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখনি বর বোকাটি পিছনে বসে থাকে ? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।" ঠাকুরের মূল কথা হলো, "যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে, রাজা, দুষ্ট-লোক, স্ত্রী। নিজের আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পথে যেতে পারে। নিজে ভালো হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সেও ভালো হতে পারে।"

ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, "ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়। ঈশ্বরের কথা নিয়ে দুজনে থাকে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি।"

ঠাকুর, আপনাকে বোঝা অত সহজ নয়। নারীতে জগন্মাতাকে অবতীর্ণ করাতে যাঁরা জানেন না, তাঁরা সাবধান! ঠাকুরের কৃপা থেকে তাঁরা অনেক দূরে।

লজ্জা

'লজ্জা হয় না !....যে শরীর থাকবে না—যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা, যত প্রকার অপবিত্র জিনিস—সেই শরীর নিয়ে আনন্দ। লজ্জা হয় না !" এই লজ্জাটুকুই বারে বারে ঠাকুর জাগাতে চেয়েছিলেন গৃহীদের মনে। গৃহী হও সংসারী হও ; কিন্তু নির্লজ্জ হয়ো না। সংসারীরও একটা আদর্শ থাকা চাই। ঈশ্বর শুধু সাধুর সম্পত্তি নয়, সাধনার প্রাপ্তি। যে সাধন করবে সেই পাবে। ঠাকুর বলেছেন, তুমি তাঁর দিকে এক পা এগোলে তিনি তোমার দিকে একশো পা এগিয়ে আসবেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তিনি কে ? মাস্টারমশাই প্রশ্ন করছেন, ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চোখে হয় ?

ঠাকুর বলছেন, তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ, সেই চোখে তাঁকে দেখে সেই কানে তাঁর বাণী শোনা যায়।

এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন হলো—কিভাবে কি হবে ? এ তো বললে হবে না। শুনলেও হবে না। পড়লেও হবেনা। একটি মাত্র উপায়—ভালবাসা। ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা এলে তবেই তো চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারিদিকে হলদে দেখা যায়। তারপর কি হয় ? ধরে রাখতে পারলে—তিনিই আমি এইটি বোধহয়। যেমন মাতালের নেশা বেশি হলেই বলে—আমিই কালী। গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলত—আমিই কৃষ্ণ। ঠাকুর বলছেন—তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারদিকে দেখা যায়—যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাকো' তবে খানিকক্ষণ পরে চারদিকে শিখাময় দেখা যায়।

ভালবাসা বললেই তো আর ভালবাসা আসবে না। একটু বিচার চাই। বিচার হলো—মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছেন পথের শেষে—রাজা, উজির, ফকির, আমির সকলেরই ঐ এক গতি। ঠাকুর বলছেন—মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে—'এ বাগানটি আমাদের', 'এ পুকুর আমাদের পুকুর'। কিন্তু কোনো দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দুকটা লয়ে যাবার

যোগ্যতা থাকে না। দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।

বাবুর বাগান এই সংসার। রেখেছেন, বেশ ভালো কথা। আছি। থাকব ততদিন, যতদিন না তিনি আমাকে তুলে নিচ্ছেন। 'আমি আমি' ততটুকুই করব যতটুকু না করলে নয়। এক ধরনের অহংকার আছে যা বড়ই লজ্জার। চিটচিটে আমি। অন্ধ আমি। সেই আমির হাঁকডাকে নিতান্ত সাধারণ মানুষও হাসে। নীচ আমি। জ্ঞানীর আমি ম[illegible] ধূপের মতো ধোঁয়া ছাড়ে না। সে আমি ধূপের মতো। সেই আমি কিঞ্চিৎ ভীত [illegible] ভেবে—কোথায় আমি—'আমি, আমার' করছি। জীবনের কাছাটি খুলে দিলে সব হম্বিতম্বির অবসান। এই বোধ থেকে আসে জ্ঞান। ঠাকুর বলছেন—জ্ঞান কাকে বলে ; আর আমি কে ? ঈশ্বরই কর্তা, আর সব অকর্তা। এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্তা—তাঁরই হাতের যন্ত্র। তাই আমি বলি, মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; তুমি ঘরণী, আমি ঘর ; আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনীয়ার ; যেমন চালাও, তেমনি চলি, যেমন করাও, তেমনি করি ; যেমন বলাও, তেমনি বলি। নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। তুমিই সব। ঠাকুর বলছেন : 'মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম ; বলেছিলাম—এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।"

সব সমর্পণ করে দাও। তবেই মিলবে তাঁর কৃপা। সব ছাড়লে, তবেই সব পাবে জ্ঞানী থেকে ক্রমে বিজ্ঞানী। ঠাকুর বলছেন—বিজ্ঞানী কেন ভক্তি নিয়ে থাকে ; এর উত্তর এই যে আমিত্ব যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের অহং যায় না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তার পরদিন ফেকড়ি বেরিয়েছে। জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'অমি' এসে পড়ে। স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক দুড়দুড় করছে ; জীবের আমি নিয়েই তো যত যন্ত্রণা।

ঠাকুর এইবার একটি উপমা দিচ্ছেন—গরু 'হাম্বা' 'হাম্বা' ('আমি' 'আমি') করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদ-বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়—তখন খুব পেটায়। তবুও নিস্তার নেই। শেষে নাড়ীভুড়ি থেকে তাঁত তৈরি হয়। সেই তাঁতে ধুনুরির যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে তুঁহু তুঁহু। যখন 'তুমি, তুমি' বলে তখন নিস্তার।

'আমি'ই হলো মহাকাল। আমার সংসার, আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার চাকরি, আমার নাম, আমার যশ, আমার খ্যাতি। ছোট্ট একটা আমি হাঁচড়-পাঁচড় করে সবকিছুতে ধরতে চায়। আর প্রতিপদে জীবন তাকে চাবকায়। তাহলে কোন্ ভাবটা নিয়ে চলতে হবে ? সেই লজ্জা—আরে ছি ছি, আমি একটা বুড়ো দামড়া, এই পরবাসে এসে, আমি আর আমার করে মরছি। ধক্ করে হৃৎপিণ্ডটা একবার তালকাটা ছন্দে লাফ মারল। হাত থেকে খসে পডল চায়ের কাপ। চোখ কপালে। কান্নার সানাই বেজে

উঠল চারপাশে। তারপরের দৃশ্য ঠাকুরই এঁকে দিয়ে গেছেন—বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে—'তুমি তো চললে ? আমার কি করে গেলে ?' ঠাকুর বলছেন : "আবার এমনই মায়া যে প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বললে বদ্ধজীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে। বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না।" ঠাকুর বলছেন—সংসারে হনুমান হয়ে থাক—'দেখ, হনুমানের কি ভাব ! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না ; কেবল ভগবানকে চায় ! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয় ; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়।' হনুমান কি বলেছিল—ঠাকুর গানে বললেন :

আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল ;
মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম-হৃদয়ে॥
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই
যখন যে ফল রাঙা সেই ফল প্রাপ্ত হই।

রাম জিজ্ঞাসা করলেন—হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ ? হনুমান বললে, রাম ! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস। আর রাম ! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

ঠাকুর বলছেন—সেব্য-সেবকভাবই ভালো। 'আমি' তো যাবার নয়। তবে থাক্ শালা—'দাস আমি' হয়ে। ঠাকুর বলছেন—লজ্জা ! একটু লজ্জা বোধ করো—আমির দাসত্ব কোরো না। দাস আমি হও। আমির দাসত্ব মানে, 'আমি' তোমাকে বাঁদর-নাচ-নাচাবে। 'আমি ও আমার'—এই দুটি অজ্ঞান। এই অজ্ঞানে যেন লজ্জা আসে। আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বিদ্যা। আমার এই সব ঐশ্বর্য, এই যে ভাব, এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এসব তোমার জিনিস—বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, "এসব তোমার জিনিস'—এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়। সংসারই মায়া। "ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায়—মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয়—বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না।" এই বেহুঁশ হয়ে থাকাটাই লজ্জার। বেহুঁশ অবস্থার প্রতি বিষম ঘৃণার ভাব আনে ঈশ্বরে ভক্তি। তাই প্রথম উপপাদ্যটি হলো লজা। বড় লজ্জা।

হাসছে কেমন

অতি সাবধানে চলাফেরার জায়গা এই পৃথিবী। কবে কোন্ ছেলেবেলায় এসে পড়েছিলুম--পথে বড় রিপুভয়। ছোকরা সে কথা কি শুনেছে। আলগা মুঠো থেকে 'আমি'-টা খুলে পড়ে জীবন-অরণ্যে হারিয়ে গেছে। সবাই সব কিছু শেখাবার চেষ্টা করলেন, হাতে তুলে দিলেন জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার ; কিন্তু মনটাকে মুঠোয় ধরার কৌশল কেউ শেখালেন না। পথ আর বিপথ চিনতে চিনতেই--খেল খতম, পয়সা হজম।

মদের নেশার মতো জীবনেরও একটা নেশা আছে। এটা, ওটা, সেটা নিয়ে একেবারে মত্ত মশগুল। নিত্য আর অনিত্যের জ্ঞান ছাড়াই ছোটা-ছুটি। একশোজন প্রবীণ মানুষকে একত্র করে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'মশাই বেঁচে থেকে কি পেলেন?' প্রায় সকলেই বলবেন--'ঘোড়ার ডিম, বাতি যত পুড়ল খেলা কিন্তু তেমন জমল না। শূন্য ঝুলি, সম্বল শুধু বুলি।'

'কেন ? নামের পেছনে ডিগ্রি, ডিপ্লোমার লেজ খেলছে, বাড়ি করেছেন, সুন্দরী স্ত্রী, সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, তথাপি এমন মনমরা কেন ?'

'কি যেন একটা নেই। জীবন তরকারিতে সব আছে, হালুইকর কেবল লবণটা দিতে ভুলে গেছে। সেই লবণ হলো সুখ আর শান্তি।'

'কেন ? ওই যা যা ধরেছেন, তাতে সুখ নেই ?'

'যা ধরা যায় তা আবার ধরা মুঠো থেকে পালাবার জন্যে ছটফট করে। তাকে বাগে রাখাটাই তখন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে এক মহা কোস্তাকুস্তি। আর সেই অধরা, আপনি এসে ধরা না দিলে, যাকে চেষ্টায় ধরা যায় না, সেই অধরার জন্যে মনের নির্জনে একটি আসন পাতা হলো না। যাঁর কৃপার কণিকামাত্র পেলে জীবন পূর্ণ হতে পারত, সেই কৃপার সন্ধান করা হলো না। যা পেয়েছি তা হারাবার ভয়েই তটস্থ। এই যে ঠাটবাট, এর জন্যে মাসে মাসে প্রয়োজনে প্রায় হাজার দশেক টাকা। সেই ধুনোর জোগাড়েই সারাটা দিন উন্মাদ, আরতি আর করা হলো না। শান্ত হয়ে না বসলে শান্তি কি আসে! নিজের ভুলে নাম লিখিয়েছি দৌড়-প্রতিযোগিতায়। সারাটা জীবনই এই ট্র্যাকে দৌড়তে হবে।'

'যদি বেরিয়ে আসেন।'

'ভয়। জীবনযাত্রার মান পড়ে যাবে। পরিবার-পরিজন ধরে চাবকাবে। প্রতিবেশীরা

া দেবে। অভ্যাসের খাঁচা খুলে এ পাখি আর কোনও দিনই বেরিয়ে অসতে পারবে । সংসারের খাঁচায় পোষা পাখি। ওরা ছোলা দিয়ে, নেশা দিয়ে মৌতাতে রেখেছিল। ন দিয়ে শিখিয়েছিল বুলি। জানত ডানার জোর কমে এসে খাঁচা খোলা থাকলেও া পাখি আর উড়বে না। ঘরে ঘরে অদৃশ্য অভ্যাসের খাঁচায় কর্তাপাখি কপচাচ্ছে। পরিজন এসে একবার করে বলে যাচ্ছে—রাধেকৃষ্ণ। কেউ আবার বলছে—বুড়ো টাকে অনেকদিন লাল লঙ্কা খাওয়ানো হয়নি। অমনি শুরু হয়ে যাচ্ছে পারিবারিক ড়া। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ছুটছে এদিকে ওদিকে। ওগো! তোমরা থামো। কে কার কথা নে! সবাই নাকি হকের কথাই বলে। ন্যায্য কথাই বলছে সবাই। বুড়ো চন্দনা বিষ্কার করে, নতুন প্রজন্ম লায়েক হয়েছে। মন বললে, 'ভেবে দেখ মন কেউ কারো , মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে'! আর বললে কি হবে। জীবনের এই সন্ধ্যাবেলা। ঠাকুরের ই কথাটি মনে পড়ছে, 'কুব্জা তোমায় কু বুঝায়। রাইপক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই।' মার পক্ষে আর কেউ নেই। এ, ও আসছে যাচ্ছে, বলছে, পাখি রাধেকৃষ্ণ, ব্যাঙ্ক লান্স কত আছে? কালই যে হাজার পাঁচেক চাই। এখন কেউ এসে বেশি ধানাই-নাই করলেই আগেভাগে জিজ্ঞেস করি, কত চাই মানিক? শরীর নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে, নিয়ে, মেজাজ নিয়ে ইলিবিলি করার দরকার নেই। ঝেড়ে কাশো। অমনি তারা শে ফেলে। জীবন লাটাইয়ে জড়ানো পরমায়ুর সুতো অনবরতই টেনে চলেছেন কাল। আর জীবন কলসীতে অর্থ যা ভরেছিলুম, সবই ঢেলে নিয়ে যাচ্ছে পরিবার রজন। গুঁইগাঁই করলেই বলবে ব্যাটা হাড়কেপ্পন! হাত দিয়ে জল গলে না। একেই ন বেঁধে মারা।'

'তাহলে কি পেলেন?'

'ছোট্ট একটা জীবনদর্শন। সব ঝুট হ্যায়। সবাই খেলছে। বিভিন্ন ভূমিকায়। স্ত্রীর মিকায়, স্বামীর ভূমিকায়, সন্তানের ভূমিকায়। ভাবছি, পায়ের তলায় জমি আছে, সলে কিছু নেই, আমার আমি ছাড়া কেউ নেই; আর সেই আমিটাকে সারাটা জীবন ‍ পথ্য দিয়ে এসেছি। যে প্রেম নেই, সেই প্রেমের কথা বলেছি। যে আশ্রয় নেই, ই আশ্রয়ের ভরসায় ফেলে রেখেছি। যার কোনও নিরাপত্তা নেই তাকে বলেছি, নও ভয় নেই, খাসা আছো। তাকে টিনের খাবার খাইয়েছি। যে পরমার্থরূপ পরমান্ন ওয়ালে 'আমি' সবল হতে পারত, তা খাওয়ানো হয়নি। লাভ হয়েছে আর কয়েকটি পদ—রক্তে চিনি, চোখে ছানি, হৃদয়ে ধুক্-পুকুনি। এখন আমি যখন হাহাকার করি াকে বলে ওই দেখ, সফল জীবন হাসছে কেমন?

আমরা যা ধরার জন্যে পাগল, তা হলো—জীবিকা। জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই আমরা তে চাই ওপরওয়ালাকে। বিষয়ী সংসারী মানুষের ওপরওলা তো ঈশ্বর নন। ঈশ্বর নন কর্মস্থলের বড়কর্তা। সারা জীবন সেই পদাভিষিক্তেরই অর্চনা। যাঁর কৃপা-করুণায় মোশন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি। আমরা ধরতে চাই মুরুব্বি, যাঁর সাহায্যে ছেলেকে ল ইস্কুলে ভর্তি করা যায়, ভাল জায়গায় ফ্ল্যাট কি একটুকরো জমি পাওয়া যায়। কে ধরলে বেকার আত্মীয় চাকরি পায়। সারাটা জীবন নানা ধরাধরিতে ব্যস্ত। চাকরি,

ফ্ল্যাট, মেয়ের বিয়ে, রেলের টিকিট, ফাংশানের পাস, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমে
হাসপাতালের বেড। সাফল্যের বিচার, সন্তুষ্টি, তৃপ্তি, সবই এই পাওয়া-নির্ভর। জী
যত জজবজে, ততই তার খাতির। লোকটা করিতকর্মা। কর্মযোগী। কেমন সাজিয়ে
জীবনটাকে। এই পিঠচাপড়ানিটুকুর লোভেই মানুষ যৌবনে মেতে থাকে ; তারপর হ
একদিন নেশার খোঁয়াড়ি ভাঙে। তখন ঘড়িতে কিন্তু অনেক বেজে গেছে।
বেলা নেই। তখন মনে হতে থাকে—যাঃ, আর তো সময় নেই। সেই হাত কোথ
সেই নিশ্চিন্ততার হাত ! সেই অমোঘ বন্ধনে জড়িয়ে ধরার হাত। তিনি পাশেই থাবে
কাছেই থাকেন। অসীম তাঁর ধৈর্য, অনন্ত তাঁর অপেক্ষা। তিনি আগেই টানেন
অপেক্ষা করে থাকেন, নজর রাখেন। সুপুরিগাছের বালদো কাঁচায় টানলে লাগবে। অ
শুকোক, তারপর আপনি খুলে পড়ে যাবে। একজন্ম, দুজন্ম, শতজন্ম, বাসনা না ফুরে
অনর্থক ভণ্ডামি। সে ওই ওই রকম, স্নান সেরে, ভিজে কাপড়ে এক গোছা ধূপ জ্বা
খুব হাত ঘোরানো। সেই হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে, না ঘোরালে কোথায় পাবে
তো হাত ঘোরাবার ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা তো মন ঘোরাবার।

ভুড়ুও খাব টামাক্‌ও খাব

সেদিন এক সাধুমুখে শুনছিলাম, 'প্রত্যাশা রেখ না। তুমি যাদের জন্যে যা করছ, -হাতে করে যাও। কোনোও প্রতিদানে আশা না রাখাই ভালো। তাতে অনেক শান্তি াবে। কারুর কাছে কিছু আশা করো না। শুধু নিজের ওপর আস্থা রাখ।'

প্রত্যাশা থেকেই হতাশা। মনে মনে অনেকের কাছেই আমাদের অনেক পাওনা। কচুল এদিক ওদিক হলেই জগৎ বিষণ্ণ। আমরা সকলেই অদ্ভুত এক দেনাপাওনার গতে বিচরণ করছি। প্রতি মুহূর্তেই জগৎকে নিজের মনের মতো করে সাজাচ্ছি। রমুহূর্তেই বাস্তব এসে সে চেহারা গুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বারে বারে মোহ ভঙ্গ হলেও াহগ্রস্ত মানুষের চেতনা হয় না।

মানুষ বিচক্ষণ প্রাণী। যুক্তিতর্কে পারঙ্গম। বিচার-বুদ্ধি আছে। তবু পৃথিবী যা নয় াই ভেবে অকারণে কষ্ট পায়। যা অনিত্য তাকে আঁকড়ে ধরে দীর্ঘ স্বপ্ন দেখার ব্যর্থ ষ্টায় একদিন ঘুম ভেঙে যায়, তখন আর নামরূপ থাকে না। বর্তমানের পরিচয় বুঝে য়। আবার নতুন শরীর নতুন পরিচয়, নতুন পরিবেশ। জীবন্মুক্তি, সে অতি দূরের থা।

আমার দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, নাম কাজ খাড়া হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি, কিছু হণের পথ, কিছু বর্জনের পথ, ভাষা, সংলগ্ন চিন্তা, এই দেখিয়েই মানুষের ছাড়পত্র পয়ে গেছি। প্রকৃত মানুষ কজন ? ঠাকুর বলতেন, 'মানুষ' শব্দের অর্থ মান হুঁশ। হুঁশ ান তবেই না তুমি মানব। জন্মেই আমরা বেহুঁশ। চারপাশে থরে থরে মায়ার আয়োজন। র্ণ বিপুল প্রকৃতি। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিহীন চাহিদা। ষড়্‌রিপুর অবিরত টঙ্কার। কে ামি ? কোথায় আমি ? চলেছি কেথায় ? কিছুই জানি না। আমরা একটা নাম আছে। কটা পদবী ঝুলছে নামের পেছনে। পিতা, মাতার পরিচয় জানি। বাকিটা বংশগতির ারায় ভেসে চলা।

ঠাকুর বলতেন অন্নগত প্রাণ। মৃত্তিকার আকর্ষণে, সংসার বলয়ে বল্গাহারা জীবন রছে, চোখ বাঁধা কলুর বলদের মতো। উটের আহার কণ্টকাকীর্ণ পাতা। জিভ তবিক্ষত, রক্তাক্ত তবু সেই আহারেও কী আনন্দ ! এত দুঃখের, এত হতাশার পৃথিবী বু ছেড়ে যাবার সময় সে কি আকুলতা। আর একটু, আর একটু যদি প্রশ্ন করা হয়,

সবই তো হলো, মামলা, মকদ্দমা, পরের উপকার, অপকার, জীর্ণ দেহ, চোখে চাল
হার্টের কিছু নেই, সংসারে তেমন খাতির নেই, কেউ মানেও না, তবু কী আকর্ষণ
যেতে চাই না, শমন এসে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে।

মানুষ কিছু প্রারব্ধ নিয়ে আসে। কেউ জন্মায় মুখে সোনার চামচ নিয়ে, কেউ এ
হাজির হয় ফুটপাতের উলঙ্গ রাজা হয়ে। কেউ চর্মকারের সন্তান, কেউ কর্ম
কেউ জাদুকর, কেউ বাজীকর। বিজ্ঞান প্রারব্ধ-ট্রারব্ধ মানে না। বিজ্ঞান অনেক রহ
সমাধান করেছে। করতে পারেনি জন্মমৃত্যুর রহস্য। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে এই
জীবন উপত্যকা, এ স্বপ্ন না বাস্তব, এ প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানের বিশেষ মাথাব্যথা নে
বিজ্ঞানের অহংকার মনে করে, আমরা আপনাকে জেনেছি, প্রাকৃতিক শক্তিকে ব
এনেছি। জীবনদায়িনী ওষুধ আবিষ্কার করেছি। মহাজাগতিক রহস্য হাতের মুঠো
সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের অহংকারে থ' মেরে যায়। ভাবে মানুষ সব। ঈশ্বর আব
কে ? সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ আছেন না কি ? সাধারণ মানুষ এমন ভাবলেও বিজ্ঞানী
মাঝে মাঝেই ভাবেন, সত্যিই কি আমরা কিছু করেছি ! না আমরা কারক হয়েছি। আম
কর্তা না করণ। আমি করেছি, না আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে ! অধিকাংশ আবিষ্কা
তো আকস্মিকতায় ভরা। কি করতে কি হয়ে গেছে। ইংরেজিতে বললে ভাবপ্রকা
সুবিধে হবে, Stumbling on truth। সত্যের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়া।

বিজ্ঞান মানেই যে শুধু কলকারখানা, শিল্পজাত সস্তা সামগ্রী, কম শ্রম, এক ধর
বিলাসিতা, আত্মবিস্মৃতি, আস্তিকতা থেকে নাস্তিকতা, তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞান যে বি
জ্ঞান সেই সত্যটিই আমরা ভুলে বসে আছি। আধুনিক বিজ্ঞান ঈশ্বর না মানলেও জ
সৃষ্টির পেছনে বিশাল এক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস উর্ধ্ব একটি স্তরে জ
আছে। নিচের দিকে সাধারণ মানুষের স্তরে নামেনি। সাধারণ মানুষের ধারণা বিজ্ঞ
হলো ঈশ্বরহীন এক অস্তিত্ব। শুধু ম্যাটার, সোল বলে কিছু নেই। দেহ একটা হাড় মাং
খাঁচা। ধমনী, রক্তপ্রবাহ, হৃদয়, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, মস্তিষ্ক। প্রাণ বস্তুটি আস
যে কি, মনই বা কাকে বলে, তার গঠন কেমন আজও জানা গেল না। কিন্তু ডেব
যখন বললেন—Cogito ergo sum অর্থাৎ I think, therefore I exist— আমি ভাবি আ
তাই আমি আছি, তখনই পশ্চিমের মানুষ চেতনায় তার অস্তিত্ব খুঁজে পেল, দেহে ন
'আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ।' যান্ত্রিক পশ্চিমী চিন্তায় প্রাচ্যের একোহহ
ছায়া পড়ল। সেই বিশাল, বিপুল, নিস্তরঙ্গ হলো বিশ্ব-বৈচিত্র্য। এক ছাড়া আর
কিছু নেই। বৌদ্ধ-দর্শন বললেন, মন যখন চঞ্চল, তখন সেই মনে বহুর অস্তিত্ব,
যখন স্থির তখন একের স্থির প্রতিবিম্ব। [অশ্বঘোষ]। বৃহদারণ্যক বললেন, তিনি সি
বহুর মধ্যে থেকেও অনন্য, স্বতন্ত্র, যাঁকে সবাই জানেন না, অথচ যিনি সকলের শরী
যিনি সকলের ভেতর থেকে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তো
আভ্যন্তরীণ নিয়ন্তা, অজর, অমর। আধুনিক মানুষকে সব শেখানো হয়। হয় না এ
জিনিস—কি করে শান্তি পাওয়া যায়। কি কৌশলে সচ্চিদানন্দ হওয়া যা
আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী দুঃখ করে বললেন, How strange is the lot of us mort

ach of us is here for a brief sojourn ; for what purpose he knows not, though sometimes thinks he feels it. নশ্বর মানব। হায় কী অদ্ভুত আমার ভাগ্য! এই প্রবাসে আমরা কেউই জানলাম না কি করতে এসেছি! কখন হয়তো মনে হয় জেনে লেছি, নিমেষে সে জানা হারিয়ে যায়। আমাদের সব শিক্ষাই হলো নিজেকে হারাবার জেকে ভাঙাও, ভাঙিয়ে বিত্তবান হও। পড়ে থাক তোমার বংশগতি। কে তোমাকে অতশত ভাবতে! শান্তি সে তো সোনার হরিণ। জগতের নেশায় বুঁদ থাক। তুমি একটা হিউম্যান মেশিন। যা শ্যানগ্রাহ্য তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে কি করে। এমনিই কুরঙ্গের মতো চঞ্চল, বাসনার শেষ নেই, সেই মন আধুনিক শিক্ষায় আরও প্ত। লাওৎসু বড় সুন্দর বলেছেন, He who pursues learning will increase eryday ; he who pursues Tao will decrease everyday. আধুনিক শিক্ষায় অহং াতে বাড়াতে ইউনাইটেড নেশনস বিল্ডিং-এর মতো সুবৃহৎ হবে, বিশ্ব-শান্তি কিন্তু ষ্ঠিত হবে না। ক্ষুদ্র হবার বিজ্ঞান ধরা আছে তাও নির্দিষ্ট পথে। চুয়াংৎসু বললেন, e still mind of the sage is a mirror of heaven and earth—the glass of all things. কোথায় গেল আমাদের সেই প্রাচীন তপোবন শিক্ষা! ব্রহ্মবিদ্যার পীঠস্থান। হারিক জ্ঞানের পাশাপাশি আর একটু গভীরে যাবার ব্যবস্থা। ঋষিকুমার, রাজকুমারের গৃহে পাশাপাশি অবস্থান। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের একই যাত্রা। একজন গিয়ে বসবে হাসনে, তলোয়ার হাতে, আর একজন কলম হাতে চতুষ্পাঠিতে। যে শাস্ত্রকে আজও লা গেল না, সেই হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মানব-বিজ্ঞানের শেষ কথা এইভাবে বলেছেন—জীবের ম লক্ষ্য হলো মোক্ষ। তিনটি তার পথ—কর্ম, জ্ঞান আর ভক্তি। বীরের মার্গ কর্ম, ীর মার্গ জ্ঞান, আর সন্ন্যাসীর মার্গ ভক্তি। সকলকেই পেরিয়ে যেতে হবে চতুরাশ্রম। চতুরাশ্রম কী কী ?

ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ।
গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ।
বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। [জাবাল উপনিষদ]

ব্রহ্মচারী মানে ছাত্র, ছাত্র থেকে গৃহী। গৃহীর পর বনী বা আরণ্যক (anchorite)। হলো প্রব্রজ্যা। সাতধাম ঘুরে সন্ন্যাসী। এক এক ধরনের জীবের এক এক ভাব। ধ জীব—কেহ বীর, কেহ ধীর, কেহ পীর।' বীরের জন্যে কর্মযোগ, ধীরের জন্যে যোগ আর পীরের জন্যে ভক্তিযোগ। এর চেয়ে বড় বিজ্ঞান কী আছে! এখন আমরা tude test, psychological test, IQ, নানা কথা বলি, বলে ভড়কানো মানুষকে আরো ক দিই। তুমি অমৃতের পুত্র একথা একবারও বলি না। বলি তুমি Thinking animal. drink and be merry. প্রথমে মানুষের দাস হও, তারপর ইন্দ্রিয়ের দাস। কে তোমার ? কি তোমার মোক্ষ ? পূর্বজন্মও নেই। একদিন মরে যাবে, দেহ তোমার মিশে পঞ্চভূতে, চুকে যাবে ল্যাঠা।

বর্তমানকালে ইতরজনের বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানে ধারণাগত বিশাল এক াক দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, quantum theory and relativity theory—

both force us to see the world very much in the way a Hindu, Buddhist or Tao
sees it, কোয়ান্টাম থিওরি ও আপেক্ষিক তত্ত্ববিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আবার আড়াই হাজা
বছর পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা বলছেন, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যে-স
আবিষ্কার করে স্তম্ভিত, সে-সত্য বহুকাল আগেই ধরা পড়েছে হিন্দুর বেদে, ...নের অ
চিঙ্গ-এ, বৌদ্ধসূত্রে। তাঁরা বলছেন, If physics leads us today to a world view
is essentially mystical, it returns in a way to its beginning 2,500 years ago.

সাধুর প্রত্যাশাশূন্যতার কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল। আধুনিক মানুষের জীবন প্রত্যাশ
জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। ঠাকুর গান গাইতেন, "যা চাবি তা বসে পাবি দেখ নি
অন্তঃপুরে।" "ডুব্, ডুব্, ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।" আমরা রূপসাগরে না ডুবে গেছি
আমাদের প্রথম প্রত্যাশা পরিবারের কাছে, তারপর সমাজ, দেশ বিশ্ব। আমাদের প্রত্যা
শিক্ষার কাছে, রাজনীতির কাছে, প্রাকৃতিক শক্তির কাছে, রোজ যেন ঝলমলে দিন পা
মলয়-বাতাস পাই। শিক্ষা আর জীবনচর্যা যদি মানুষের ভেরতটাকে বাইরে এনে ফেলে
তারপর যদি মিছরির মতো ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে আর সেই টুকরো
সমূহে যদি ঝাঁক ঝাঁক লাল পিঁপড়ে ছেঁকে ধরে তাহলে জীবনানন্দ আর থাকে কি করে
কোনোও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কি কোনোও কালে আমাদের বলবে :

তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম্।
যদ্দিনং হরিসংলাপকথাপীযূষ-বর্জিতম্॥

—মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়। সেই দিনই দুর্দিন যেদিন হরিনাম করতে পারছি
স্বামী বিরজানন্দজীর একটি উপদেশবাণীতে সেই ধ্বনি, "যে আপনি আপনার মিত্র
সংসারেরও মিত্র ও সমুদয় সংসারও তার মিত্র। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন : 'অ
হ্যাত্মানো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী (মুক্তির ক
এবং বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু (বন্ধনের কারণ)।" মুক্তির শিক্ষা বিশ্ববিদ্যা
নেই—আছে যেখানে, সেখানে বড় দ্বিধা, কারণ আইডেনটিটি লুপ্ত হবার সম্ভা
আমরা চাই, দুধও খাব তামাকও খাব।

যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া

"সেদিন কলকাতায় গেলাম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখি সব জীবের নিম্ন
ষ্টি—সব্বাইয়ের পেটের চিন্তা। সব পেটের জন্যে দৌড়ুচ্ছে। সকলেরই মন কামিনী-
াঞ্চনে। তবে দু-একজন দেখলাম উর্দ্ধদৃষ্টি—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।"

৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩। একশ সাত বছর আগে ঠাকুর এই কথাগুলি বলছেন
ষ্টারমশাইকে। মাস্টারমশাই উত্তরে বললেন : "আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে
য়েছে। ইংরেজদের অনুকরণ করতে গিয়ে মানুষের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে
ই অভাব বেড়েছে।"

পেটের জন্যে দৌড়াব, না ঈশ্বরের জন্যে? বিচারশীল মানুষকে আগে বিচার করে
ক করে নিতে হবে। একবার এ-নৌকোয়, একবার ও-নৌকোয় পা রাখলে, কি দু
ৗকোয় পা রাখলে চলবে না। নিজেকেই ভুগতে হবে। লোকদেখানো কোনও কিছু
ল নয়। নিজের সঙ্গে আগে একটা বোঝাপড়া হওয়া চাই। সাধনা মানে নিজের দশটা
ত বেরনো নয়। পা ঠেকালেই তামার ঘটি সোনার ঘটি হবে না। টুসকি মারলেই নোটের
ড়া পড়বে না। এমন কিছুই হবে না যাতে দেহ-সুখ, জাগতিক ভোগ একবারে ফলাও
য় যাবে। এমন কিছুই হবে না, যা ঢাক পিটিয়ে, লোক জড়ো করে দেখানো যায়।
মন দশ বছর তেড়ে সাধন ভজন করে এই আমার দশতলা বাড়ি হয়েছে, কি তিনখানা
ড়ি হয়েছে, কি কন্দর্পের মতো শরীর হয়েছে। ঠাকুর কোনও সংশয় না রেখেই বলছেন
"কি জান, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে ক-দিন ভোগ আছে দেহ ধারণ করতে হয়।
কজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কানাচোখ আর ঘুচলো না।
র্বজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ।" ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করছেন : "কি জান, সুখ-
ঃখ : দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছল। তার
কে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-
ঃখ ভোগ আছে। শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন।
ই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছল। একজন কাঠুরে পরম ভক্ত,
গবতীর দর্শন পেলে। তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের
াজ আর ঘুচলো না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবানের দর্শন পেলেন দেবকী। কিন্তু কারাগার ঘুচল না।

পরিষ্কার কথা। জাগতিক কোনও কিছুর আশা নিয়ে এ-পথে পা বাড়িও না। তিন দিনে তোমার নেশা ছুটে যাবে। ঠাকুর বলছেন ঃ "জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে ; পিষে যাবে। তবে যে কটি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। তাঁকে ডাক, তার নাম করো, তবে মুক্তি। তা না হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।" অর্থাৎ ঈশ্বরকে ধরব একটি কারণে, ঃ, যেন আমাকে কলুর বলদ না করে ফেলে। উদয়াস্ত কেবল স্ত্রী-পুত্র পরিবারের চিন্তা হা অন্ন, হা অন্ন। যেন আক্ষেপ করে গাইতে না হয় :

লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার
দাস-খত লিখে নিয়েছে হায়।
প্রাতঃকালে উঠি কতই কি যে করি
দারা পুত্র হল সুখেরই ছল।

ঠাকুর বলছেন : "দেখ, এক কৌপিন কা ওয়াস্তে যত কষ্ট। বিবাহ করে ছেলেপুলে হয়েছে, তাই চাকরি করতে হয় ; সাধু কৌপিন নিয়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভার্যা নিয়ে। আবার বাড়ির সঙ্গে বনিবনা নেই, তাই আলাদা বাসা করতে হয়েছে। চৈতন্যদেব নিতাইকে বলেছিলেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।" ঠাকুর মাস্টারমশাইকে দেখিয়ে সহাস্যে বলছেন ঃ "ইনিও আলাদা বাসা করেছেন। তুমি কে না, আমি বিদেশিনী, আর তুমি কে, না, আমি বিরহিণী। বেশ মিল হবে। তবে তাঁর শরণাগত হলে আর ভয় নেই। তিনিই রক্ষা করবেন।" ঠাকুর বলছেন—"সংসারে জ্বালা তো দেখছ, ভোগ নিতে গেলেই জ্বালা। চিলের মুখে যতক্ষণ মাছ ছিল, ততক্ষন ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে তাকে জ্বালাতন করেছিল। সাধুসঙ্গে শান্তি হয়। জলে অনেকক্ষণ কুমির থাকে · এক একবার জলে ভাসে, শ্বাস নেবার জন্য। তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।" ঠাকুর বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা দেখে, যে ছোকরাটি বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাঁর সঙ্গে আনন্দে অনেক ঈশ্বরীয় কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কি বিবাহ হয়েছে ? ছেলেপুলে ?

বিদ্যা—আজ্ঞে একটি কন্যা গত। আরও একটি সন্তান হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মধ্যে হল গেল। তোমার এই কম বয়স। বলে—সাঁজ সকালে ভাতার মলো কাঁদব কত রাত। সংসারে সুখ তো দেখছ। যেমন আমড়া আঁটি আর চামড়া কেবল, খেলে হয় অম্লশূল। যাত্রাওয়ালার কাজ করছ তা বেশ। কিন্তু বড় যন্ত্রণা। এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে। যাত্রাওয়ালারা প্রায়ই ওইরকম হয়। গাল তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা। আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম ? দেখলাম—তাল, মান গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণ এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করছেন।

বিদ্যা হঠাৎ প্রশ্ন করছেন—'আজ্ঞে কাম আর কামনা তফাৎ কী ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাম যেন গাছের মূল, কামনা যেন ডালপালা। এই কাম, ক্রোধ, লোভ

ইত্যাদি ছয় রিপু একেবারে তো যাবে না ; তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরে ভক্তি-কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহঙ্কার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান, এই বলে মত্ততা অহংকার করতে হয়। সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না।

এখন প্রশ্ন হলো—কেন ঈশ্বরমুখী হব ? সংসারী জীব আমি। আমি তো চাইব।—ধন, জন, মান। আজ্ঞে না। তুলসী বলেছেন—

অর্থ অনর্থকরহিঁ জগতে মাহী।
[এই সংসারে অর্থই অনর্থের মূল]
দেখহ মন সুখলেশো নাহি॥
[ওতে মনের লেশমাত্র সুখ নেই]
যাকো ধন তাকো ভয় অধিক।
[যার বেশি ধন আছে তার বেশি ভয়]
ধন কারণ মারত পিতু লড়িক॥
[টাকার লোভে ছেলে বাপকে মারতে পারে]
ধনতে পতিহিঁ বিঘাতহিঁ নারী।
[টাকার লোভে স্ত্রী স্বামীকে খুন করতে পারে]
ধনতে মিত্র শত্রুতা-কারী॥
[অর্থের জন্যে বন্ধু শত্রু হয়ে যায়]
ধনমদ নর অন্ধের জগ-কয়সে।
[রাতকানা জানে না তার চোখের রোগটা কি]
দেখ নমি নহিঁ রতোঁ ধি জেসে॥
[রাতকানার মতোই অন্ধ ধনমদে মত্ত অন্ধ মানুষ]

শেষে যোগ করলেন আবার ঠাকুর : "ভোগ করতে সকলে যায় ; কিন্তু অশান্তিই বেশি। সংসার যেন বিশালাক্ষীর দহ, নৌকো দহে পড়লে আর রক্ষা নাই। শেবুল কাঁটার মতো একটি ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধাঁধায় একবার ঢুকলে বেরুনো মুশকিল। মানুষ যেন ঝলসাপোড়া হয়ে যায়।"

সাধনা করব একটি কারণে—কুমিরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। ঠাকুর বলছেন : "বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বর সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য।'

এই বোধের সাধনাই সংসারীর সাধনা।
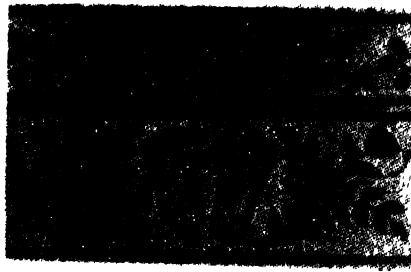
চাকা

একটা চাকা। মাঝখানে একটা গোলাকার বেড়া। সেখান থেকে চারপাশে ছড়িয়ে গেছে তিরিশটা স্পোক বা দণ্ড। কেন্দ্রের ঐ শূন্য গোলাকার অংশটাই কিন্তু সব। কিছুই নেই অথচ চাকার সমস্ত আকার, উৎস, শক্তির নির্ভরস্থল। ওটা না থাকলে চাকাটাই নেই। এইবাব আসি মাটিতে। মাটি থেকে কুম্ভকার তৈরি করলেন বিশাল এক জালা, ভিতরটা শূন্য। কিছুই নেই। অথচ ঐ শূন্য স্থানটুকুই জালার সব—জালার প্রয়োজনীয় অংশ। ঐ শূন্যতাটাকুর জন্যেই জালার নির্মাণ। এখন একটা ঘর। তার একটা দরজা ও দুটো জানলা। শূন্যস্থান। অথচ ভয়ঙ্কর প্রয়োজনীয়। দরজা না থাকলে ঘরে ঢোকাও যাবে না, বেরনোও যাবে না। জানালা না থাকলে বাতাস আসবে না। ঘর হয়ে যাবে কফিন। লাওৎসের কথায় :

Therefore profit comes from
what is there;
Usefulness from what is not there.

যা নেই সেইটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। আমার লিভার আছে, পিলে আছে, ফুসফুস আছে, আছে হৃদয়। এদের দ্বারা আমি লাভবান। খাই-দাই, হজম করি, শ্বাস-প্রশ্বাস চলে অবিরত। আমি বাঁচি। কিন্তু আমার ভিতরে যে শূন্যতা, সেই শূন্যতাই আমার প্রয়োজনীয় অংশ। সেখানেই বসে আছেন আমার ঠাকুর। সেখানেই ওঠে চিন্তার তরঙ্গ। ঐটাই আমার ধর্ম। আমার নিরাকার ঈশ্বর।

ঠাকুর বললেন : 'আমি ঘট'। বাইরের পাতলা আস্তরণটি হলো মায়ের অহংকার। তার একটা নাম আছে। নামরূপ। সামাজিক পরিচয় আছে। অমুকের বাবা, অমুকের ছেলে। অবস্থা-ভেদ আছে। বড় লোক, গরিব লোক। উপাধি আছে। 'আমি ঘট'-এর এই হলো মৃত্তিকা-আবরণ। 'আমি'-র ভঙ্গুর আবরণ ভেঙে দাও। কি রইল ? এই প্রশ্নই ঐ শূন্যতা। ঠাকুরই এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন—অনন্ত এই প্রশ্নের ; ঠাকুর নিজেই একদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন। শ্রীম লিখছেন 'হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাকে দেখাইয়া নিজের বুকে হাত দিয়া মণিকে বলিতেছেন, 'আচ্ছা এতে কিছু আছে, তুমি কি বল ?' তিনি অবাক হইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছিলেন। বুঝি ভাবিতেছেন, ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে কি

সাক্ষাৎ মা আছেন !" নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিচ্ছেন বড় করে, ব্যাপক করে, সর্বজীবোপযোগী করে—"যেমন অনন্ত জলরাশি, ওপরে নিচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে জলপরিপূর্ণ। সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল ; কিন্তু তবুও কুম্ভটি আছে। "আমি-রূপ কুম্ভ।" তারপর ! "ব্রহ্ম যেন সমুদ্র—জলে জল। কুম্ভের ভিতরে বাহিরে জল। জলে জল। তবু কুম্ভ তো আছে। ঐটি ভক্তের আমির স্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে, আমি তুমি আছে ; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত, তুমি প্রভু, আমি দাস ; এও আছে।"

ঠাকুর অহংকারী 'আমি'-টাকে সরিয়ে নিয়ে 'ভক্ত আমি', 'দাস আমি'কে বললেন। তবেই না বোঝা যাবে, শূন্যতা নয়। দেহ-যন্ত্রের উর্ধ্বে সেইটাই সব। এইবার ঠাকুর ঘটটিকে ভেঙে দিলেন। প্রথমে জাগালেন বোধ। আমি-তুমির বোধ। লীলা আস্বাদন। "সচ্চিদানন্দ সাগর। তার ভিতর 'আমি' ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল—ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে এক ভাগ। ঘট ভেঙে গেলে—এক জল—তাও বলবার জো নাই—কে বলবে ?"

কেন এই প্রশ্ন ? কারণ, ঠাকুর বলছেন ঃ 'আমি গেলে জীবের রইলটা কি ? স্মৃতি-শ্রুতি-বোধ সবই তো চলে গেল। ঐ অনুভূতিটুকু নেবে কে। সমাধিস্থ হলে 'আমি' মুছে যায়। সাধারণ মানুষ সমাধি থেকে ফিরে আসতে পারে না। নেমে আসতে পারেন একমাত্র অবতার পুরুষ। ঠাকুরের সেই গল্প—খাড়া একটা পাঁচিল, ওপাশে কি আছে, সকলেরই ভীষণ কৌতূহল। পাঁচিল বেয়ে এক একজন উঠেছে আর হাহা করে হাসতে হাসতে ওপাশে লাফিয়ে পড়েছে। কেউই ফিরে এসে বলছে না, সে কি দেখেছে।

সংসার-প্রান্তরে আমাদের জীবনের চাকা গড়িয়ে চলুক। কেন্দ্রগত শূন্যস্থানটিই যে চাকার নির্ভরতা সেই বোধটুকু যেন থাকে। সেইটাই হলো বিশ্বাস, যা চোখে দেখা যায় না। আত্মগত এক অনুভূতি। এই যে গাড়ির টায়ার। ভিতরের বাতাসটুকুই তার শক্তি। ভালভ খুলে দিলেই তা ফুস করে বেরিয়ে যাবে। মিশে যাবে প্রকৃতিতে। টায়ার হয়ে যাবে ফ্ল্যাট। নেতিয়ে পড়বে। বিশ্বাস হলো জীবন-টায়ারের বাতাস। শক্তি। চালিকা শক্তি। মানুষকে ধরে রেখেছে। কিছুই নয়। কোন দামও নেই, অথচ সবকিছু। জীবনের চাকায় কর্মের স্পোক, কেন্দ্রে বৃত্তাকার শূন্যতা। সেইটাই হলো বিশ্বাসের পীঠস্থান। ভগবৎ বিশ্বাস। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণে বিশ্বাস। নিরাকার উপস্থিতি।

মানুষ

অনেকদিন আগে কোন এক দার্শনিক, মানুষের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন : মানুষ, ডানাবিহীন দ্বিপদ জন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। কথাটির প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ও সত্য তখন অনেকে সহ্য করতে পারেননি। দার্শনিকের ছাত্ররা একটি মুরগীর ডানা দুটো কেটে দিয়ে বল্লেন, দার্শনিকের সংজ্ঞা অনুযায়ী এও একটা মানুষ। দার্শনিকের উক্তির অসারতা প্রমাণ করার জন্য তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কারণ হৃদয়ের গভীরে এই উক্তির নগ্ন সত্য এমনভাবে লেগে গিয়েছিল, যাকে, তাঁরা ধুয়ে ফেলতে পারছিলেন না, কেবলি বিচলিত হচ্ছিলেন।

মানুষের উৎপত্তি বা তার শ্রেণী বিচার করতে বসিনি। অনেক আগেই Darwin (ডারউইন) ও Huxley (হাক্সলী) তা করে ফেলেছেন। সে অনধিকার চর্চ্চায় আমাদের কোন অধিকার নেই। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কবি ও দার্শনিকেরা এবং শিল্পীগণ মানুষকে যে চোখে দেখেছেন, সেইটাই হবে এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

মানুষ বিধাতার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, তবে উৎকৃষ্ট হলেও চরম সৃষ্টি কিনা বলা যায় না। মানুষ নিজের মনেই অনুভব করে সে স্বয়ং সম্পূর্ণ বা একেবারে নিখুঁত নয়, ফলে তার আকাঙ্ক্ষিত আদর্শটি লাভ করবার জন্য তার মধ্যে একটা সর্বদা চেষ্টা সদা সর্বদা জাগ্রত থাকে। এই অগ্রগতি, এই উঁচুর দিকে যাবার প্রবণতা, মানুষের মাঝে অতিমানব সৃষ্টি করে। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মানুষ অর্থাৎ মান হুঁস। এই হুঁসটি পশুদের নেই। আবার হুঁস হারালেই মানুষ পশুতে পরিণত হয়।

Descartes (ডেকার্টে)-এর Theory of animal life এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে Moleschott (মলোস্কট) ও Buchner (বুকনার) মানুষের সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সংজ্ঞাকে Materialistic Theory (বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ) বলা হয়। তাঁদের মতে মানুষ, যন্ত্র ছাড়া, আর কিছুই নয়। তবে যে কোন জানা যন্ত্রের চেয়ে এর গঠন কৌশল অতি জটিল এবং অদ্ভুত উপযোগী। কিন্তু তবুও খুব বাড়িয়ে অথবা

১। A man is a biped animal without any wings.
—(Sartor Resartus, Carlyle)

খুব কম করে বলতে হলে, এইটুকুই বলতে হয় হয়, সে একটা যন্ত্রই, যার শক্তির উৎস বহির্দেশে অবস্থিত এবং যাকে চালনা করলে তার গঠন ভঙ্গিমা অনুযায়ী, থাকা চলা অনুভব করা চিন্তা করা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন করে থাকে।[২] কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি মতবাদ আছে যাকে বলা হয় Spiritual doctrinc (আধ্যাত্মিক মতবাদ)। তাঁরা বলেন : দেহ এবং কিছু অংশে মনের দিক থেকেও, মানুষ পশু হতে পারে কিন্তু তার আত্মা হোল ঐশ্বরিক।[৩] ভারতের বৈদিক ঋষিগণ মানুষকে অনেক উঁচু স্থান দিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা বলে গেছেন, মানুষ হলো "—অমৃতস্য পুত্রা।" তাঁরা দেহ থেকে আত্মাকে সদাই পৃথক করে দেখতেন। তাঁদের মন, তাঁদের চিন্তা আত্মিক জগতে ঘুরে বেড়াত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে তুলনা করেছেন ডাবের সঙ্গে আর অতিমানবকে ঝুনো নারিকেলের সঙ্গে। খোলা আর শাঁস আলাদা, খটখটে শাঁসটি হোল আত্মা।

আমাদের বৈদিক ঋষিগণ ও সাধকবর্গ মানুষের দেহটিকে মোটেই ভাল চোখে দেখেননি। দেহবুদ্ধি দূর করতে গিয়ে, দেহের যে চিত্রটি তাঁরা সদাসর্বদা চোখের সামনে খাড়া রাখতেন, সেটি মোটেই মনোহর নয়, বরং মনের মাঝে নিদারুণ ঘৃণা সঞ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁরা যেন "সার্জিকাল" ছুরি দিয়ে দেহটিকে ফেঁড়ে ফেঁড়ে দেখতেন

"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজাল সঙ্কুলে, স্বভাব দুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে কলেবর মূত্র পূরীষ ভাবিতে....."

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ কথায় কথায় বলতেন, "লোক না পোক।" অতিমানবের স্তরে উপনীত হলে সাধারণ মানুষকে, 'পোক' বলেই মনে হয়। স্বভাবের দাস কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত।

পাশ্চাত্যদেশে আত্মাকে উপলব্ধি করলেও আত্মশক্তিতে তারা আমাদের মত বিশ্বাসী নয়। আমরা আত্মসর্বস্ব কিন্তু তারা দেহসর্বস্ব। ডাক্তার Prichard (প্রীচার্ড) এর চিন্তাধারায় আত্মার বর্তমানতার কথা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি মানুষের ভিতর "রক্তমাংসের দেহ ছাড়াও বিশেষভাবে যুক্ত অন্য একটি সত্তার"[৪] সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রোফেসার মীভার্ট তাঁর Genesis of Species-এ বলেছেন : মানুষ বিজ্ঞপ্রাণী এবং তার জৈব দেহ ও ঐশ্বরিক আত্মার, নিশ্চয়ই দুটি ভিন্ন উৎস আছে, কারণ একটির শ্রেণী আর একটির থেকে সম্পূর্ণ

২। Man is a Machine, no doubt the most complex and wonderfully adapted of all known machines but still neither more nor less than an instrument whosc energy is provided by free from without and which when set in action performs the various operations for which its structure fits it namely, to love, move, feel, and think. —(Encyclopaedia Britannica)

৩। Animal as to the body and in some measure as to the mind, spiritual as to the soul. (Encyclopaedia Britannica)

৪। The Superadded existence of a Principal distinct from the mere mechanism of material bodies (Encyclopaedia).

পৃথক।[৫] পাশ্চাত্য দেশ অনুভব করেছে কিন্তু আমাদের দেশ গভীরে প্রবেশ করেছে।

ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে মানুষকে যেন বিষাক্ত জীবরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ পাপের বোঝায় ঝুঁকে পড়েছে। রোগ শোক জরা আর ব্যাধির অন্ধকারময় জগতে তারা বিচরণ করে ফিরেছে। পরিত্রাণের কোনই আশা নেই। Milton (মিল্টন) Paradise Lost-এ যে চিত্রটি এঁকেছেন সেটি যেন এই নরকরূপী পৃথিবী :

আলো নেই শুধু অন্ধকার
চারি পার্শ্বে শুধু হতাশা
বিষাদ আর নৈরাশ্য ঘেরা
যেখানে একতিল শান্তি নেই
নেই একবিন্দু বিশ্রাম।[৬]

সেইখানেই মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আছে। John Bunyan (জন বানিয়ান) পৃথিবীকে বল্লেন, City of destruction, তাঁর "Pilgrim's Progress"-এর পথিক বিভিন্ন জনের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চল্ল Mount Zion (মাউন্ট জাইয়ন)[৭] এর দিকে যেখানে গেলে সে উদ্ধার পাবে। সে নিজে অতি অসহায় ঃ দীন, ঘোরতর পাপী।[৮] Bible-এতেও সেই নিরাশার বাণী। মানুষের এই দূরাবস্থা থেকে মুক্তির কোন আশা নেই, কেবল দয়া করে যদি কোন মহাপুরুষ(যীশু) তাকে ত্রাণ করে তবেই মুক্তি। না হলে সে অসহায়। কিন্তু আমাদের দেশের সুর আলাদা। মানুষকে আমরা অন্য চোখে দেখি। আমরা হুঙ্কার দিয়ে বলি :

হে পুরুষ সিংহ ! উঠো, জাগো, ঝেড়ে ফেল তোমার ভ্রান্তি, তুমি মেষ নও, তোমার আত্মা অজরামর, তুমি বন্ধন মুক্ত, অনাদি অনন্ত। তুমি ধন্য। তুমি বস্তু নও, তুমি দেহ নও, বস্তুজগৎ তোমার অধীনে, তুমি বস্তুজগতের অধীন নও।[৯] বাইবেল যে মানুষকে ভেড়ার মতো দেখে, আমাদের দেশের দার্শনিকগণ তাকে দেখে অমিতশক্তির আধার

৫। Man is a rational animal. Man's animal body must have had a different source from that of the spiritual soul which informs, owing to the distinctness of the two orders to which these two existences severally belong.

৬। No light but rather darkness visible
Served only to discover sights of woe
Regions of sorrow, doleful shades
Where peace and rest can never delve
[Paradise Lost—Milton]

৭। জেরুজালেমের গিরি, Jewish theocracy.

৮। Poor burdened sinner.
[Pilgrim's Progress—John Bunyan]

৯। "Come up, Lions, and shake off the delusion that you are sheep, you are soul immortal spirits, free, blest and eternal. Ye are not matter, Ye are not bodies. Matter is your servant, not you the servant of matter."

[Chicago Address—Swami Vivekananda]

রূপে। সে পশু হতে পারে কিন্তু সে পশুশ্রেষ্ঠ। নিবীর্য্য নয়, অসীম তার বীর্য্য। সে নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা।

আমাদের দেশ মানুষকে বিশ্বসত্তার সঙ্গে একীভূত করে দেখেছে। আমাদের দেশে মানুষ কম্বু কণ্ঠে বলে "সোহহং"। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন : বাহ্যতঃ এই বিশ্বজগৎ এক এবং অখণ্ড, তোমাতে আর ঐ সূর্যতে কোনই তফাৎ নেই।[১০] আমিই বিশ্বজগৎ, আমিই অনন্ত, অপার। আমাদের দেশের মানুষের এই বাণী। স্বামীজী সমগ্র জীবজগৎকে দেখেছিলেন : এই অনন্ত বস্তু সমুদ্রে এক একটি প্রাণী যেন এক একটি পরিবর্তনশীল ঘূর্ণি।[১১]

বিশ্বের বিশালতার তুলনায় মানুষ অতি নগণ্য জীব। দৈহিক গঠন ভঙ্গিমার দিক থেকে সে পশুর চেয়ে দুর্বল কিন্তু বুদ্ধিযুক্তির বলে সে পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বে তার স্থান Pascal (পাস্কাল) এর ভাষায় : সব কিছু এবং কিছুই না। এই দুইয়ের মাঝে মানুষের স্থান এবং চরম জ্ঞান থেকে সে অসীম দূরে অবস্থিত।[১২] এবং সেই কারণেই মানুষের মানস রাজ্যের পরিধিও অল্প। Pascal (পাস্কাল)-এর ভাষাতেই :

"এই কারণে চরমজ্ঞান লাভ ও চরম অজ্ঞানতা দুই-ই মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।"[১৩]

মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা করুণাবহ ঘটনা, সে বোঝে তার দুর্বলতা, তার অসম্পূর্ণতা, কিন্তু পূর্ণ হতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশ অক্ষমতা স্বীকার করেছে কিন্তু To err is human বলে নিশ্চেষ্ট থাকবার চেষ্টা করেছে। কোন কোন দার্শনিক অসহায় মানুষের চিত্র নির্মম লেখনীমুখে এঁকেছেন যেমন Pascal (পাস্কাল) : মানুষ এমন একটি জীব যার সারাটি জীবন শুধু স্বাভাবিক ভুল ও ত্রুটিতে ভরা। কোন কিছুই তার সত্যলাভে সহায়তা করে না, সব কিছুই তাকে ঠকায়।[১৪] তারপর বলছেন : কি বিকট এই মানুষ জীব! অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, শূন্যকুম্ভ, বৈপরীত্যে ভরা একটা আশ্চর্য্য সৃষ্টি। টন টন বিচার বুদ্ধি রয়েছে অথচ দুর্বল কেঁচো ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যের আধার অথচ

১০। "Physically the universe is one, there is no difference between the sun and you."

[Raja Yoga—Swami Vivekananda]

১১। "Each form represents as it were one whirlpool in the infinite ocean of matter of which one is not constant."

[Raja Yoga—Swami Vivekananda]

১২। "A mean between all and nothing, infinitely far from comprehending the extremes."

—[An Introduction to Modern Philosophy—Alburney Castell]

১৩। This what renders us incapable, alike of absolute knowledge and absolute ignorance. (Ibid)

১৪। Man is a creature full of natural error. Nothing shows him the truth, everything deceives him. (Ibid)

অনিশ্চয়তা আর ভুলের আস্তাকুঁড়।[১৫] তাঁর কথাতেই : মানুষ হোল নলখাগড়ার মত। দুর্বল হতে পারে কিন্তু চিন্তাশীল।[১৬] অতএব তাঁর মতে "মানুষ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য।"[১৭] মানুষকে বোঝবার ক্ষমতা মানুষের থাকতে পারে না। তবে মানুষ মানুষের সংজ্ঞা নির্দেশ করবে কি করে ! তার জ্ঞানের পরিধি অতি অল্প। অতএব কিন্তু না, মানুষই বলছে মানুষই স্থির করেছে, তার পূর্বপুরুষেরা অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞান আহরণ করেছেন, এবং সেই জ্ঞান বংশানুক্রমে বিকশিত হয়েছে ! বংশানুক্রমে, পূর্ণ বিকাশই জ্ঞানের ধর্ম। এই হোল Herbert Spencer (হার্বার্ট স্পেনসার)-এর Evolutional Empiricism.

Hegel (হেগেল) বল্লেন, মানুষ জগৎকে যে ভাবে দেখতে চায় সৃষ্টিকর্তা জগৎকে ঠিক সেই ভাবেই সৃষ্টি করেছেন। অতএব মানুষের মন ও বিশ্বস্রষ্টার মন একই শ্রেণীর। সুতরাং Hegel (হেগেল) এর Dialectic Theory of Knowledge অনুসারে মানুষের অজ্ঞাত কিছুই থাকতে পারে না।

আমাদের ভারতীয় দর্শন বলে "আত্মানং বিজানথ" নিজের আত্মাস্বরূপকে জানো, তোমার অজ্ঞাত কিছু থাকবে না। তাই ভারতীয় মহাপুরুষগণের জাগতিক জ্ঞান তো দূরের কথা, সমগ্র বিশ্ব তাঁদের মানসলোকে প্রতিভাত হোত। তাঁরা তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার হোমানল জ্বেলে, কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরাও পড়ে থাকবে না। আত্মজ্ঞান তোমাদেরও লাভ হবে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

কিন্তু মানুষ (মান + হুঁস) তার হুঁসটি হারিয়ে থেকে থেকে পশুতে পরিণত হয়। সর্বকালে সর্বযুগের মানুষ এটি বিশ্বাস করেছে এবং সদা আতঙ্কিত থেকেছে। তার সেই আতঙ্ক নাটকে সাহিত্যে কাব্যে চিত্রে যুগে যুগে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন মিশরীয় গল্পে, মানুষ থেকে থেকে পশুতে পরিণত হত। গ্রীক গল্পেও এই পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। চরিত্রে বিভিন্ন বৃত্তির আধিক্য বোঝাতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ পশুতে পরিবর্তন করা হোত। যেমন দ্বিতীয় শতাব্দীতে গাধা ছিল কাম নিষ্ঠুরতা ও দুরাচারের প্রতীক। মানুষের চরিত্রে বৃত্তির এই আধিক্যগুলি বোঝাতে গিয়ে তাকে গাধাতে পরিবর্তিত করা হোত। আমাদের দেশেও মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পাল্টেছিল, হৃদয় বৃত্তির তাড়নায়। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুকেও বরাহের রূপ ধারণ করতে হয়েছিল হিরণ্যাক্ষকে বধ করতে গিয়ে, তার পাশব প্রবৃত্তির রূপ এটি।

১৫। "What a chimera is man! Strange and Monstrous! A chaos, a contradiction, a prodigy. Judge of all things yet a weak earthworm. Depository of truth yet a cesspool of uncertainty and error."

১৬। "Man is but a reed, weakest in nature but a reed which thinks."

১৭। Man is incomprehensible by man.

—(An Introduction to Modern Philosophy—Alburney Castell)

বর্তমান যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Louis Stevenson (লুই স্টিভেনসন)-এর octor Jekyll and Mr. Hyde (ডঃ জেকীল ও মিঃ হাইড)। সে কাহিনীও মানুষের পশু রিণতি উপজীব্য করে লেখা।

কবি দার্শনিক Plato (প্লেটো)-র মতে স্বর্গীয় আত্মার, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে একই ঙ্গ বিরাজিত এবং জাগতিক মানবের আত্মা সদাসর্বদা এই মিলিত অবস্থায় ফিরে যাবার ষ্টা করে।

দার্শনিক কবিগণ মানুষের জীবনকে নদীর স্রোতের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। শেলী ং রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত গোষ্ঠীর কবি ছিলেন। Plato (প্লেটো) তাঁর এক বিখ্যাত ন্যায় মনুষ্যজীবনকে গুহার সহিত তুলনা করেছেন, বাইরের বাস্তব সেখানে ছায়া রূপে তভাত।

বিচিত্র মানুষের অখণ্ড স্রোতধারা। বিচিত্র তার চিন্তাধারা, দেহ তার বিনাশশীল কিন্তু আ তার অজেয় অমর। আমরা কখনও তাকে দেহী জীব হিসাবে দেখিনি, তাকে খেছি আত্মার অধিষ্ঠান রূপে, যে আত্মাকে—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ॥"

বিদেশী সাহিত্যে এর ছায়া পড়েছে Oscar Wilde (অস্কার ওয়াইল্ড)-এর Happy rince গল্পটিতে।

তাই দেখি, আমাদের দেশের কবি গাইছেন, মানুষের জয়গান—
"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

অমৃতের সন্ধানে

দেহ নয় মন। এই সত্যটি যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁদের পক্ষেই এ পৃথিবীতে কিছু করা সম্ভব হয়েছে। মন এমন এক পাখি, যা এই দেহখাঁচায় বসবাস করলেও, খাঁচার অধীন নয়। সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের অধিষ্ঠান। আবার মন সুস্থ না হলে দেহ সুস্থ হতে পারে না।

মন হল গৃহস্বামী। গৃহস্বামীর ওপর নির্ভর করে গৃহের অবস্থা। দেহটাকে মন্দির করে রাখবো, না আঁস্তাকুড়, তা নির্ভর করছে মনের ওপর। আগে চাই মনের স্বাস্থ্য। মনের তো আর পেশি নেই। ডাম্বেল বারবেল ভাঁজলে মাসকুলার বডি হতে পারে, ওতে মনের কিছু হয় না। মনে একটা তামসিক অহংকার আসে মাত্র। মানুষকে শরীর দেখাবার ইচ্ছে করে। নিজের শরীরের ওপর প্রচণ্ড একটা মোহ আসে। তখন নিজেকে নিয়েই মশগুল। নিজেকে নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত। সর্বক্ষণের দুর্ভাবনা। এই বুঝি বুক কোল্যাপস করল। হাতের গুলি নেমে গেল। থাই ঝুলে গেল। এগজিবিশানের শরীর নিয়ে মহাসমস্যা। ওই শরীর দেশের দশের কোনও কাজে লাগে না। ওকে বলে তোলা শরীর। ওই শরীর কারোর বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

সুস্থ মনকে বহন করার জন্যে যে সুস্থ শরীরের প্রয়োজন, তা এগজিবিশানের শরীর নয়। সেই শরীর হবে প্রভুভক্ত। বিশ্বস্ত, কর্মক্ষম, সুপটু ঘোড়ার মতো। মন সেই ঘোড়া আরোহণ করবে। বীর মন পরিচালনা করবে সেই অশ্বকে।

এইরকম একটি শরীর ও মনের জন্যে প্রয়োজন যোগ। পশ্চিমী দুনিয়া, যাঁরা পেশীর ব্যায়ামে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা যোগের পথ ধরেছেন। দেহের ভেতর দেহের বিভিন্ন কল ও কব্জার কাছে পৌঁছাতে পারে একমাত্র যোগ। বারবেল, ডাম্বেল, নানা যন্ত্রপাতি সব বাইরেটা নিয়েই ব্যস্ত। মানুষের শরীরের পাঁচটা ডেলিকেট যন্ত্র হল হার্ট লাংস, কিডনি, লিভার ও জয়েন্টস্। আর একটি সাংঘাতিক জিনিস হল, বিভিন্ন গ্ল্যান্ডস্। তার চেয়েও সূক্ষ্ম হল মন বা 'সাইক'। আমার বিশাল শরীর, রিভস বা স্ট্যালোনের মতো, অথচ আমি পৃথিবীর চাপে পরিবারের চাপে 'সিজোফ্রেনিক'। 'প্যারানয়েড'। কি লাভ আমার অমন শরীরে।

যে কোন মুহূর্তে আমার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। আমার লাংস তার স্থিতিস্থাপক

হারিয়ে আমাকে অ্যাজমেটিক করে তুলতে পারে। লিভার ক্রমশই কৃশ হতে হতে, আমাকে ইনডাইজেশানের শিকার করে তুলতে পারে। আমার অর্থের অভাব নেই, ভোগের অভাব নেই ; কিন্তু আমি আমার হজমশক্তি নির্বাপিত। আমার কিডনি বিকল। সারা শরীর টকসিনে ভরে উঠেছে। আমার সুগার। আমার হাইপারটেনসান। আমার থাইরয়েড কাজ করছে না। সারা শরীর ফুলে উঠেছে কোলা ব্যাঙের মতো। আমি আমার মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি, টেনসান আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। আমার অগোচরে বেড়ে যাচ্ছে আমার শরীরের সেল ডিভিসান। আমি জানি না, ক্যানসার এসে আমার কোনখানটা ধরবে।

হঠযোগ, রাজযোগে ছিল সব সমাধান। দুর্ভাগ্য আমাদের, ফুসফুস আমার, আমি শ্বাস নিতে শিখিনি। গ্ল্যান্ডস্ আমার, তার থেকে আমি শিখিনি সঞ্জীবনী অমৃত নিঃসরণ করাতে। আমারই জয়েন্টস আমার কথা শোনে না। আরথ্রাইটিস, অস্টিয়োম্যালাইসিসে আমি পঙ্গু হয়ে আসছি।

যোগ বলছেন—

সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, সেই সমুদ্র হল তোমার দেহাভ্যন্তর, অমৃত হল প্রাণশক্তি। সেই প্রাণ হল, তোমার শ্বাস তোমার দেহগত নির্যাস।
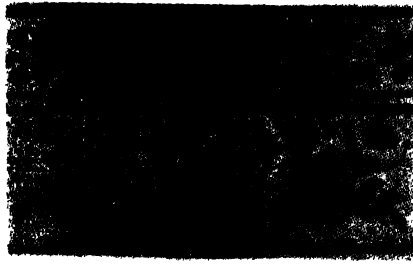
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয়

পৃথিবী আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে আর আমি তিলে তিলে মরে যাচ্ছি—এই ক্লীবতার উর্ধ্বে কোনোও ক্রমে উঠতে হবে। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী যখন সারা ভারত পর্যটন করছেন তখন তাঁর সন্ন্যাসীর ঝোলায় দুখানি বই থাকত, শঙ্করচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' আর টমাস আ কেম্পিস-এর 'দি ইমিটেশান অফ ক্রাইস্ট'। কেম্পিস বলছেন :

The Lord is my light and my
deliverance ; whom
have I to fear ? Though a whole
host were arrayed
against me, my heart would be
undaunted.

জীবনের ভয়ের শেষ নেই। প্রকৃতিকে যতই মনে আনা যাক, প্রকৃতির এক ফুৎকারে শতশত মানুষের জীবনদীপ নির্বাসিত হতে পারে। যে কোনও মুহূর্তে মারক ব্যাধি আমাদের আস্ফালন বন্ধ করে দিতে পারে। ভয় আছে জীবিকা না পাবার, পেয়ে হারাবার। আর আছে মানুষ। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষ।

এই যে বাংলাদেশের সমুদ্রকূল ছুঁয়ে এত বড় একটা ঘূর্ণীঝড় বয়ে গেল, মুছে গেল শতশত প্রাণের বেঁচে থাকার ক্লিন্ন, ক্লিষ্ট ইতিহাস। তারপর। তারপরের ইতিহাস আরও নিদারুণ। খেয়ালী প্রকৃতি মানুষের মুখে চেয়ে কাজ করে না। কিন্তু মানুষ। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব। তারা কি করছে। এখনও যাদের পুনর্বাসন হলো না। অনিকেত। অনাহার আর ব্যাধিপীড়িত, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জোতদারের ভাড়াটে গুণ্ডা। একখণ্ড জমির দাম, মানুষের জীবনের চেয়ে দামী।

হিরোসিমা, নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা পড়ার পর, যে কজন প্রাণে বেঁচেছিলেন তাদের মধ্যে একটি বাচ্চা মেয়ে প্রশ্ন করেছিল, মানুষের ওপর মানুষ কিভাবে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে ! আমরা কি এমন করেছি যে, আমেরিকা আমাদের দুটো শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলো ! ডেসমন্ড মরিস তাঁর 'দি হিউম্যান জু' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন

Under normal conditions, in their natural habitats, wild animals do not mutilate themselves, masturbate, attack their offspring, develop stomach ulcers, become fetishists, suffer form obesity, form homosexual pair bonds or commit murder.

কিন্তু শহরবাসী সুসভ্য মানুষ কি করে ! বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সবই সেখানে নিত্য ঘটে চলেছে নির্বিচারে। মরিস প্রশ্ন করছেন, তাহলে আর মানুষে কি মূলগত একটা পার্থক্য বিদ্যমান ! আপাতদৃষ্টিতে সেইরকম মনে হতে পারে। আসলে তা নয়। পশুকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কৃত্রিম পরিবেশে ঠেসে দিলে আজকের মানুষের মতোই আচরণ করবে। চিড়িয়াখানায় খাঁচার পশুদের মধ্যে ওই একই বিকৃত আচরণে লক্ষ্য করা যাবে। তার মানে, আমাদের আজকের শহর শুধু 'কংক্রিট জঙ্গল' নয়, 'হিউম্যান জু'—মানুষের চিড়িয়াখানা।

Go back, you are heading for disaster. অন্য কোনোও জীবনের কথা ভাবো। এ এ জীবনে তোমাকে মেরে ফেলবে। কে শুনবে, এই সতর্কবাণী। আমরা নিজেদের জালেই দু-ভাব জড়িয়ে পড়েছি। এক ভূমিকায় দর্শক, অন্য ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী। ভোক্তা। যে বাজি ধরা হয়েছে তার অঙ্ক হু হু করে বেড়েই চলেছে। The stakes are rising higher all the time, the game becoming more risky, the casualties more startling, the pace more breathless.

আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, অসউইজ, বেলসেন, ডাচাউ, কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পে মারণযজ্ঞের কথা ভেবে এখনও আতঙ্কে শিউরে উঠি। অথচ সারা পৃথিবীটাই এখন এক বিশাল কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্প। ইথিওপিয়ায় মানুষ কি ভাবে মরছে। কেন মরছে। কার দোষ মরছে ! জুনের প্রথম সপ্তাহের টাইম ম্যাগাজিনে যে সব ছবি ছাপা হয়েছে, দেখলে মনে হবে হিটলার ফিরে এসেছেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। এক মৃত মহিলা, কঙ্কালসার, তাকে বসিয়ে কবরে দেবার আগে প্রথামত স্নান করানো হচ্ছে। একটি শিশু, দিনের পর দিন অনাহারে যেন বৃদ্ধ। ম্যাগাজিনের পাতা থেকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে সভ্য দুনিয়ার দিকে। অনুচ্চারিত প্রশ্নগুলি, 'তোমরা কি বলবে ?' কয়েক যোজন দূরে ভোগের দুনিয়ায় বাফুনেরা লাট খাচ্ছে। মিয়ামি কি ফ্লোরিডার সমুদ্রসৈকতের স্কচের ফোয়ারা ছুটছে। লাইফ ম্যাগাজিনেও ইথিওপিয়ার ছবি। কঙ্কালসার মা সদ্য সন্তান প্রসব করেছেন। শিশুটি পড়ে আছে পায়ের ফাঁকে। তখনও ছিন্ন হয়নি নাড়ীর যোগ। পাশেই পড়ে আছে অস্ত্রোপচারের কাঁচি। তলায় ক্যাপসান, মা যদি এবার বাঁচে, প্রসূতি সদনে থাকার অধিকার মিলল।

এ তো চূড়ান্ত দুর্ভোগের ঘটনা। এক পাশে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের জীবনে কি ঘটছে। মানুষ আসছে লাখে লাখে। প্রতিদিনই না জাতকের কান্না হয় এখানে না হয় ওখানে। অথচ জীবিকা নেই। বাসস্থান নেই। প্রচ্ছন্ন দাস ব্যবসা আজও চলছে। সর্বত্র শোষণ নিষ্পেষণ। কোনওক্রমে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকা। শিক্ষার সুযোগ কজন গ্রহণ করতে পারে ! কজন পায় উন্নত চিকিৎসার সুযোগ। প্যারিসের রাজপথে নতমস্তক

ভিখিরী। নিউইয়র্কে স্যুপের লাইনে বেকারের দল। ইংল্যান্ডের ফুটবল সমর্থক বেলজিয়ামে গিয়ে মেরে দিয়ে এল একদল নিরীহ দর্শক। ধর্মের নামে ইরানী যুবক ছুটছে ইরাকে জীবন দিতে। মাইনপাতা যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে এই আত্মোৎসর্গী যুবকেরা। মাইনমুক্ত ক্ষেত্রে ছুটে আসবে পরবর্তী ইরানী সৈন্যদল।

মধ্যযুগ শেষ হয়েছে? ক্যালেন্ডারে কত সাল চলেছে? রাজা মহারাজা, ওমরাও, অমাত্যদের যুগ কি শেষ হলো? সাধারণ মানুষ পেষাই হচ্ছে কিসে?

কবীরদাসজীর কি মনে হয়েছিল। মানুষের নিষ্পেষণ দেখে :

চলতী চক্কী দেখিকে দিয়া কবীরা রোয়।
দুইপট ভীতর আয়কে সাবিত গয়া ন কোয়॥
ভাই বীর বটাউআ ভরি ভার নৈন ন রোয়।
জাকা থা সো লে লিয়া দীনহা থা দিন দোয়॥

বীর পথিক অমন করে অঝোরে কেঁদো না। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ভিক্টর ই ফ্রাঙ্কল অসউইজ থেকে কোনোও ক্রমে বেঁচে ফিরে এসেছিলেন। একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে মনস্তত্ত্ববিদের অন্বেষা। মানুষকে পশু বানাবার শক্তিশালী চক্রান্ত। এস. এস. অফিসারের ডাইনে বামে মাথা দোলানর ওপর নির্ভরশীল শতশত অসহায় নরনারী শিশুর মরণ-বাঁচন। গ্যাসচেম্বারে যাবার আগে বেঁচে থাকার ধরন পশুর মতো। পরিধেয়হীন উলঙ্গ দেহ। অনাহার। অকথ্য পরিশ্রম। চাবুক, বুটের লাথি। আত্মবিশ্বাস প্রায় ভেঙে পড়ে। ডাক্তার ফ্রাঙ্কল শুধু দেখে চলেছেন, এই একস্ট্রিম অবস্থায় মানুষ কি সত্যিই পশু হয়ে যায়। না, কিছু মানুষ দেহসীমা লঙ্ঘন করতে পারে : ফ্রাঙ্কল লিখছেন—In spite of all the enforced physical and mental primitiveness of the life in a concentration camp, it was possible for spiritual life to deepen. স্বামীজিও তো এই একই সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন— "persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হলে জগতে হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।"
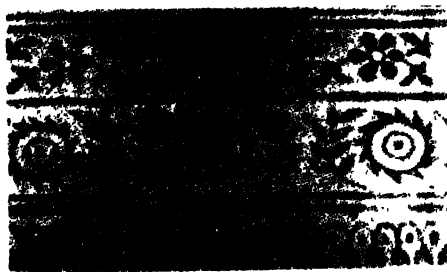
কৃপা

যন্ত্রকে যেমন বাঁধতে হয় যেমন তবলা, যেমন সেতার সেই রকম জীবনকেও বাঁধার য়োজন আছে। ব্যবহারিক জগৎ জীবনকে বাঁধা বলতে স্কুল ও কলেজী শিক্ষাকে ঝোয়। আমি পাস করলুম, নামের পেছনে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার ল্যাজ জুড়ে দিলুম। ন করলুম, জীবনের মোক্ষ লাভ হয়ে গেল। জীবন বলতে আমরা বুঝি ভালো একটা বিকা, কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি, জীবন বলতে আমরা বুঝি পরিচ্ছন্ন একটি সংসার, স্ত্রী-ত্র পরিবার। জীবন বলতে আমরা বুঝি শুধু সাফল্য। বৈষয়িক জগৎ মানুষ আর রেসের াড়ায় বিশেষ কোনো পার্থক্য রাখেনি। এই ঘোড়াটি হলো আমাদের কেরিয়ার। াজকাল যুবকদের মুখে একটি কথাই শোনা যায়—কেরিয়ার বাগাও। যারা কেরিয়ারিস্ট রা স্বভাবতই স্বার্থপর। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আধুনিক সমাজে মানুষের বিচার র কেরিয়ারের নিরিখে। যে-মানুষটি নিজেকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে রেনি, যে-মানুষটির কোনো ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, যে-মানুষটি লোককে তাক লাগিয়ে বার মতো একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে পাবেনি, যে-মানুষটি তার মেয়ের বিয়েতে খ টাকা খরচ করে হাজার খানেক মানুষকে খাওয়াতে পারেনি সেই মানুষটি সাধারণের চারে অপদার্থ।

ভারতীয় জীবনদর্শন কিন্তু ভিন্নতর শিক্ষাই দিতে চায়। যে-শিক্ষার মূল কথা লো—আদর্শ মানুষ হও। আদর্শ মানুষ জিনিসটা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা? ভালো করি? বিরাট ব্যবসায়ী? বিশাল প্রতিপত্তি? আদর্শ মানুষ হলো যে সহজ, সরল, নিরহঙ্কারী, সংবেদনশীল, সপ্রতিভ, বিনয়ী, ভদ্র, নিয়মনিষ্ঠ, সংযত। আদর্শ মানুষ ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত। ঈশ্বরকে আমরা দেখিনি। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের একটা কল্পনা আছে, আমাদের মধ্যে যে যে গুণের অভাব আছে সেই গুণসমূহ বিশাল এক পুরুষে আরোপ করে আমরা তাঁকেই ঈশ্বর বলে থাকি। ঈশ্বরের কাছে আমরা কি চাই? চাই তাঁর করুণা। করুণা জিনিসটা কি? কৃপা। কিসের কৃপা? কৃপা দু'ধরনের। এক, জাগতিক। গাড়ি দাও, বাড়ি দাও, চাকরি দাও, ভোগ দাও, রোগারোগ্য দাও, যতরকমের 'দেহি' আছে সব দাও। হে ঈশ্বর, তোমার কৃপায় আমার জীবন ও সংসার যেন ধনে জনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি। অনন্ত চাওয়া।

কৃপাময়ের কাছে চোখ বুজে এই চাওয়াটাকেই আমরা উপাসনা বলে মনে করি। এ
চাওয়ার নামে একটি ফুল তাঁর শ্রীচরণে অর্পণকেই আমরা পূজা বলে মনে করি। তি
সব দেবেন এই বিশ্বাসকেই আমরা মনে করি ঈশ্বর-বিশ্বাস। আস্তিকতা।

এর কোনটি না পেলে আমরা তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠি। নির্দ্বিধায় ব
বসি—ঈশ্বর-ফীশ্বর বাজে, বোগাস একটা ব্যাপার। যাঁরা চালাক মানুষ তাঁরা ব্যবহারি
বুদ্ধি প্রয়োগ করে দেখলেন ক্ষমতাশালী মানুষের শ্রীচরণে তৈল আরোপ করলে কৃ
অনেক সহজেই পাওয়া যায়। সহজেই কেরিয়ার বাগানো যায়। যেমন বাঘের পেছ
ফেউ। এঁদের দৃষ্টিতে ক্ষমতাশালী মানুষই হলে কৃপাময় ঈশ্বর। এই ফেউবৃত্তি অনে
বেশি নিশ্চিন্ত ফলদাতা। সুতরাং ঈশ্বরের ভজনা না করে নেতার ভজনা করা অনে
বেশি কাজের। আবার অনেক দেখলেন ধর্মের প্রতি, ধার্মিকের প্রতি মানুষের একটা
সহজাত দুর্বলতা আছে। অতএব ধর্মের ভেকধারণ করলে কিছু মানুষকে চরিয়ে খাওয়া
যায়। এঁদের ঈশ্বর-বিশ্বাস হলো ঈশ্বরকে মূলধন করে কিছু মানুষের সহজ বিশ্বাসকে
নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো। অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন এঁদের কেরিয়ার। এযুগে এই ধরনের
কেরিয়ারিস্ট অনেক আছেন যাঁরা ঈশ্বরের 'মিডল-ম্যান' হিসেবে কাজ করেন। এঁদে
অনেক যোগাযোগ থাকে। সেটাকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু মানুষের সহজ চাওয়াকে
তাঁরা পাইয়ে দেন। তাঁদের মাধ্যমে এক বস্তা সিমেন্ট, কি এক টন লোহা, কি ছেলের
চাকরি অথবা একটা পাসপোর্ট পাওয়াকে মনে করা হয় স্বয়ং ঈশ্বরের কৃপালাভ। এঁরা
যতো না দেন তার থেকে বেশি নেন। এঁরা ধর্মটাকে এতো সরলীকৃত করে ফেলেছে
যে ধর্মের আসল সংজ্ঞাটাই পাল্টে গেছে।

দুই, কৃপা মানে—তুমি কৃপা করে আমার সব চাওয়াটি তুলে নাও। আমার সমস্ত
অভাববোধ তুমি হরণ করো। আমি যেন বুক ঠুকে হাসি মুখে বলতে পারি, আমি কিছু
চাই না। যেমন ঠাকুর বলেছিলেন, টাকা মাটি মাটি টাকা, যেমন স্বামীজী বলেছিলেন
প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা, যেমন তুলসীদাস বলেছিলেন, সব ছোড়য়ে তো সব পাওয়ে। কৃপা
মানে এমন একটি মন পাওয়া যে মন দুঃখে সুখে অবিচলিত, এমন একটি মন পাওয়া
যে মন মৃত্যুভয়ে ভীত নয়, এমন একটি মন পাওয়া যে মন ঈশ্বর ছাড়া আর কারও
কাছে নতি স্বীকার করে না, এমন একটি মন পাওয়া যে মন নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত
এমন একটি মন চাই যে মন আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় না, সে মন কর্মী কিন্তু কর্মফলে
প্রত্যাশী নয়। ফলের জন্য কাজ করে না, কাজের জন্য কাজ।

জীবনকে বাঁধা বলতে বোঝায় এই সুরে বাঁধা। বর্তমান যুগের শিক্ষা মানুষের এ
আত্মিক উদ্বোধনের কথা আদৌ চিন্তা করে না। নিয়ত আমাদের লোভী, আমাদে
ফলাকাঙক্ষী, স্বার্থান্বেষী, একদেশদর্শী, আত্মপর করে তুলছে। জীবনকে বাঁধার কৌশল
নিজেদের হাতেই ধরা আছে, সে কৌশল হলো বিচার। অন্যকে বিচার না, নিজেকে
বিচার। গীতাতে একটি কথা আছে—তুমি নিজেই তোমার পরম বন্ধু হতে পারো, আবা
তোমার পরম শত্রুও হতে পারো। অমৃত শব্দের অর্থ হলো শান্তিলাভ, স্থিতিলাভ
কোথায় স্থিতি ? নিজের মধ্যে নিজের স্থিতি। নিজেকে নিজের হাতে আমলকীর মতো

ধরে রাখতে হবে, বিচার করতে হবে কেন আমি এসেছি, কি কারণে এসেছি, কি করতে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন এই তিন প্রয়োজনের উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করতে পেরেছি কিনা। রুমি বলেছিলেন, জীবন হলো একটি মোমবাতি। ক্ষইতে ক্ষইতে জ্বলতে থাকে, আলোক বিকিরণ করে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমার এই দেহখানি তুলে ধর। তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো।" মানুষের দেবালয়ে নিজেকে প্রদীপের মতো প্রোজ্জ্বল না করতে পারার বেদনাই হলো দুঃখ, আর মৃত্যু হলো জীবিত অবস্থায় নিজের আত্মপুরুষকে অচেতন করে রাখা।

জীবন হলো এক মহাসঙ্গীত যা 'হেসে কলকল গেয়ে খলখল তালে তালে দিয়ে তালি' উৎস থেকে সাগরের দিকে এগিয়ে চলে। যাবার পথে ফেলে রেখে যায় তার আলোকিত বেঁচে থাকার পলি যার নাম আদর্শ। আদর্শ হলো জীবনকে দর্শনীয় করে তোলা। রূপে নয়, বাইরের ঐশ্বর্যে নয়—অন্তরের প্রকাশে। সেই প্রকাশ হলো নিজের জ্যোতির্ময় সত্তাকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করে যাওয়া। শিলালিপিতে নয়, সৌধে নয়, প্রচার-পত্রিকায় নয়, ইতিহাসের পাতায় নয়।

আস্তিকের ধর্ম বড় সহজ, মনের যোগ না থাকলেও মানুষকে ভাঁওতা দেওয়া যায়। নাস্তিকের ধর্মই হলো ধর্ম। নাস্তিকের বিশ্বাসে সাঙ্ঘাতিক একটা জোর আছে। সে-জোরের নাম অবিশ্বাস।

মানুষের বিচার-পদ্ধতিতে দুটি ধরন আছে, এক, তুমি অপরাধী, এখন প্রমাণ কর যে তুমি অপরাধী নও। দুই, আমরা মনে করছি তুমি অপরাধী নও, তোমার বিরোধীপক্ষ এখন প্রমাণ করুক যে তুমি অপরাধী। আস্তিক মেনেই নিচ্ছে ঈশ্বর এক কৃপাময় সত্তা। আমি চাইব তিনি আমাকে দেবেন না, দিলে তিনি নেই এবং আমি নাস্তিক। এই নাস্তিকতা মানুষকে এমন এক হতাশা আর বিভ্রান্তির মধ্যে নিয়ে যায়, যাকে বলা চলে মৃত্যুরই নামান্তর। ঈশ্বর কোনোদিনই অপরাধীর মতো মানুষের আদালতে এসে প্রমাণ করতে চাইবেন না যে আমি নিরপরাধ, করুণাময়। কারণ, তিনি জানেন মানুষ নামক বিচিত্র জীবের অভাবের ও চাওয়ার শেষ নেই। কারণ সে জীবনের ভাবটি ধরতে পারে না, 'ভিখারী' হতে চায় লক্ষপতি, লক্ষপতি হলে সে হতে চায় কোটিপতি, কোটিপতি হলে সে কামনা করে ইন্দ্রত্ব। সেই কারণে তুচ্ছতার সংসারে যারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত সেই ধরনের স্বার্থপর কাঙালদের কাছ থেকে ঈশ্বর দূরে সরে থাকতেই পছন্দ করেন।

নাস্তিক কিন্তু ধরেই নেয় ঈশ্বর বলে কিছু নেই। আছে সে, আর আছে প্রতিযোগিতার জগৎ। যেটুকু পেতে হবে তা পেতে হবে নিজের ক্ষমতার জোরে। ফলে আস্তিকের চেয়েও তার পুরুষকার অনেক বেশি, আর ঈশ্বর এই পুরুষকারের জাগরণই পছন্দ করেন। কারণ, উপনিষদ্ বললেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' নাস্তিক সেই কারণে তার কৃপাকণিকার কণিকাটুকু পেলেই ঋজুবুদ্ধি দিয়ে ভাবতে বসেন এটা কি হলো, কোথা থেকে এল। এ তো আমার প্রাপ্য ছিল না, এ তো আমি চাইনি, তবে কে দিলেন ? নাস্তিকের শেষ পরিণতি আস্তিকে। সে তখন অভিভূত হয়ে আকাশের দিকে মুখে তুলে বলে, তুমি কে তা জানি না, তুমি কোথায় তাও জানি না, কিন্তু বুঝেছি তুমি আছ।

তার বিশ্বাস তখন গেয়ে ওঠে—"যা দিয়েছ তুমি অনেক দিয়েছ অযাচিত তব দান। দিইনি মূল্য বুঝিনি মহিমা তবু দান অফুরান।" আস্তিক কত সামান্য কারণে নাস্তিক হতে পারে তার একটি ঘটনা বলি, একদিন একটি ভিড় বাসে উঠে আমি ঈশ্বরকে বললুম, হে ঈশ্বর আমাকে এমন একটি আসনের পাশে দাঁড় করিয়ে দাও যে-আসনের যাত্রী পরের স্টপেজেই নেমে যাবেন আর আমি টুক করে বসে পড়ব। কারণ, হে ঈশ্বর, আজি আমি বড় ক্লান্ত। ঈশ্বর আমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন। আমি সেখান থেকে সরে এসে ঈশ্বর-নির্দেশিত বলে যে আসনটির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম সেই আসনের যাত্রী বাসের শেষ টার্মিনাস পর্যন্ত গেলেন, আর যেখানে থেকে সরে এলাম, তিনি পরের স্টপেজেই নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘোষণা করলাম—ঈশ্বর তুমি নেই। এই হলো তথাকথিত আস্তিকের জীবনের সুর।

জীবনকে এই না চাওয়ার সুরে বাঁধাটাই হলো ধর্ম, আর যে না চায় সেই হলো পরম শান্তির অধিকারী। আর ঈশ্বরের অপর নাম হলো শান্তি সংহতি ও সুর।
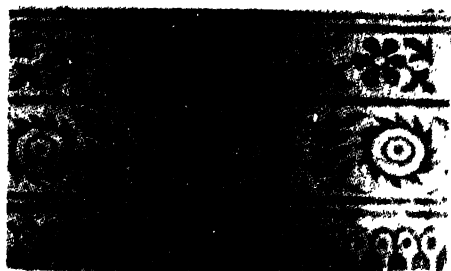
অনুগ্রহ

তাঁর কৃপা না হলে কি তাঁকে কি পাওয়া যায়? যায় না। মনই যাবে না। মন মেতে থাকবে বিষয়ে। কামিনী কাঞ্চনে। মায়া জড়ানো এই পৃথিবী। পাঁচ ইন্দ্রিয় প্রবল। মানুষ কেন চাইবে তাঁকে। তিনি কে, সেই ধারণাটাই তো স্পষ্ট নয়। আর তাঁকে পেলেই বা কি হয়। মহা সংশয়ের মধ্যে বসবাস। মহাপ্রশ্ন মনে অঙ্কুরিত হতে হতেই গোরে যাবার সময় উপস্থিত। কি চেয়েছি, কি পেয়েছি, এই হিসেব মেলাবার ইচ্ছে যখন এল, তখন আর বেলা বেশী বাকি নেই। ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে। এখন চোখে আমার ছানি। রক্তে শর্করা। কণ্ঠে আমার বায়ু পিত্ত, কফ। তখন শুধু ব্যাধির ভজনা। মনে এক বিষম হাহাকার—কবীরজীর দোঁহায় যেমন আছে—

কহা করঁউ কৈসে তরঁউ ভব জলনিধি ভারী।
রাখি রাখি মৈরে বীঠ্‌লা জনু সরণী তুমহারী॥

কি করব, ভয়ংকর ভবসমুদ্র কি করে পার হব। হে আমার বিটঠল, আমায় রক্ষা কর। আমি তোমার শরণাগত। শরণাগত হলে কি হবে, মনের বিচার তো ঘুচলো না। সেই বিকার কি রকম? ঘর ছেড়ে বনে যাই, ফলমূল কুড়িয়ে খাই। তাতেই বা কী? পাপী মন। বিষয় বিষের বাসনা ছেড়েও ছাড়া যায় না। অনেক ভাবে আগলে রাখার চেষ্টা করি মনকে ; কিন্তু মন, বারেবারেই তাতে জড়িয়ে যায়। মূঢ় জীব। অনিক জতন করি রাখি ঐ ফিরি ফিরি লপটাই॥ জীব অদিত জোবন গয়া কিছু কিয়া ন নীকা।' ওরে যৌবন যে চলে গেল, ভালো তো কিছু করা হলো না। 'বহু জিয়রা নিরমোলিকা কৌড়ি লগি বিকা॥' অমূল্য এই জীবন কড়িমূল্যে বিকিয়ে গেল। পরের দাসত্ব করে, পরিবারের ফাইফরমাশ খেটে কর্তা চলে গেলেন ঘাটে।

কেন এমন হয়? কি ভুলিয়ে রাখে মানুষকে? কে সে? আছে, সে হলো আমার প্রারব্ধ। আমার সংস্কার। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, দুরকম মাছি আছে—একরকম মধুমাছি, তারা মধু ভিন্ন আর কিছুই খায় না। আর একরকম মাছি মধুতেও বসে, আর যদি পচা ঘা পায় তখনি মধু ফেলে পচা ঘায়ে গিয়ে বসে।

মানুষ তাঁর কৃপা বলতে বোঝে নিজের বৈষয়িক উন্নতি। বাড়ি নেই, একটা বাড়ী চাই। ব্যবসায়ী হলে ব্যবসায় উন্নতি। চাকরি হলে তরতর প্রমোশান। নেতা হলে গদির

স্বপ্ন। চাই ভার্য্যাং মনোরমাং। ছেলের প্রতিষ্ঠা, মেয়ের বিয়ে খুব ভালো ঘরে। বিলেত ফেরৎ জামাই। নীরোগ শরীর। চিতায় ওঠার আগে পর্যন্ত ভোগের যন্ত্রপাতি যেন ঠিক থাকে। চোখ, কান, দাঁত, নাক। মাঝে মধ্যে অসুখ করুক ক্ষতি নেই, তাঁর কৃপায় যেন তিন দিনে চাঙ্গা হই। তিনি যেন বসে আছেন কোথাও, আমার ইচ্ছা পূরণের ঝুলি নিয়ে। যা চাইব তাই যেন পাই। পেলেই তিনি আছেন, না পেলেই নেই। এমনকি লটারির টিকিট কেটে তিনবার কপালে ঠেকাই 'মা, দশলাখ, মা, বিশলাখ।' মা হাসেন—গাধা, আসল নকল চিনলি না! কোন্‌টা সার, কোনট আসার, কোনটা মায়া? এখন কেউ যদি বলেন—ও মশাই!

যথা স্বপ্নে মুহূর্তে স্যাথ সংবৎসর শতভ্রমঃ।
তথা মায়া বিলাসোহয়ং জায়তে জাগ্রতি ভ্রমঃ॥ [যোগবাশিষ্ঠ]

অমনি ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি। সংস্কৃতে কি ঝাড়ছ বাবা? কিছুই না, মহাসাধকের উপলব্ধির সারাৎসার—এক মুহূর্ত কালের মধ্যে স্বপ্নে যেমন শতবৎসরের ভ্রম হয়, সেই রকম তুমি জেগে এই পৃথিবীকে যা দেখছ এই সংসার, সে আর কিছুই নয় মায়ার বিলাস, সব ঝুট হ্যায়। মিথ্যা ভ্রম। সঙ্গে সঙ্গে আমি সংসারের চাটনি চাটতে চাটতে বলব, ও বাবা ও তো বেদান্ত। সাধুসন্তের কারবার ও-সবে আমার কি দরকার। আমি আমার ছেলে, বউ, চাকরি-বাকরি, প্যাজ পয়জার নিয়ে বেড়ে আছি বাবা।

তখন যদি প্রশ্ন হয়, কি রকম বেড়ে আছ? এখন মনে হচ্ছে তো। এইবার বয়েসটা একটু বাড়তে দাও। কেমন তারপর বিশ্বরূপের মতো তুমি সংসারের আসল রূপ দেখবে। শতকরা নিরানব্বই জন যা দেখে।

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাদ্ধবতি জর্জরদেহে বার্তাংপৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে॥ [শঙ্কর]

যতদিন তোমার রোজগার, পরিবার পোষণের মতো ক্ষমতা, ততদিনই খাতির, বাবা। যেই তুমি জরদগব বৃদ্ধ হলে তখন একবার বাঁচার সুখটা দেখো! কেউ একবার ভুলেও তোমার খবর নিতে আসবে না। এমনকি তোমার প্রাণের স্ত্রীও নয়। পড়ে পড়ে কোঁত পাড়বে। পয়সাঅলা ঘরের বুড়োদের আজকাল পাঠিয়ে দেয় বার্ধক্যাশ্রমে। খুব যখন ব্যামো, যখন মনে করবে বুড়ো এইবার টাঁসবে, ঠেলে দেবে নার্সিং হোমে। সেখান থেকে অবশ্য খুব ঘটা করে নিয়ে যাবে শ্মশানে। খুব ফুল চাপাবে। শ্রাদ্ধও করবে তেড়ে আবার কি? সে সম্ভাবনাও আছে, আমার সব করাই হয়তো ভস্ম ঘি ঢালা হলো। করেই গেলুম। উদয়াস্ত খেটেই মরলুম। সব সাজিয়ে গুছিয়ে সকলকে মৌতাতে রাখলুম, তারা কিন্তু আমাকে গ্রাহ্যই করলে না।

"ওরা শুধু করে কোলাহল" এই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া খেয়োখেয়ি। অষ্টপ্রহর স্বার্থের সংকীর্তন। শুধু দাও। চেয়োনা কিছু। এমনকি শান্তিও না। বাবা, দিনান্তে ফিরেছি, একটু তিষ্ঠোতে দাও। না, তা হবে না। তোমার দেনা আমরা এই ভাবেই শোধ করবো। তুমি কি করেছ, না করেছ আমাদের দেখার দরকার নেই। কে-কাকে খাওয়ায়। ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন। তখন ঈশ্বর। সংসার করেছ যখন এটা তো তোমার কর্তব্য।

গা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন। সংসারের স্বরূপ। মোহমুদগর। গুরু শিষ্যকে ক'দিন ধরে খুব বোঝাচ্ছেন—দ্যাখো বাবা, ঈশ্বরই তোমার আপনার, আর কেউ তোমার আপনার নয়। শিষ্য অবুঝ, অবোধ। সে কেবলই বলে, আপনি কি বলছেন ঠাকুর। আজ্ঞে আমার মা, পরিবার এরা আমাকে কত যত্ন করেন। একদিন আমাকে দেখতে না পেলে চোখে অন্ধকার দেখেন। কত ভালোবাসেন। গুরু বললেন, বাবা, ও তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। কেউ তোমার নয়। এই ঔষধের বড়ি কটা তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি বাড়িতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো। লোকে মনে করবে য তোমার দেহত্যাগ হয়েছে কিন্তু তোমার সব বাহ্যজ্ঞান থাকবে। তুমি দেখতে, শুনতে াব পারে ; আমি সেই সময় গিয়ে পড়ব।

শিষ্য বাড়িতে এসে তাই করল। বড়ি ক'টা খেয়ে ফেললে। খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। মা, পরিবার, বাড়ির সকলে কান্নাকাটি শুরু করলে। এমন সময় গুরু এলেন কবিরাজের ছদ্মবেশে। মন দিয়ে সব শুনলেন। শুনে বললেন—আচ্ছা এর ঔষধ আছে। বাঁচে উঠবে আবার। তবে কথা আছে একটা। এই ওষুধটা আগে একজন আপনার লোককে খেতে হবে। তারপর ওকে দেওয়া যাবে। যে আপনার লোক এই বড়িটা খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে। তা এখানে তো ওঁর মা, পরিবার সবাই রয়েছেন। একজন না একজন কেউ খাবেন নিশ্চয়। কেমন ? এতে কোনোও সন্দেহ আছে। কবিরাজ সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। শিষ্য সব শুনছে। কবিরাজ মাকে ডাকলেন। মা আপনারই তো ছেলে, আপনি তাহলে ঔষধটা খান। মা তো ছেলের শোকে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। আর তেমনি কান্না। কবিরাজ বললেন—মা, আর তো কান্নার কিছু নেই। এই বড়িটা খেয়ে ফেলুন, ছেলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে উঠবে। তবে আপনার এতে মৃত্যু হবে। মা ঔষধের বড়িটি হাতে ধরে ভাবতে লাগলেন। অনেক ভেবেচিন্তে কেঁদে কেঁদে বললেন—বাবা, আমার যে কয়েকটি ছেলেমেয়ে আরও আছে। আমি চলে গেলে তাদের কী হবে। কে তাদের দেখবে, কে খাওয়াবে ! আমার যে একটাই অসুবিধে, বাবা।

তখন কবিরাজ ডাকলেন পরিবারকে। পরিবারও খুব কাঁদছে। কবিরাজ তার হাতে বড়িটি দিলেন। খেয়ে ফেল, মা ! তুমি মরবে, তোমার স্বামী কিন্তু বেঁচে উঠবেন। পরিবার তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন ওগো, ওর যা হবার তা তো হয়েছে গো—আমার অপোগণ্ডগুলোর এখন কী হবে, বলো ? কে ওদের বাঁচাবে ? আমি কেমন করে এ ওষুধ খাই !

শিষ্যর তখন ওষুধের নেশা চলে গেছে। সে বুঝলে কেউ কারোর নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বললেন, এইবার বুঝলে তো, তোমার আপনার কেবল একজন—তিনি ঈশ্বর।

এই বোধটা কি করে আসবে। তাঁর কৃপায়। সে কৃপা আসবে গুরুর মাধ্যমে। তাহলে তা একটু এগোতে হয়। কষ্ট করে একটু সাধুসঙ্গ করতে হয়। যিনি হলফ করে বলতে পারেন তাঁকে দর্শন করা যায়। শুদ্ধ মন, বুদ্ধিতে দর্শন করা যায়। কামিনী কাঞ্চনে

আসক্তি থাকলে মন মলিন হয়।' তাহলে, এইবার বিচার। কামিনীতে কি আছে! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—'লজ্জা হয় না। ছেলে হয়ে গেছে, আবার স্ত্রীসঙ্গ! ঘৃণা করে না—পশুদের মতো ব্যবহার! নাল, রক্ত, মল, মূত্র এসব ঘৃণা করে না? যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমা সুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বোধহয়। যে শরীর থাকবে না—যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্মা যত প্রকারের অপবিত্র জিনিস, সেই শরীর নিয়ে আনন্দ! লজ্জা হয় না?' ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর বরাহনগর মঠের গাছতলায় বসে স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়কে বলছেন—নির্লিপ্ত সংসার বলুন আর যাই বলুন, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। স্ত্রীসঙ্গে সহবাস করতে ঘৃণা করে না? যে স্থানে কৃমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ—

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজাল সঙ্কুলে স্বভাব দুর্গন্ধ নিরন্তকান্তারে।
কলেবরে মূত্র পুরীষ ভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥

যোগবাশিষ্ট তো সেই মানুষকে গর্দভই বলে দিলেন যে—

বুধ্বাহপ্যত্যন্ত বৈরস্যং যঃ পদার্থেষু দুর্মতিঃ।
বধ্নাতি ভাবনাং ভুয়ো নরো নাসৌ স গর্দভঃ॥

বিষয় বিষয় জেনেও যে দুর্গতি পুনরায় সেই বিষয়েতেই মজে, সে মানুষ নয়, সে একটা গাধা।

কামই মানুষকে সংসারে ফেলে কাঁঠালের আঠা মাখায়, আর কাম থেকেই কামিনী আর কামিনীর জন্যেই কাঞ্চন। ঠাকুর বলতেন, টাকায় কি হয়। চাল, ডাল, আটা, ময়দা কাপড়, জামা, গাড়িবাড়ি। তারপর ভোগ বাড়ালেই ভোগ বাড়ে। টাকায় আসে অহংকার। টাকার অহংকার করতে নেই। যদি বল আমি ধনী, ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকী পোকা ওঠে সে মনে করে আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি; কিন্তু যেই নক্ষত্র উঠল, অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা মনে করে আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি, কিন্তু পরের যখন চন্দ্র উঠল তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলে আমার আলোয় জগৎ হাসছে দেখতে দেখতে অরুণোদয় হলো তখন চন্দ্র মলিন হয়ে গেল। খানিক পরে আর দেখা গেল না। ধনীরা যদি এগুলি ভাবে, তা হলে আর তাদের ধনের অহংকার থাকে না